কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা

কোয়ান্টাম ভাবনা
সাফল্যগাথা

সংকলন ও সম্পাদনা :

রাবিয়া নাজরীন
ডা. আতাউর রহমান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯১৩৯১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd
Website : www.quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম ভাবনা
সাফল্যগাথা

সংকলন ও সম্পাদনা :

রাবিয়া নাজরীন
ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

গ্রন্থস্বত্ব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২
(মহান ভাষাশহীদ দিবস স্মরণে)

প্রচ্ছদ

আবদুল্লাহ জুবাইর

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড,
ঢাকা-১০০০

মূল্য

২৫০ টাকা

Quantum Bhabna
Safalyagatha
(Quantum Life Lessons &
Success Stories)

Published by

Quantum Foundation
www.quantummethod.org.bd

Price : $ 40

উৎসর্গ

কোয়ান্টামের সাফল্যযাত্রার দুই দশকে
জীবন বদলের বিজ্ঞানকে যারা
অগণিত মানুষের কাছে
পৌঁছে দিয়েছেন,
তাদের উদ্দেশ্যে .....

সূচিপত্র

(এই বইয়ে প্রকাশিত সকল মতামত ও অনুভূতি আলোচকের নিজস্ব)

কোয়ান্টাম ভাবনা

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ॥ ১১
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ॥ ১৫
জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক ॥ ১৯
জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ॥ ২৩
জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ॥ ২৯
এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার ॥ ৩৩
কবি শামসুর রাহমান ॥ ৩৭
অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ॥ ৪১
অধ্যাপক ড. মুজাফ্ফর আহমেদ ॥ ৪৫
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ॥ ৪৯
আল্লামা ড. এম শমশের আলী ॥ ৫৩
মুস্তাফা জামান আব্বাসী ॥ ৫৭
কামাল লোহানী ॥ ৬১
অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী ॥ ৬৫
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ॥ ৬৯
অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ॥ ৭৩
অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ॥ ৭৭
অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম ॥ ৮১
বিচারপতি এ কে এম সাদেক ॥ ৮৫
বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ॥ ৮৯
বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ ॥ ৯৩
অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ॥ ৯৭
কাজী ফজলুর রহমান ॥ ১০১
অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ ॥ ১০৩
অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত ॥ ১০৭
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ॥ ১১১
অধ্যাপক ড. মাহমুদ-উল আমীন ॥ ১১৫
এডভোকেট সালমা আলী ॥ ১১৯
আজিজ মেহের ॥ ১২৩
অধ্যাপক ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান ॥ ১২৫
আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল ॥ ১২৯
স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ ॥ ১৩৩
আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ॥ ১৪১
কবি সৈয়দ শামসুল হক ॥ ১৪৫
কবি বেলাল চৌধুরী ॥ ১৪৯
রামেন্দু মজুমদার ॥ ১৫১
আবদুল মান্নান সৈয়দ ॥ ১৫৫
কাজী আনোয়ার হোসেন ॥ ১৫৭

সাফল্যগাথা

১৬১ ॥ অধ্যক্ষ হামিদা আলী
১৬৫ ॥ অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ
১৬৯ ॥ ফেরদৌসী মজুমদার
১৭৩ ॥ কবি আবদুল হাই শিকদার
১৭৭ ॥ প্রফেসর ড. নুরুন্নবী
১৮১ ॥ অধ্যাপিকা ড. রওশন আরা ফিরোজ
১৮৩ ॥ খায়রুল আনোয়ার মুকুল
১৮৭ ॥ হাসি চক্রবর্তী
১৯১ ॥ সুজিত মোস্তফা
১৯৫ ॥ ইনামুল হক খান
১৯৯ ॥ সানাউল হক বাবুল
২০৩ ॥ মুশতাক আহমেদ
২০৭ ॥ সালাহ্ উদ্দিন মোস্তান মানিক
২১১ ॥ জিল্লুর রহমান
২১৫ ॥ সাধনা আহমেদ
২১৯ ॥ লস্কর মোহাম্মদ কাশিফ
২২১ ॥ রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ
২২৩ ॥ অধ্যাপিকা ড. সুরাইয়া পারভীন

ভূমিকা

দুই দশক আগের কথা। কোয়ান্টাম মেথড যাত্রা শুরু করেছিলো প্রায় শূন্য থেকে। অনেক উপকরণ যেমন ছিলো না, তেমনি ছিলো না কোনো উদাহরণ বা প্রমাণ–যা দেখে মানুষ বিশ্বাস করবে মেডিটেশনের উপকারিতা, কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকারিতা।

কিন্তু বিশ্বাস প্রবল ছিলো। আজকের মতো তাই সেদিনও কোয়ান্টাম বলেছে–আসুন, আত্মনিমগ্ন হোন, প্রাণান্ত প্রয়াসে কাজে নেমে পড়ুন। সাফল্য আপনার, বিজয় আপনার, সুস্থতা আপনার। অল্প অল্প করে মানুষ জড়ো হয়েছে। একের পর এক ঘটেছে প্রশান্তি সুস্থতা সফলতার ঘটনা। কোয়ান্টাম আজ লাখো মানুষের জীবন বদলের উদাহরণে পরিপূর্ণ চেতনা।

দুই দশক ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়া হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুণীজনরা যেমন আছেন তেমনি আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী চিকিৎসক আইনজীবী প্রকৌশলী শিল্পপতি ব্যবসায়ী প্রশাসক অভিনয়শিল্পী কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক আলেম শিক্ষক ছাত্র তরুণ-তরুণী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, গৃহবধূসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। কোর্সে অংশ নিয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। রোগ-শোক-ভয়-উদ্বেগ ও হতাশা কাটিয়ে লাভ করেছেন অভূতপূর্ব প্রশান্তি। পরিবার পেশা ও জীবনে এনেছেন নতুন ছন্দ।

কোয়ান্টাম বলেছে ভালো কাজে কখনো অর্থের অভাব হয় না। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে যেকোনো কাজ করা সম্ভব। তা-ই হয়েছে।

দুই দশকের নিরলস পরিশ্রমে কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে রক্তদাতাদের সবচেয়ে বড় ডোনার পুল ও আধুনিক ল্যাব। রক্ত দিয়ে বাঁচাতে সাহায্য করেছে চার লক্ষ মানুষের প্রাণ। ধ্যানচর্চার শত কেন্দ্রসহ বান্দরবানের লামার দুর্গম এলাকায় গড়ে তুলেছে এক আলোকিত জনপদ।

বিশুদ্ধ পানির জন্যে নলকূপ স্থাপন, খতনা, মাতৃমঙ্গল, ত্রাণ ও দাফন, পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ সেবার যেকোনো সুযোগ গ্রহণ করেছে আন্তরিক মমতায়। স্বনির্ভরায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলেছে অবহেলিত পরিবারগুলোকে। লক্ষ মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছে সৎদানে ও সৎকাজে।

দেশের অফুরন্ত সম্ভাবনাতেও কোয়ান্টাম একইভাবে বিশ্বাস করেছে। দেশ নিয়ে অনেকেই যখন হতাশায় ভুগছিলেন, জাতিগত লক্ষ্য নিয়ে ছিলেন বিভ্রান্ত তখন কোয়ান্টাম বলেছে, এক অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। জ্ঞান-প্রযুক্তি-সভ্যতা ও নৈতিকতায় আগামীর বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারবে বাংলাদেশ। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়ে এসে দেশের বহু গুণীজনও এ বিশ্বাসের সাথেই একাত্মতা ব্যক্ত করেছেন।

গুণীজনদের ভাবনা আর কোয়ান্টাম চেতনার অনুসারী একগুচ্ছ সফল জীবনের গল্প নিয়ে গ্রন্থিত 'কোয়ান্টাম ভাবনা ও সাফল্যগাথা'।

প্রথম অংশে আছে দেশের বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ সমাজতাত্ত্বিক ধর্মবেত্তা কবি লেখক শিল্পীসহ সমাজের প্রায় সকল মতের পথের বিশিষ্টজনদের অনুভূতি-উপলব্ধির কথা। পড়তে পড়তে আপনিও ঋদ্ধ হয়ে উঠবেন এঁদের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোয়।

দ্বিতীয় অংশে আছে কোয়ান্টাম চেতনার সফল প্রয়োগকারী একদল কীর্তিমান মানুষের সাফল্যগাথা–যারা শূন্য থেকে জীবন শুরু করে এখন এগিয়ে যাচ্ছেন পূর্ণতার পথে। এদের জীবন আপনাকে উজ্জীবিত করবে, সাহস যোগাবে। বিশ্বাস এনে দেবে যে, এদের মতো আপনিও পারেন যেকোনো অবস্থা থেকেই জীবনের উত্থান ঘটাতে।

কোয়ান্টামের ২০ তম বছরে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা কোয়ান্টাম পরিবারের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতিও, যাদের শ্রমে-ঘামে সম্ভব হয়েছে এ সাফল্যযাত্রা।

করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

কোয়ান্টাম ভাবনা

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ বিএসএমএমইউ (তৎকালীন আইপিজিএমআর)-এর মূল রূপকার। দেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ১৯৯৩ সালে কোয়ান্টামের প্রথম শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে মেডিটেশনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর দেড় যুগ পর ২০১১ সালের জুন-এ তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩১ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম মেথডকে সার্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি এ ভাষণ দেন।

কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকারিতা এখন প্রমাণিত সত্য

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা যেমন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমান অপরাধ, তেমনি একজন মানুষের জীবন রক্ষা করাও সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষার মতো মহান কাজ। কোয়ান্টামে এসে আমি দেখলাম, বহু মানুষ এ কোর্সের মাধ্যমে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। সুস্থতা ও প্রশান্তির পথে যাত্রা শুরু করেছেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ–রোগমুক্তি ও নিরাময়ের এ অনুভূতিগুলো সংকলিত করে আপনারা বই আকারে প্রকাশ করুন। প্রয়োজনে আমাদেরকে দিন, আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই প্রামাণ্য দলিল প্রকাশ করবো। কারণ চারপাশের মানুষকে এ সংবাদ জানানো অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে আরো মানুষ উপকৃত হবে।

আজ থেকে ১৯ বছর আগে কোয়ান্টামের শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে একজন চিকিৎসক হিসেবেই আমি বলেছিলাম–'অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আনতে পারে মেডিটেশন, যা পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড চমৎকার কাজ করতে পারে। যেসব রোগে ওষুধের

প্রয়োজন নেই কোয়ান্টামই হতে পারে তা নিরাময়ের সার্থক বিকল্প।' এ ভাষণটি পরবর্তীতে আমার 'প্রেসক্রিপশন' গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে।

৪ দিনের এ কোর্সে কোয়ান্টাম মেথডকে সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আজো সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই–কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্তি ও প্রশান্তি অর্জন সহজ হবে। আর এ বিষয়টিকে আমরা যত সহজে গ্রহণ করতে পারবো, এর সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারবো আমাদের জীবন তত প্রশান্তিময় হবে এবং রোগমুক্তি হবে সহজ। আমি মনে করি, এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা হওয়া উচিত।

আমি আজ বিশ্বাসের সাথে যে কথাগুলো বললাম তাতে আমার পেশার কোনো ক্ষতি হবে না। আমার পেশা তার যোগ্য সম্মান নিয়েই বেঁচে থাকবে। কারণ শুধু ট্যাবলেট, মিকশ্চার বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে সব রোগমুক্তি সম্ভব নয়। কারণ, প্রত্যেক চিকিৎসককেই তার পেশাগত জীবনে এমন কিছু রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয় যাদের রোগের সাথে কোনো না কোনোভাবে টেনশন জড়িত। আর কাউন্সেলিং বা সৎ পরামর্শ, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং প্রশান্তিতে এ সমস্ত রোগের মুক্তি হয়।

আসলে শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। মনের গতি, শক্তি, পরিধি সবই ব্যাপক। মনের এই দুর্দমনীয় শক্তির প্রভাবে শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এমন কিছু পদার্থ তৈরি হয় যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এমনকি রোগ নির্মূলেও সাহায্য করে।

মেডিটেশন ও জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে যারা হৃদরোগমুক্ত হয়েছেন, কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে তাদের অভিজ্ঞতাও আমি শুনেছি। অপারেশনকে ভয় করেন না এমন মানুষ নেই, তাই অপারেশনের চেয়ে ঝুঁকিহীন ও সঙ্কটমুক্ত এমন একটি চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে সুস্থ হওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

হৃদরোগ মুক্তির অভিজ্ঞতা তাদের নিজেদের মুখে শুনে আমার মনে হয়েছে, সৎ সাহস না থাকলে এ কথাগুলো তারা এত সহজে সবার সামনে বলতে পারতেন না। সত্য বলেই সৎ সাহস ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বিষয়টি তুলে ধরতে পেরেছেন। আর সত্য বলতে কোনো ভয় থাকা উচিত নয়। কারণ সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজিতে ভাষান্তর করে তাদের এ কথাগুলোর ভিডিওচিত্র দেশে-

বিদেশে দেখানো উচিত। ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজের মিটিংয়ে আমি এ ভিডিও দেখাবো এবং তাদের বলবো, হয় আজ থেকে একে সত্য বলে গ্রহণ করুন অথবা মিথ্যা বলে প্রমাণ করুন। আর যদি মিথ্যা প্রমাণ করতে না পারেন তবে এটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে।

এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমেরিকায় ডা. ডীন অরনিশ শত শত হৃদরোগীকে এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ছাড়াই সুস্থ করে তুলেছেন। হৃদরোগের এ অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ সমস্ত মেডিকেল জার্নাল, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এর ভিত্তি আছে, এতে মিথ্যা কিছু নেই।

নজরুলের একটি কবিতায় আছে–'বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে।' তাই সবাইকেই বলি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বাস এবং আশাকে সঙ্গী করে রাখবেন। এই আশা এবং বিশ্বাসই আপনাকে সুস্থ করে তুলবে, সাফল্য এনে দেবে।

কোয়ান্টামের সদস্যদের সুস্থতার মূলেও রয়েছে এই বিশ্বাস। বিশ্বাস করে এগিয়ে এসেছেন বলেই তারা আজ সুস্থ ও রোগমুক্ত। নিঃসন্দেহে তারা ভাগ্যবান। তাদেরকে আহ্বান জানাই, এ অভিজ্ঞতা আপনারা সবাইকে জানান, পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করুন। যারা রোগ থেকে মুক্তি চান, সুন্দরভাবে বাঁচতে চান তাদেরকে জানান। মানুষের কল্যাণার্থে এ সুসংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দেয়া একটি নৈতিক কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

কথায় আছে, Patient cure themselves, Doctors show the way. তাই আপনার সুস্থতা ও নিরাময়ের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আর সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্যে সৃষ্টিকর্তা যা দিয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন অর্থাৎ শোকরগোজার থাকুন। প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন, নিয়মিত হাঁটুন, ব্যায়াম করুন এবং টেনশনমুক্ত জীবনযাপন করুন। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বাস এবং আশা যার নেই, তার কাছ থেকে দূরে থাকুন। সবসময় আশাবাদী, বিশ্বাসী ও ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন। আপনি নিঃসন্দেহে ভালো থাকবেন।

কোয়ান্টাম কোর্সে দেখেছি, মহাজাতকের কথায় মানুষ প্রাণ খুলে হাসেন। তার চমৎকার উপস্থাপনা-শৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছে। এমনিতে তিনি কম কথা বললেও আমি লক্ষ্য করেছি, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক অদৃশ্য প্রাণশক্তিতে তিনি সবাইকে হাসান, আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

আমি বিশ্বাস করি, তার এ শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। কারণ তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সুখী জীবনের পথ দেখানো। তাই কোয়ান্টামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ক্রমাগত এর ব্যাপকতা বাড়তে থাকবে, অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবে। একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি বলতে পারি যে, কোয়ান্টামের কার্যকারিতা এখন একটি প্রমাণিত সত্য যা সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

বান্দরবানের লামায় আমি গিয়েছিলাম। বড় বড় পীর দরবেশ ও মহামানবেরা যে পথ অবলম্বন করেছেন, কোয়ান্টামও সেখানে ঠিক একই পথ অবলম্বন করেছে। সেই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবসহ রয়েছে নানা প্রতিকূলতা। বঞ্চিত ও অভাবী সেই মানুষগুলোর মাঝে কোয়ান্টাম শিক্ষা ও উন্নত জীবনের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কোয়ান্টামের এ মহৎ উদ্যোগ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সদিচ্ছা, সৎপ্রচেষ্টা এবং সেই সাথে সৎ সহকর্মীরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হন তাহলে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না। সৎপথে থেকে সাহসের সাথে এগিয়ে চলা আমার নিজেরও স্বভাব। আমি বিশ্বাস করি, আন্তরিকতা এবং সততা জীবনস্রোতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছি সমাজের জন্যে কাজ করেছি। সমাজের যেকোনো ভালো উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করি নি। কোয়ান্টাম হলো এমনই একটি উদ্যোগ।

কোয়ান্টামের কার্যক্রম দেখে আমার উপলব্ধি হলো—এ তো সবে শুরু। ক্রমাগত সাফল্য ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে এ প্রতিষ্ঠান—পরম করুণাময়ের কাছে আমি এ প্রার্থনাই করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কাজের উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টামের প্রতিটি কাজেই আল্লাহর সাহায্য ও রহমত থাকবে।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জুলাই ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের ডায়েরি থেকে—

“বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে,
পরাণ গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে।”

—কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে এক জীবন্ত কিংবদন্তি জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। মার্চ, ২০১১-তে ৫ জন চিকিৎসক-সফরসঙ্গী নিয়ে তিনি বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম শিশুকানন পরিদর্শন করেন এবং পরবর্তীতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে অংশ নেন। প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে এবং পরবর্তীতে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের অনুভূতি এবং শিশুদের নিয়ে তার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি।

নিরাময় ও ইতিবাচকতার কার্যকর দিক-নির্দেশনা দেয় কোয়ান্টাম

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

আমাদের যত রোগ তার শতকরা ৭৫ ভাগই মনোদৈহিক। তাই অনেকসময় শুধুমাত্র ওষুধ দিলেই রোগী ভালো হয় না। আমার ধারণা, রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হলো আস্থা। কোয়ান্টাম কোর্সে এসে এত মানুষ যে ৪০ ঘণ্টা ধরে গুরুজীর কথা শুনছেন এবং অনেকেই নানারকম রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন—এর মূলে রয়েছে গুরুজী ও কোয়ান্টামের প্রতি সবার আস্থা ও বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসই মানুষকে নিরাময় করে, ইতিবাচক শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করে।

নানা ব্যস্ততা আর কাজের মধ্যেও এ বয়সে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসেছি, কারণ শেখার কোনো শেষ নেই, শেখার কোনো বয়স নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন মানুষ শিখতে পারে। হলভর্তি এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে টানা ৪ দিন শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে গুরুজী কী চমৎকারভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন—এটি সত্যিই আমার খুব অবাক লাগছে।

‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ ও ‘বদলে গেছে লাখো জীবন’—কোয়ান্টামের এ দুটো কথা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। ৪ দিন ধরে গুরুজী আসলে আমাদেরকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন এবং সফলভাবে সবার

মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে আমার বিশ্বাস–আল্লাহ, রসুল এবং অন্যান্য সকল ধর্মে মানবকল্যাণের যে কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমানকালের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ রয়েছে।

কোয়ান্টাম কোর্সে গুরুজীর আলোচিত কথাগুলো, যেমন–আল্লাহ ও রসুলের কথা এবং প্রত্যেক ধর্মের মানবপ্রেমের বাণী আমাকে খুব মোহিত করেছে। তাই আমি মনে করি, কোয়ান্টাম মেথড শতভাগ ধর্মসম্মত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানুষ বলে আমি জানি, আমাদের মস্তিষ্কে যে লক্ষ-কোটি নিউরোন রয়েছে, তার অনেকাংশই আমরা ব্যবহার করি না; কিন্তু এগুলোকে কীভাবে উজ্জীবিত করতে হয়, কাজে লাগাতে হয়–গুরুজী তা চমৎকার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই আমি বলবো, সব ধরনের নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হয়ে একজন ইতিবাচক মানুষ হয়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা রয়েছে কোয়ান্টামে। আমি বিশ্বাস করি, এ কোর্স আবহমানকাল ধরে চলতে থাকবে এবং আরো অগণিত মানুষ কোয়ান্টামের মাধ্যমে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবে।

কিছুদিন আগে আমাদের সুযোগ হয়েছিলো লামার শিশুকানন দেখার। সেখানে শিশুদের সাথে আমি গল্প করেছি, সুন্দর সময় কাটিয়েছি। এত সুন্দর আর প্রাণবন্ত একেকটি শিশু। প্রত্যেকে যেন স্বর্গের একেকটি ফুল। কবিগুরুর ভাষায়–'ইহাদের কর আশীর্বাদ, ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র ফুলকুঁড়িগুলি, নন্দনে এনেছে সংবাদ'। গুরুজী, মা-জী এবং কোয়ান্টামের সবাই তাদের ভালবেসে আপন করে নিয়েছেন নিজেদের সন্তানের মতো।

এ শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের যাকাতের একটি অংশ এখানে দিতে পারি, মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতে পারি। কারণ, যিনি ভালো কাজ করছেন তার কাজে সাহায্য করলে মানুষ উপকৃত হবে। আর ভালো কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা সবাই সওয়াবের অংশীদার হতে পারি। ইতোমধ্যেই লামায় শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।

শিশুদের নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। তারা আনন্দ পেলে হাসে, ব্যথায় কাঁদে। তাদের মন সরল ও অকৃত্রিম। তারা তাদের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা বোঝাতে পারে না, তাই তাদের জন্যে সবসময় ভালো কিছু করার চেষ্টা করি। নিয়ত থাকে শিশুদের সেবা করার এবং বিশ্বাস করি, আল্লাহ সাহায্য করবেন। আমার হাত-যশের রহস্য আসলে এটাই।

শিশুরা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি। কখনো কখনো

শিশুদের মা-বাবারা বলে, আপনার কাছে এলে অনেক সময় ওষুধ না খেলেও বাচ্চা ভালো হয়ে যায়। আসলে শিশুদের চিকিৎসা করতে হলে আগে তাদের বন্ধু হতে হবে। অনেক বাবা-মা বলেন, আপনি ঘরে আসার আগেও বাচ্চা কাঁদছিলো, আপনি যে-ই কোলে নিলেন, কান্না থেমে গেল। আমি মনে মনে হাসি। আসল কথা হলো শিশুদের প্রতি আমার ভালবাসা আর আকুতিটা বিধাতা বোঝেন এবং তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন।

শিশুদের নিয়ে এ যুগের মা-বাবাদের অনেক সমস্যা। প্রত্যেক মা-বাবাই চান তার সন্তান সর্বক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান হবে। কিন্তু ফার্স্ট তো সবসময় একজনই হয়। যে শিশু অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে সবাইকেই তার মতো হতে হবে–এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই বাবা-মায়েরা শিশুদের জীবনে টেনশন সৃষ্টি করেন এবং নিজেরাও অশান্তিতে ভোগেন।

একটি শিশু যে শুধু লেখাপড়ায় ভালো হবে তা তো নয়; তার আর্টে দক্ষতা থাকতে পারে, কবিতা কিংবা খেলাধুলায় দক্ষতা থাকতে পারে। সবাইকেই ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে কেন? আল্লাহ একেকজনকে একেকভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে এটা তো ঠিক নয় এবং উচিতও নয়। তাহলে আমরা নজরুলও পেতাম না, রবীন্দ্রনাথও পেতাম না, জসীমউদ্দীনও পেতাম না–অথচ এঁদেরকেও প্রয়োজন আমাদের সবার।

শিশুরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একটি শিশুর ভালো ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা গেলে পরবর্তীতে একজন সফল মানুষ, ভালো মানুষের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এজন্যে কৌটাদুধ ও ফাস্টফুড সংস্কৃতি পরিহার করে প্রথম থেকেই শিশুকে প্রাকৃতিক ও বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। আর এ দায়িত্ব প্রত্যেক মা-বাবার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শারীরিক শ্রম। সন্তানকে সারাক্ষণ ননীর পুতুলের মতো আগলে না রেখে তাকে স্বনির্ভর ও তার সাধ্যমতো শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। শিশুদের পরিপূর্ণ শারীরিক-মানসিক সুস্থতার সাথে গড়ে তুলতে চাইলে এ বিষয়গুলো অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

কোয়ান্টাম যে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে–এটা আমার খুব ভালো লাগে। কারণ আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই কাজ করে স্বার্থের জন্যে, হয় তার কিছু আর্থিক সুবিধা হবে অথবা সুনাম হবে কিংবা নেতা হওয়ার আশায়। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকারে সচেষ্ট থাকে এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। আমি দীর্ঘদিন থেকে কোয়ান্টামের বিভিন্ন সেবামূলক

কার্যক্রম দেখে আসছি। কিছুদিন আগে আমার স্ত্রীর অসুস্থতার সময় রক্তের প্রয়োজন হলে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকেই রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছিলো।

বান্দরবানের লামায় অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈচিত্রময় কর্মকাণ্ড দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। কোনো সরকারি বা বিদেশি অনুদান ছাড়া এমন একটি কাজ চালিয়ে নেয়া সত্যিই বিস্ময়কর। গুরুজী ও কোয়ান্টামের প্রতি আস্থা স্থাপিত হয়েছে বলেই মানুষ এখানে আন্তরিকতার সাথে কোটি কোটি টাকা দান করছেন।

আমি বিশ্বাস করি, সৎ নিয়তে কোনো উদ্যোগ নিলে এবং নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করলে আল্লাহ মানুষকে সাহায্য করেন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এই বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছাই প্রতিফলিত হোক–কায়মনোবাক্যে এটাই প্রার্থনা করি।

বয়সের কোঠা আশি পেরিয়ে গেলেও আমি নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। আমার কর্মব্যস্ততা দেখে অনেকে বলেন, ডা. খান এই বয়সেও এত দৌড়ায় কেন? আমার উত্তর একটাই–আল্লাহ তো মানুষকে জীবন দিয়েছেন কাজের জন্যেই। কাজ ছাড়া জীবনের সার্থকতাই বা কী? ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থেকে কী হবে? যতদিন শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে কাজ করে যাবো। আর এটা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, লামার মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার বরকতময় কাজে আমরা শরিক হতে পেরেছি। কোয়ান্টামের মাধ্যমে সেখানে গিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমরা স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া জানাই।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে লক্ষ মানুষের জীবন বদলে যাচ্ছে। এজন্যে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানানোর পাশাপাশি আমি গুরুজী, মা-জী এবং কোয়ান্টামের সব সদস্যের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সবার জন্যে এই দোয়াই করি–আল্লাহ যেন এ বরকতময় কাজে আরো সফলতা দেন।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, মে ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসা আন্দোলনের পথিকৃৎ জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির মিলিটারি হাসপাতালে তিনিই প্রথম কার্ডিয়াক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সেন্টার থেকেই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি হয়। বাংলাদেশে বিএসএমএমইউ-তে (তৎকালীন আইপিজিএমআর) কার্ডিয়াক বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। অধ্যাপক ডা. মালিক ২৩ এপ্রিল, ২০১০-এ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সুস্থ জীবনধারা, প্রার্থনা ও মেডিটেশন হৃদরোগ প্রতিরোধ করে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক

মানুষ শুধু একটি দেহ নয়। দেহ ও মন–এ দু'য়ের সমন্বয়ে একজন মানুষ। পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাই শরীর ও মন উভয়ের সুস্থতা জরুরি।

আমাদের দেহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি চমৎকার সিস্টেম অনুসারে চালিত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, সুষম রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে রোগাক্রান্ত হলেও আমরা সেরে উঠি। শরীরের একটা হাড় ভেঙে গেলেও শরীর তার নিজস্ব নিরাময় প্রক্রিয়ায় তা মেরামত করে, আবার কর্মক্ষম করে তোলে। আর এক্ষেত্রে ডাক্তার ওষুধ হাসপাতাল কাজ করে সহায়ক শক্তি হিসেবে। স্রষ্টার দেয়া অমূল্য এসব নেয়ামত সম্পর্কে সচেতন নই বলেই আমরা আসলে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে পারি না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতায় বিশ্বজুড়ে সংক্রামক ব্যাধির পরিমাণ এখন অনেক কমে গেছে। কিন্তু আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে প্রাণঘাতী বিভিন্ন অসংক্রামক ব্যাধি, যেমন–হৃদরোগ স্ট্রোক ডায়াবেটিস ক্যান্সার। বিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ হৃদরোগ ও স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অথচ আমাদের একটু সচেতনতা ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এসব রোগ এড়াতে পারি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হৃদরোগ মহামারি আকারে দেখা দেবে। আর এই রোগ একদিনে হুট করে হয় না। দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে মূলত এ রোগের সূত্রপাত ঘটে।

ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা শুরু হতে পারে ৮-১০ বছর বয়স থেকেই। তারপর রোগ দেখা দেয় সাধারণত মধ্য বয়সে। যে বয়সে একজন ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্যে অবদান রাখতে পারেন সে বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরিবারের বোঝায় পরিণত হওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক বটে। আর হৃদরোগ চিকিৎসার চেয়ে এটি প্রতিরোধ করা অনেক সহজ।

তাই হৃদরোগ প্রতিরোধে মূল বিষয় হওয়া উচিত সচেতনতা। এজন্যে শৈশব থেকেই সুষম খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও সুস্থ জীবনধারা অনুসরণের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। কারণ আজকাল অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে এমনকি শিশুদের মধ্যেও হৃদরোগ ডায়াবেটিস মেদস্থূলতা ও উচ্চ রক্তচাপ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। এর প্রধানতম কারণ হলো শাকসব্জি-ফলমূল না খাওয়া, ফাস্টফুড ও কোমল পানীয়ের প্রতি আসক্তি, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং খেলাধুলার অপ্রতুল সুযোগ।

আর এসব ব্যাপারে নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সবাইকে সচেতন করার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান সময়ে যত রোগ হচ্ছে তার পেছনে মানুষের জীবনধারা শতকরা ৫৩ ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী।

আমরা আসলে না বুঝেই স্রষ্টাকে দোষ দিই, কিন্তু স্রষ্টাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। স্রষ্টা এক অসাধারণ কর্মক্ষমতাময় স্বয়ংসম্পূর্ণ দেহশৈলী দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে পাঠিয়েছেন। আমাদের অসুস্থতা ও দুর্দশার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই দায়ী। আমাদের আচরণ, অভ্যাস এবং জীবনযাপনে অপরিমিতি ও অনাচারের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা রোগ ভোগ করি, যন্ত্রণা-অস্বস্তির শিকার হই। কোরআনে বলা হয়েছে, 'জলে-স্থলে সব জায়গায় যত বিপর্যয়–সব মানুষের সৃষ্টি'। তাই সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আমাদের সুস্থতার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে।

শরীরের ওপর মনের প্রভাব অপরিসীম। তাই দেহের পাশাপাশি মনের যত্ন নেয়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মন বা আত্মা ভালো না থাকলে শরীরও ভালো থাকে না। কাজেই আমাদের দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে

তুলতে হবে। এজন্যে নিয়মিত নামাজ, প্রার্থনা ও মেডিটেশন করা উচিত।

চাপমুক্ত জীবনযাপন, মানসিক সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্যে রিলাক্সেশন বা শিথিলায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে তাই এটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কোয়ান্টামে যে মেডিটেশন বা ধ্যানের কথা বলা হয়েছে, তা সব ধর্মেই আছে। কারণ, সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের জন্যে। বিভিন্ন ধর্মে আত্মশুদ্ধির নানা প্রক্রিয়া আছে। পথ যা-ই হোক, একমাত্র আন্তরিক অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা সত্যে পৌঁছাতে পারি।

হৃদরোগের অনেক অত্যাধুনিক চিকিৎসা এখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস অপারেশনসহ এসব চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুলও বটে। এছাড়া ওষুধের পেছনেও হৃদরোগীদের খরচ খুব একটা কম নয়। আর এসব ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া তো আছেই। তাই প্রথম থেকেই চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া, ধূমপান বর্জন, দেশি ও মৌসুমী ফল খাওয়া, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বিশেষত দৈনিক কমপক্ষে আধাঘণ্টা হাঁটা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক চাপমুক্ত জীবনযাপন করা প্রয়োজন।

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে মেডিটেশন এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। আমেরিকার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ডীন অরনিশের চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও মেডিটেশনের মাধ্যমে হাজারো হৃদরোগী অপারেশন ও এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠছেন।

হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে একজন বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন। বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসাব্যবস্থা দেখে তার মন্তব্য ছিলো, আমরা এখন তাদের সমপর্যায়ে চলে গেছি। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা আমেরিকা ইংল্যান্ডে গিয়েও অনেক ভালো কাজ করছে। আমরা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারলে তারা সব ক্ষেত্রে দেশেই ভালো কাজ করতে পারবে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষের উপকারে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং মানুষের আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে এজন্যে আমি অভিনন্দন জানাই। কারণ একজন মানুষ আলোকিত না হলে তার সাথে অন্য প্রাণীর কোনো পার্থক্য থাকে না। একজন আলোকিত মানুষই প্রকৃত মানুষ।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক-এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের কিছু কথা' থেকে–

হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রেখে সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের জন্যে করণীয় :

- ☐ ধূমপান বর্জন করুন
- ☐ সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন
- ☐ তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন
- ☐ ফলমূল ও শাকসব্জি বেশি খান
- ☐ লবণ ও চিনি কম খান
- ☐ শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন
- ☐ নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করুন
- ☐ বেশি বেশি হাঁটার অভ্যাস করুন
- ☐ উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে রাখুন
- ☐ বাচ্চাদের গলাব্যথা ও বাতজ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
- ☐ বয়স ৪০ বা তার বেশি হলে প্রতি ৬ মাসে ১ বার রক্তে চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করুন
- ☐ যাদের পরিবারে হৃদরোগ রয়েছে, তারা সাবধানতা অবলম্বন করুন
- ☐ যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করুন
- ☐ নিয়মিত নামাজ প্রার্থনা মেডিটেশন শিথিলায়ন করুন

জাতীয় অধ্যাপক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ মরহুম সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান। ১৯৯৬ সালে ঢাকার বিসিআইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ওয়ার্কশপে তিনি এ ভাষণ দেন।

ধ্যান ॥ আত্ম আবিষ্কারের হাতিয়ার

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

বিখ্যাত ফরাসি আধুনিক কবি পীয়েরে ইমেনুয়েলের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তিনি প্যারিসে একবার তার বাসায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তুমি নিজেকে কখন আপন করে পাও?” অন্য প্রসঙ্গ থেকে হঠাৎ এ প্রশ্ন করাতে আমি একটু অসুবিধা বোধ করলাম।

তারপর তিনি নিজেই বললেন, “দেখ আমি সবসময় এই প্যারিসে থাকি, প্যারিসের পথ দিয়ে হাঁটি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না যে আমি পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পথের মানুষের শব্দ শুনি না, অনুষ্ঠানে গিয়ে অনুষ্ঠানের দৃশ্য দেখি না এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যে কর্মের যে আন্দোলন সেগুলোও অনুভব করি না। আমি সবসময় নিজেকেই অনুভব করি”।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, “মানুষ যদি চিত্তের মধ্যে একাগ্রতা নির্মাণ করতে পারে তাহলেই সেটা সম্ভবপর”।

আরেকজন বিখ্যাত ফরাসি লেখক রোজেক আইওয়া। এক নিমন্ত্রণে তার বাসায় গিয়ে দেখি তার ঘরগুলো সব পাথরে ভর্তি। টুকরো টুকরো পাথর। নানা রঙের পাথর। বিচিত্র রকমের পাথর ছড়ানো ছিটানো রয়েছে চারদিকে। শুধু পাথর আর পাথর। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে দামী যে পাথর, তার নিদর্শন সেখানে আছে; সাগরতীরের যে নুড়ি, তার নিদর্শনও সেখানে আছে। এর ওপর তার একটি কবিতার বইও আছে।

সবকিছু ঘুরে ফিরে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি এতে কী আনন্দ পান। তিনি জানালেন "সবচেয়ে নির্জন হলো পাথর আর মানুষ সবচেয়ে কোলাহলমুখর। পাথর যেহেতু নির্জন সেহেতু পাথর কী বলতে চায় তা আমরা জানি না। পাথর আমাদের দিকে তাকায়, পাথর স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে স্তব্ধতার মাঝেও যেন সব কথা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। অসম্ভব নীল একটি পাথর দেখলে কি তোমার মনে হয় না যে, এর মধ্যে পৃথিবীর আনন্দ, উচ্ছলতা একেবারে জমাট বেঁধে আছে? অথবা একটি লাল পাথরের মাঝেও কি তুমি আবেগ ও উত্তেজনার সংক্রমণ লক্ষ কর না? এ কারণে আমি পাথর সংগ্রহ করেছি পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে।"

মানুষকে সবসময় কোথাও না কোথাও অনুসন্ধান করতে হবে একটি নির্জনতাকে। এ নির্জনতা মানুষকে কর্মব্যস্ততার মধ্যে, কোলাহলের মধ্যেই আবিষ্কার করতে হবে। অধিকাংশ সময়ে লক্ষ্য করি, আমরা কিন্তু নির্জনতা কামনা করি না। আমরা পাগল হয়ে যাই নির্জন অবস্থায় থাকলে। মনে করি, এ নির্জনতা বোধ হয় আমার অসুবিধা সৃষ্টি করছে। সুতরাং মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে ছুটে যাই।

আমি একবার দুসেলডর্ফে একটি হোটেলে এক ঘরে একা ছিলাম রাত্রি বেলা। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি। ঘুম হচ্ছে না দেখে গোসল করে নিলাম। গোসল করেই মনে হলো আমার বোধহয় মৃত্যু এগিয়ে আসছে। আমি দরজাটা খুলে দিলাম।

দরজা খুলে দেবার পর হোটেলের প্রহরী এসে উপস্থিত। সে বললো, "দরজা খুলেছেন কেন? বন্ধ করুন"। আমি বললাম, "বাইরে যাবো"। সে তখন দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বললো। বাইরে বেরিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই। তখন গরমের সময় হলেও রাতে বেশ শীত। আমি হাঁটতে বেরোলাম। তখন আমার মনে হলো, ঘরে যে একাকিত্ব আর বাইরের প্রকৃতির যে একাকিত্ব–এ দুয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাত।

প্রকৃতি সত্যিই মানুষকে সান্ত্বনা দেয়, মানুষকে স্পর্শ করে। ঘরে পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদিও কোলাহল সৃষ্টি করে। সেজন্যে ঘরের নির্জনতাও আমাদের কাছে নির্জনতা বলে অনুভূত হয় না। আমি সেই নির্জনতাকে অনুভব করতে পারি নি ঘরের মধ্যে। কিন্তু বাইরে ভিড়ের মধ্যে আমি নির্জনতাকে অনুভব করতে পেরেছি।

আমার একটি বই আছে–'উচ্চারণ'। এতে আমার বিভিন্ন সময়ের চিন্তাগুলো লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে এক জায়গায় লিখেছিলাম–মানুষ কখন

কোথায় নিজেকে একা পায়? নদীতীরে, সমুদ্রতীরে, পাহাড়ের গুহায়, না কি লোকালয়ে? আমি বহু সমুদ্রতীরে গিয়েছি। সমুদ্রের প্রতি আমার এ আকর্ষণ বহুদিনের। আটলান্টিকের তীরে গিয়েছি, ব্রাজিলের কোপা-কাপানা বিচে গিয়েছি। সেখানে তন্ময় হয়ে সমুদ্রকে দেখবার চেষ্টা করেছি। আমি বহুবার চেষ্টা করেছি উত্তর পেতে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমি পাই নি।

আগের দিনে মানুষ নির্জনতার সন্ধানে গুহায় চলে যেত। গৌতমবুদ্ধ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। মানুষের বার্ধক্য ও জরা-মৃত্যু দর্শনে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিলো–এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য কী? আমাদের জন্ম কি বার্ধক্য লাভের জন্যে, অসুস্থতা ভোগ করে মৃত্যুতে গত হবার জন্যে? পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কী?

এসব প্রশ্নের জবাব পাবার জন্যে তিনি গৃহে যুবতী স্ত্রী এবং পুত্রসন্তান রেখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। মুকুট ফেলে দিয়ে গেরুয়া-বসন ধারণ করলেন। নানাভাবে কঠোর তপস্যা করলেন। কিন্তু কঠোর তপস্যায় তাঁর শান্তি হলো না। তখন সম্পূর্ণ নির্জনতার মাঝে তিনি চলে গেলেন।

পরবর্তীতে সে নির্জনতাকে প্রমাণ করার জন্যে তিনি লোকালয়ে ফিরে এলেন। সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক। যে পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো তারা গৌতম বুদ্ধের ফিরে আসা সম্পর্কে আলোচনা করছিলো। তাদের একজন বললো, "ও যখন বেরিয়ে আসবে তখন আমি ওর দিকে তাকাবো না, আকাশের দিকে তাকাবো"। আরেকজন বললো, "ও যখন বেরিয়ে আসবে তখন আমি বসে থাকবো"। অন্যজন জানালো সে বুদ্ধের আগমনে পিছন ফিরে থাকবে।

কিন্তু গৌতম বুদ্ধ যখন বেরিয়ে এলেন তখন সবাই উঠে দাঁড়ালো। তখন একজন বললো, "ভিক্ষু, তোমার দৃষ্টি, তোমার শরীর এত মধুর"। বুদ্ধ তাকে কিছু বললেন না। একাকিত্বকে তিনি উপার্জন করেছেন এবং সমস্ত মানুষ তাঁর একাকিত্বকে লক্ষ করেছে।

রীস জেভিস আমাদের পয়গম্বর রসুলে খোদা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের একটি তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রথম দিকে সাধনার পর্যায় পর্যন্ত আর রসুল (স)-এর সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।"

নবীজী দীর্ঘ সময় মানুষের মধ্যে, বহু ঘটনার কোলাহলের মধ্যে থেকেও তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। যে হেরা গুহায় তিনি সাধনা করতেন অনেকেই সেটি দেখেছেন। সেখানে, সে সময়ে মক্কা শহর থেকে,

জনপদ থেকে দূরে, অনেক বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে, সেই হেরা গুহার ওপর উঠতে হতো।

সে গুহাটা এখনও আছে। তার মধ্যে রসুল (স) নির্জনতার সাধনা করতেন। তিনি কী করতেন তা কেউ জানেন না। কিন্তু দীর্ঘ সময় সাধনার পর তিনি নিজেকেই আবিষ্কার করলেন। আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা যখন তাঁকে বললেন, "তুমি পাঠ কর। আল্লাহর নামে তুমি পাঠ কর।" সে পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করলেন। এ অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেই তিনি মানুষের মাঝে সে অস্তিত্বের তাপ, অস্তিত্বের সঞ্চয়, অস্তিত্বের আনন্দ ও হিল্লোল ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

ফতেহ মক্কার পর মহিলারা এলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর হাত স্পর্শ করতে–তারা সিদ্ধি লাভ করতে চায়। তিনি একপাত্র পানি রাখলেন। পানির মধ্যে হাত ডুবিয়ে তুলে নিলেন। তারপর বললেন, "আমি ঐ পানি স্পর্শ করেছি। তোমরা ঐ পানিতে হাত ডোবালে আমার স্পর্শ পাবে। পানিতে হাত রেখে তোমরা আমার সাথে কথা বলো।"

এই যে অসাধারণ কল্পনা, অসাধারণ কবিতা–এর তুলনা হয় না। সে জন্যেই আমাদের জীবনে মেডিটেশন বা নির্জনতা বা একাগ্রতার সাধনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা নাগরিক মানুষ। নাগরিক কোলাহলের মাঝে আমাদের বসবাস। তাই এ সময়কে, এ অবস্থাকে মেনে নিয়েই আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বটাকে আবিষ্কার করতে হবে।

প্রতিটি মানুষই অনন্য। দুজন মানুষ কখনো একরকম নয়। যেমন, আকৃতিতে এক নয়, বর্ণ-বিভায় এক নয়, উচ্চারণে এক নয়, তাদের আঙুলের ছাপও এক নয়। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে শুধু তারা এক। অন্তরের চিন্তার দিক থেকেও তারা স্বতন্ত্র।

সুতরাং প্রতিটি মানুষ যে এক একটি একক, সেই একক সত্তাকে আবিষ্কার করতে হবে। সমাজ-সংসারের কর্মব্যস্ততায় আমরা আমাদের সেই এককত্বকে হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের বড় প্রয়োজন সেই এককত্ব আবিষ্কার করা। আর ধ্যানের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

ইসলামের সুফিরা এবং হিন্দুদের যোগীরা ধ্যানের কতগুলো প্রকরণ ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ধ্যানের প্রকরণগুলো অনেক রকম এবং শরীরের মধ্যে এই প্রকরণগুলো আছে। হিন্দু সাধকরা এগুলোকে বলেন চক্র। চোখ বন্ধ রেখে এইরূপ বিভিন্ন চক্রে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়। তখন একজন মানুষ অনুভব করে, ওখানে যে একটি অস্তিত্ব আছে সেটা যেন নড়ছে। তখন সমস্ত

পৃথিবীর অস্তিত্ব তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। সমস্ত মানবসমাজ মিথ্যে হয়ে যায়। সমস্ত অতীত মিথ্যে হয়ে যায়। জেগে থাকে শুধু ঐ অংশটুকু। এই প্রক্রিয়ায় একজন সাধক ক্রমান্বয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেন।

মুসলমানদের সুফিরাও কিন্তু একইরকম ভাবেন। তাঁরা বলেন যে, শরীরের মধ্যে ক্বাল্‌ব খফী আখ্‌ফা ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু স্থান আছে যেগুলোকে জাগ্রত করতে হবে। যখন জাগ্রত হয় তখন নিজের যথার্থ অস্তিত্বকে বোঝা যায়।

সুফিরা ধ্যানস্থ হয়ে আরেকজনের আত্মার অনুভূতিটা নির্ণয় করতে পারেন। তাঁরা কারো দিকে ধ্যানস্থ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বলে দিতে পারেন যে, সে এই মুহূর্তে এই চিন্তা করছিলো। আমার নিজের জীবনেই আমি এটা প্রত্যক্ষ করেছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা কীভাবে সম্ভব? এটা সম্ভব। কেননা আমরা কনসেনট্রেশনের মাধ্যমে আরেকজনের হৃদয়কে একাগ্র করে ফেলছি। একাগ্র হওয়ার পর তার হৃদয় আমার হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলছে এবং তখন তার চিন্তা ও অনুভব আমার চেতনায় ধরা পড়ছে।

এটা বাস্তবেও প্রমাণ করা সম্ভব। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্টরা বলেন, ধরা যাক একজন হেঁটে যাচ্ছে। এখন তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ তার ঘাড়ের দিকে একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কিছুক্ষণ পর সে ঘাড় ফেরায়। এটা ঘটার কারণ হচ্ছে যে, একজনের দৃষ্টির সঙ্গে আরেকজনের শরীরের মাঝে একটি আকর্ষণ শক্তি কাজ করে।

সংস্কৃত উপনিষদে একটা কথা আছে 'আত্মানাং বিদ্ধি'। অর্থাৎ আত্মাকে জানো। আরো বলা হয়েছে 'ভূমৈব সুখং'। অর্থাৎ ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। ভূমা অর্থাৎ বৃহৎকে আমি পাবো, অল্প বা ক্ষুদ্রকে নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ রসোচ্ছলে চমৎকার বলেছেন, "তোমার যদি বড় হবার আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তুমি যদি শুধু কেরানি হতে চাও, তাহলে কেরানিই হবে। আর কিছু হবে না। কিন্তু তুমি যদি চাঁদকে স্পর্শ করতে চাও তবে চাঁদকে স্পর্শ করতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারবে।" সুতরাং ভূমা অর্থাৎ বৃহৎকে চাওয়াটাই হলো বড় কথা।

আমরা যারা সাধনার পথে অগ্রসর হচ্ছি, আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা করছি, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে একাগ্রতা অর্জন করা এবং নিজের এককত্বকে অনুভব করা। আত্মার গভীরে ডুব দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় যে, সত্যিই আমি একা, আমি আলাদা, আমি ভিন্ন; তবে আমি সকলের সঙ্গে মিলে আছি,

সকলের মধ্যেই থাকবো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার একটা নিজস্বতা আছে। এটা অনেক বড় বোধের ব্যাপার।

বিজ্ঞানও মানুষের এই অনন্যতা ও এককত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো মানুষের আঙুলের ছাপের সঙ্গে আরেকজনের আঙুলের ছাপের কখনো মিল হয় না। তাদের কণ্ঠস্বরও ভিন্নতর।

মেডিটেশন বা ধ্যান হচ্ছে আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-অনুভবের মাধ্যম ও হাতিয়ার। ধ্যানকে পবিত্র মনে করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ–সে কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করুক কিংবা নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করে একাকী বসে থাকুক–আমি তাকে ধ্যানরত দেখতে চাই। যখনই সে সময় পাবে তখন কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও সে যেন ধ্যানে নিমগ্ন হয়। আর যেকোনো প্রার্থনা বা উপাসনাই হোক–তার মূল শক্তি হচ্ছে মনোযোগ ও একাগ্রতা।

এ প্রসঙ্গে গালিবের একটি গল্প রয়েছে। তার মদ্যপানের অভ্যাস ছিলো অসম্ভব বেশি। একদিন তার মদ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে লোক মদ আনতে গেছে, সে আর ফিরছে না। ওদিকে মদের তৃষ্ণায় তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তখন তিনি ভাবলেন, আল্লাহর কাছে চাইলেই নাকি সব পাওয়া যায়। তবে যাই, মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছেই আবদার জানাই।

এই ভেবে গালিব সবে এক রাকাত নামাজ আদায় করে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করেছেন–এর মধ্যেই দেখলেন যে, তার শিষ্য মদের বোতল নিয়ে আসছে। অমনি তিনিও নামাজ ফেলে দৌড়ে চলে গেলেন। পরে লোকজন তার কাছে নামাজ ফেলে চলে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি হেসে জবাব দিলেন, "এক রাকাত পড়তেই আল্লাহ খুশি হয়ে গেছেন। তাই আমার শরাব চলে এসেছে।" কৌতুককর হলেও গল্পটির অন্তর্নিহিত অর্থে একাগ্রতার গুরুত্বই প্রকাশ পায়।

আজ চতুর্দিকে যে সন্ত্রাস ও মিথ্যাচারের রাজত্ব, চারদিকে মানুষের অবমাননার আপ্রাণ চেষ্টা–এ মিথ্যাচার ও আত্মার অবমাননা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে প্রত্যেকের উচিত তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে দেখা। সকলের উচিত ভেবে দেখা–কেন আমি জন্মেছি, আমার অস্তিত্বের দাবি কী।

এ আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা পরম সত্যকে জানবো, আনন্দকে খুঁজে পাবো, বিশ্বাসকে অনুভব করবো এবং সবশেষে যথার্থ সেই মহার্ঘ বস্তুকে পাবো। ধ্যানের সার্থকতা এখানেই।

[৫০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টিয়া' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। শিক্ষাবিদ গবেষক প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। বিশ্বসাহিত্যের অসংখ্য নাটক কাব্য ও গবেষণাগ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি। সদ্যপ্রয়াত এই কর্মী-পুরুষ গত কয়েক দশক ধরে জাতির মননশীলতার বিকাশ এবং কুসংস্কার ও মতান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত রেখেছিলেন তার কর্মপ্রচেষ্টা। ৩০ মে, ২০০৬-এ কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি আলোচনা করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম ও সমাজ-সচেতনতার নানা দিক নিয়ে।

বিশ্বাসের শক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই আমরা এগিয়ে যাবো

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ প্রতিভা। মূলত একজন কবি হিসেবেই আমরা তাকে জানি। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ তাকে করে তুলেছে অনন্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং অন্যান্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে বিশ্বমানবিকতা ও সার্বজনীন বোধের কথা বলা হয়েছে, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা উচ্চারিত হয়েছে–বিশ্বসাহিত্যে তার উদাহরণ দুর্লভ।

গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাস, ভালবাসা ও আকুতিকে তিনি গীতাঞ্জলির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তার সমগ্র সাহিত্যকর্মে মানব-মনের বিচিত্র অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন। তার সৃষ্টিতে আমরা উচ্ছ্বসিত আনন্দের কবিতা যেমন পাই, তেমনি চরম বিষাদের কবিতাও তিনি লিখেছেন অভূতপূর্ব ভাষায়। তার কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় হরেকরকম অনুভূতির নির্যাস। মৃত্যুর দুদিন আগেও বিছানায় শুয়ে তিনি রচনা করেছেন–‘*তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি,/*

বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী .... / অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

সৃষ্টির পরিমাণ আর বহুমুখীনতার বৈচিত্রে ও ঐশ্বর্যে রবীন্দ্রনাথ তুলনাহীন। বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে তার সৃজনশীলতা বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত। যেকোনো ভাষা তার নিজস্ব গতিতে চললেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষার মানকে অনেক উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছে।

কবিতা গান ছোটগল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ভ্রমণ-কাহিনী পত্রসাহিত্য–এমন কোনো অঙ্গন নেই যা তার লেখনীর দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নি। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও তার সৃষ্টি বাংলার প্রকৃতি, মাটি ও মানুষের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, তার রচিত মহাকাব্যিক উপন্যাস 'গোরা' সারা পৃথিবীর পাঠকের কাছে একটি মহৎ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরো আছে তার আঁকা ছবি–সত্তরোর্ধ্ব বয়সে অসাধারণ সব চিত্রকর্ম এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি চির আধুনিক। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু একসময় মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি আধুনিক নন, বরং আধুনিকতাকে তিনি যেন আটকে রেখেছেন পাহাড়-নদী-সমুদ্রে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি নিজেই আবার বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চাইতেও আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে–'*ওহে জীবন বল্লভ/ মাঝে মাঝে তব দেখা পাই/ চিরদিন কেন পাই না*'। তার সৃষ্টির এক উল্লেখযোগ্য অংশ তার গান। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, তার গানের মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের এ আশাবাদ মিথ্যে হয় নি।

বাংলা গানে সুরের সাথে কথার মিশেলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানে বাণী এবং সুর যেভাবে একাত্ম হয়েছে পৃথিবীর অনেক বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ আর শিল্পীর কাজেও তা দুর্লভ। তার গানগুলোতে রাগ-রাগিণীর যে অভূতপূর্ব সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা দেখতে পাই–এককথায় তা অসাধারণ।

কবি-সাহিত্যিকদের সামাজিক ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা সমাজের বাইরের কেউ নন। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে আমরা অনেকসময় তার সামাজিক-রাজনৈতিক

ভূমিকার কথা বিস্মৃত হই। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় জুড়ে আছে তার সমাজ-সচেতনতা। তৎকালীন ভারতবর্ষে ইংরেজদের জঘন্যতম জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশদের দেয়া 'নাইট' খেতাব বর্জন করেন।

আশি বছর বয়সে 'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের আসল রূপটি তুলে ধরেছেন এক অতুলনীয় ভাষায়—"*সমস্ত ইউরোপে বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারি পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভেতর থেকে জাগ্রত হয়ে আজ মানবতার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। ....ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পেছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? ....যৌবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আজ আমার বিদায়ের দিনে সেই বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল.... ।*"

পাশ্চাত্যের এই রূপ তো এখন আমরা নিজেরাই দেখছি। রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় আগে তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটা বুঝতে পেরেছিলেন।

শিল্পকলার বিকাশ ও পরিচর্যার জন্যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাপান, ইতালি, ইউরোপসহ সারা পৃথিবী থেকে তিনি সেখানে পণ্ডিতদের জড়ো করেছিলেন। শুধু শিল্পকলা নয়, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, কৃষি, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি বিষয়ও ছিলো রবীন্দ্রনাথের ভাবনা জুড়ে।

সেই যুগে অভিভাবকরা যখন ছেলেকে বিলেত পাঠাতেন শুধুমাত্র ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে, তখন রবীন্দ্রনাথ তার একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন কৃষিতে পড়াশোনার জন্যে। রথীন্দ্রনাথের প্রতি তার উপদেশ ছিলো—'তুমি কৃষিবিদ্যা শিখে আসো, দেখো আমাদের চাষবাসের ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি করা যায় কি না।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। তাই আমি মনে করি, শত বাধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাসের শক্তিতে সকল বিপর্যয় কাটিয়ে উঠবে এবং স্ব-মহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে অবশ্যই

সক্ষম হবে। বিশ্বাসের শক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই আমরা সবাই কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবো বলে আমার বিশ্বাস।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নানামুখী কার্যক্রম সম্পর্কে আমি জেনেছি। কোয়ান্টামের সদস্যরা বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিজেদের একটা শুভ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আত্ম উপলব্ধির পাশাপাশি তারা মানুষের ও সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগে ব্রতী হয়েছেন। এভাবে আত্ম উন্নয়ন ও নিঃস্বার্থ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে জাতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠাকে আমি অত্যন্ত গৌরবের বলে মনে করি।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, মে ২০০৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মুক্ত বিশ্বাস থেকেই শুরু হয়
মানবিকতার উত্থানপর্ব।
মুক্ত বিশ্বাস প্রতিটি কাজে
চিত্তকে করে একাত্ম।
আর কাজের সাথে
একাত্ম হতে পারলেই
প্রতিটি কাজ হয়ে ওঠে
আনন্দের উৎস।

সভ্যতার সবকিছু
মানুষের সৃষ্টি।
আপনিও মানুষ।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর সেনানী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার। মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিভিন্ন সময় তিনি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাই-কমিশনার এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন।

স্বপ্নের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবোই

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার

১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর গ্রুপ-ক্যাপ্টেন হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলাম। ঢাকায় এয়ারফোর্সের বাঙালিদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার। ২৫ মার্চ রাতে ঘটে গেছে ইতিহাসের বর্বরতম সেই হত্যাকাণ্ড যখন পাকিস্তানি বাহিনী রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিদের ওপর। গুলি করে মেরেছিলো হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে।

এত আগুন জ্বলেছিলো সে রাতে যে, রাতের আকাশও আগুনের আঁচে টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিলো। আর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিজের বিলাসবহুল রুমের জানালা দিয়ে সেই হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলেন পাকিস্তানের কুখ্যাত রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো। সকালবেলা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি তার প্রতিক্রিয়া জানান–"Thank God, Pakistan has been saved" অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশ–সে সময় যাকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো, তাকে তিনি পাকিস্তান বলে মনে করেন না এবং তার ক্ষতি নিয়েও তিনি বিচলিত নন–এ মনোভাবই বোধ করি ফুটে উঠেছে এ মন্তব্যে।

২৭ মার্চ বিকেলবেলা বিষণ্ন মনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার এয়ারফোর্স মেসের কাছেই একটা পুকুরের পাশে। হঠাৎ দেখলাম, একজন পাকিস্তানি

ব্রিগেডিয়ার তার কমান্ডোদের নিয়ে মেসের পেছনদিকে নাখালপাড়া বস্তির পুরোটাকে ঘিরে ফেলেছে এবং মেশিনগান বসাচ্ছে। তার এ কার্যকলাপ দেখে মেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ার এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি করছো তুমি?" পাকিস্তানি এই সামরিক কর্মকর্তা এ যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন এবং সেজন্যে অবশ্য কিছুদিন পরই পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সামরিক আদালতে তার বিচার হয় এবং তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

এক পর্যায়ে বস্তি ঘেরাওকারী কমান্ডো বাহিনী 'ফ্লেম থ্রোয়ার' নামে আগুন ছুঁড়ে দেয়ার একটি মেশিন দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অগণিত নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ চিৎকার করতে করতে ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

তখন চলছিলো সামরিক সরকার কর্তৃক জারিকৃত কারফিউ এবং রাস্তায় দেখামাত্র গুলির নির্দেশ। বস্তি থেকে আতঙ্কে ছুটে বেরিয়ে আসা শত শত মানুষের ওপর পাকিস্তান বাহিনী তখন নির্বিচারে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করতে লাগলো এই অজুহাতে যে, তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কারফিউ ভঙ্গ করেছে। এটি ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে আমার চোখের সামনে ঘটা নৃশংসতম বর্বরতাগুলোর একটি।

সে রাতেই সিদ্ধান্ত নিই যা-ই ঘটুক না কেন, এ সরকারের অধীনে আর কাজ করবো না। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আরো কয়েকজন ফাইটার পাইলটের সাথে যোগাযোগ করলাম। সব মিলিয়ে ১০ জন পাইলট তাদের পরিবার নিয়ে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের জন্যে এগুতে লাগলাম। একটি দল আগরতলায় পৌঁছে গেল। আমাদের দলটি সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলো সীমান্তের একদম কাছে শিবের বাজার নামে একটি গ্রামে।

সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হেঁটে আমরা সবাই ভীষণভাবে ভিজে গিয়েছিলাম, পথের ক্লান্তি আর ক্ষুধা তো ছিলোই। গ্রামের বাজারে একজনের কাছে আশ্রয় চাইতেই সে আমাদেরকে একজন কৃষকের সাথে যেতে বললো। আমরা গেলাম। একটা কুঁড়ে ঘরে খড়ের বিছানা পেতে আমাদের সবাইকে ঘুমুতে দেয়া হলো।

হঠাৎ রাত আড়াইটার দিকে শুনি দরজা ধাক্কানোর শব্দ। সঙ্গী পাইলটরা সাথে সাথে অস্ত্র হাতে অবস্থান নিয়ে ফেললো। কিন্তু দরজা খুলে বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম–যখন দেখলাম কৃষক এবং তার স্ত্রীর হাতে আমাদের জন্যে গরম ভাত এবং মুরগির মাংসের তরকারি। দরিদ্র এই কৃষক

তার ঘরের যৎসামান্য চাল এবং পালা মুরগি জবাই করে এই রাত আড়াইটার সময় আমাদের জন্যে রান্না করে নিয়ে এসেছেন। মানুষের নিষ্ঠুরতার ঘটনা দেখতে দেখতে শক্ত পাথর হয়ে ওঠা আমার এই মন সেদিন রাতে নিভৃত পল্লীর এক দরিদ্র, অশিক্ষিত কৃষকের মানবিকতার দৃষ্টান্ত দেখে আপ্লুত হয়ে পড়লো। যুদ্ধের পরে পুরো গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া সেই খাঁ খাঁ শিববাড়িতে গিয়ে অনেক খুঁজেও তাকে আর পাই নি।

সে সময় পাকিস্তানি বাহিনী ছিলো অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ৯৩ হাজার সেনাদলের একটি সুসংগঠিত বাহিনী। আর এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যারা, সেই মুক্তিবাহিনী ছিলো যুদ্ধ সম্পর্কে কোনোরকম পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন নামমাত্র প্রশিক্ষণে তৈরি একটি বাহিনী, যাদের রসদ বলতে গেলে কিছুই ছিলো না।

১৯৭১-এর আগস্টে একবার মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলাম। একটা শতচ্ছিন্ন ত্রিপলের নিচে গাদাগাদি করে তিনশ মুক্তিযোদ্ধার থাকার ব্যবস্থা। এদের কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। আমরা যখন গেলাম তখন তারা ঠান্ডা ভাত আর ডাল দিয়ে রাতের খাবার খাচ্ছিলো। ধরেই নিলাম যে, এখন এদের কাছ থেকে থাকা-খাওয়া নিয়ে নানারকম অভিযোগের কথা শুনতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন মুক্তিযোদ্ধাও সেদিন থাকা-খাওয়ার কোনো অভিযোগের কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়ান নি। বরং তাদের সবার জিজ্ঞাসা ছিলো একটাই—কবে নাগাদ তারা আরো অস্ত্র-শস্ত্র পাবে।

প্রশিক্ষণের জন্যে বা যুদ্ধের জন্যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের বিমানবাহিনীর কোনো বিমান ছিলো না। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে আমরা তিনটি বিমান পেলাম। আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলো ভারতের নাগাল্যান্ডের পরিত্যক্ত একটি বিমান ঘাঁটি বীমাপুরে। যে তিনটি জঙ্গি বিমান আমরা পেয়েছিলাম তা এতই সাধারণ মানের যে, আমাদের একমাত্র রণকৌশল হলো রাতের বেলায় আক্রমণ করা এবং বৃক্ষের উচ্চতায় ওড়া যাতে রাডারে ধরা না পড়ে। কিন্তু নাগাল্যান্ডের মতো গাছপালা-আচ্ছন্ন পাহাড়ি এলাকায় এই প্রশিক্ষণ যে কতটা দুঃসাধ্য সেটা একজন অভিজ্ঞ পাইলট হিসেবে আমি জানি।

একটা পাহাড়ের চূড়ায় গাছ কেটে সেখানে একটা সাদা প্যারাসুট ফেলে তৈরি করা হলো প্রশিক্ষণ টার্গেট। সে এলাকায় গাছের একটু ওপর দিয়েই ভেসে বেড়াতো পুরু মেঘের আস্তরণ। গাছ এবং মেঘের স্তরের সেই সামান্য

ব্যবধানে জঙ্গি বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া এতটাই কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ যে, সাধারণ অবস্থায় এটা চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু আমাদের নিবেদিতপ্রাণ একদল তরুণ পাইলট সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন। ফাইটার প্লেন নিয়ে নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে তারা যে সফল অপারেশন চালিয়েছিলেন তা আমাদের বিজয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ তারা হানাদার বাহিনীর জ্বালানি তেলের ডিপোতে আক্রমণ করে তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। ফলে জ্বালানি সরবরাহে দারুণ ঘাটতিতে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনী।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিম ভারতের কয়েকটি ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং এর মাধ্যমেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু আমাদের মুক্তিবাহিনী আক্রমণের পর আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে শারীরিক-মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল করে ফেলেছিলো যে মাত্র ৬ দিন পরেই ৯ তারিখে তারা আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তাব দিলো।

অবশেষে নানারকম কূটনৈতিক জটিলতার কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ হয় ১৬ ডিসেম্বর। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি। জিপে করে আমরা যখন রমনা রেসকোর্স ময়দানে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করছিলেন। তাদের চোখে-মুখে ছিলো স্বপ্ন—স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যে স্বপ্নের দরজা তাদের সামনে খুলে গিয়েছিলো।

তৎকালীন পৃথিবীর আধুনিকতম একটি সমর-বাহিনীর বিরুদ্ধে নামমাত্র প্রশিক্ষণ এবং রসদ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন যে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কতটা সাহস, মনোবল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে মাত্র ৯ মাসেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করানো যায়—তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ পুরো জাতি সে যুদ্ধে নেমে গিয়েছিলো এবং জয়ের ব্যাপারে ছিলো আপসহীন।

'৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে যে স্বপ্ন ঝলসে উঠেছিলো সেদিনের চেহারাগুলোয় সে স্বপ্ন হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এই আত্মত্যাগ, এই শ্রম বৃথা যেতে পারে না। সেই স্বপ্নের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবোই।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। তিনি ১৯৯৫ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭ ব্যাচে অংশ নেন। কোর্সের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের নানা অনুভূতি।

মহাজাতকের পদ্ধতিটি আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে

কবি শামসুর রাহমান

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি শামসুর রাহমান। মূলত একজন কবি হলেও সাহিত্যের একাধিক শাখায় তার ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ।

নাগরিক কবি হিসেবে খ্যাত কবি শামসুর রাহমানের জন্ম ও বেড়ে-ওঠা পুরনো ঢাকায়। ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলিতে তার জন্ম। পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ পোগোজ ইংলিশ হাই স্কুল থেকে তিনি ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। পরবর্তীতে পাসকোর্সে বি এ পাশ করে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও শেষ পর্বের পরীক্ষায় আর অংশগ্রহণ করা হয়ে ওঠে নি তার।

শৈশবে তার দেখা প্রথম চিত্রশিল্পী বাবুবাজারের নঈম মিঞা, যিনি তুলি দিয়ে কাচের ওপর ছবি এঁকে সেগুলো বিক্রি করতেন। স্কুলে যাওয়ার সময় নঈম মিঞার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তার কাজ দেখতেন

স্কুল-পড়ুয়া শামসুর রাহমান। একদিন ছোট বালকটিকে দোকানের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন নঈম মিঞা। কারণ নঈম মিঞা চান নি যে, শিল্পের নেশায় এই ছেলের জীবনও তার মতো খুকখুক কাশি আর ধুকধুকে কষ্টের হয়ে উঠুক।

নঈম মিঞার মতো শামসুর রাহমানের বাবাও চান নি তার ছেলে কবি হোক। কবিতা লিখলে জীবনে বিত্ত-বৈভবে সফল হওয়া যায় না। তাই বাবা কিংবা অভিভাবকদের কেউই তাকে কবি হতে উৎসাহিত করেন নি। কিন্তু কারো কাছ থেকে উৎসাহ না পেলেও তার সৃষ্টিশীল মন কিন্তু থেমে থাকে নি। সংগীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যচর্চার কোনোরকম নিদর্শন নেই এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেও পরবর্তীতে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি। বিংশ শতকের তিরিশের দশকের পাঁচ মহান কবির পর তিনিই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ হিসেবে খ্যাত।

১৯৪১ সালে ছোটবোন নেহারের অকালমৃত্যু হলে সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া শোকার্ত শামসুর রাহমান একটি কবিতা লেখেন। জীবনের প্রথম লেখা এ কবিতাটি পড়ে খুব কেঁদেছিলেন তার মা। সেই তার কবিতার পথে যাত্রাশুরু। তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায়। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তিনি লিখেছেন দ্রোহ, প্রেম আর সংগ্রামের কবিতা। পাশাপাশি সমান প্রতিভাদীপ্ত সৃজনশীলতায় লিখেছেন উপন্যাস প্রবন্ধ ছড়া ও শিশুসাহিত্য।

১৯৫৭ সালে তৎকালীন দৈনিক মর্নিং নিউজে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন শামসুর রাহমান। এরপর রেডিও পাকিস্তানের প্রযোজক ছাড়াও সাংবাদিকতা করেছেন তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান (স্বাধীনতা উত্তরকালে দৈনিক বাংলা), সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক মূলধারায়। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন একাধিক সাহিত্য পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন। ১৯৯৬ সালে বাংলা একাডেমীর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যেকোনো জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বরাবরই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে কবি শামিল হন তার কবিতার মাধ্যমে। একাত্তরের এপ্রিলে নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে বসে কবি রচনা করেন সেই অনবদ্য কবিতা ‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’।

'৬৯-এর ২০ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের সময় গুলিস্তানে একটি উত্তুঙ্গ মিছিলের অগ্রভাগে শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা কবিকে ভীষণ আলোড়িত করে। সেদিন সন্ধ্যায়ই বাসায় ফিরে কবি লিখে ফেলেন গণঅভ্যুত্থানের প্রতীক হয়ে ওঠা অমর কবিতা 'আসাদের শার্ট'। ১৯৬৮ সালের দিকে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান তৎকালীন পাকিস্তানের সব ভাষার জন্যে অভিন্ন রোমান হরফ চালুর প্রস্তাব দিলে ক্ষুব্ধ চিত্তে কবি লেখেন মর্মস্পর্শী কবিতা 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'।

কবি শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ৬৬টি কাব্যগ্রন্থসহ প্রবন্ধ উপন্যাস ছোটগল্প ছড়া ও অনুবাদ সাহিত্য মিলিয়ে তার প্রকাশিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৮৫টি। সাংবাদিকতার খাতিরে একাধিক ছদ্মনামেও লিখেছেন কবি শামসুর রাহমান, যেমন–সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক। পাকিস্তান সরকারের আমলে কোলকাতার একটি সাহিত্য পত্রিকায় কবিতা লেখেন মজলুম আদীব (বিপন্ন লেখক) নামে–তার এ নামটি দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক আবু সায়ীদ আইয়ুব।

সাহিত্যকীর্তির জন্যে কবি শামসুর রাহমান একাধিক জাতীয় পুরস্কার ও স্বীকৃতিতে ভূষিত হন। যার মধ্যে একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার ও সাংবাদিকতার জন্যে মিতসুবিশি পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৫ সালে বন্ধুস্থানীয় একজনের পরামর্শে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭ তম ব্যাচে অংশ নেন কবি শামসুর রাহমান। কোর্সের ৪র্থ দিন প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি আগে থেকে এ কোর্স করলে বহুলাংশে উপকৃত হতাম। বেশ কিছুদিন আগে আমারই বয়েসী এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে এ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন। সে সময় আমি কথাটার তেমন গুরুত্ব দেই নি। কিন্তু এখন বিশ্বাস করছি, এটি আগে করতে পারলে বহু রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারতাম। তবে যা করতে পারি নি তা নিয়ে আক্ষেপ করার কোনো মানে হয় না।'

তিনি বলেন, 'আমার মধ্যে যেসব ব্যাধি ছিলো, তা থেকে নিরাময়ের লক্ষ্য সামনে রেখে আমি এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছি। কোর্স করতে এসে অনেকের

সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সবার আন্তরিক ব্যবহার আমি সারা জীবন মনে রাখবো। মহাজাতকের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। মহাজাতকের বলার ভঙ্গি এতই মুগ্ধকর যে, মাঝে মাঝে কবিতা শুনছি বলে মনে হয়েছে।'

মনছবি সম্পর্কে কবির অভিমত ছিলো–'ছবি আঁকাসহ যেকোনো সৃজনশীল কাজের আগে এটিকে অনায়াসে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমিও সে কারণে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের ন্যায় ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত।'

বাংলা কবিতার অন্যতম দিকপাল কবি শামসুর রাহমান ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা সাহিত্যে তার অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

[শততম কোর্সপূর্তি স্মারক অবলম্বনে]

মুক্ত বিশ্বাস হচ্ছে
সকল সাফল্য, সকল অর্জনের ভিত্তি।
বিশ্বাসই রোগ নিরাময় করে,
মেধাকে বিকশিত করে,
যোগ্যতাকে কাজে লাগায়,
দক্ষতা সৃষ্টি করে।
ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর
অশান্তিকে প্রশান্তিতে
রূপান্তরিত করে।

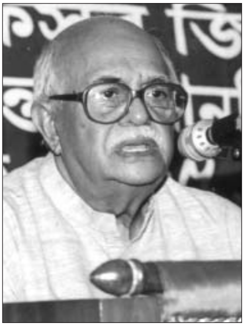

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। গবেষক প্রাবন্ধিক অনুবাদক ও কলামিস্ট হিসেবেও তিনি সমধিক সমাদৃত। তার লেখা ও সম্পাদনায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে এক দশকের বেশি সময় তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় এ ভাষণ দেন।

মূল্যবোধের পুনর্জাগরণই হচ্ছে আসল শক্তি

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কেন এ পৃথিবীতে এলাম, জীবনটা কিসের জন্যে—এ প্রশ্নগুলো একজন সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। চিন্তা-চেতনায় শিক্ষায় মনন-চর্চায় অগ্রসর বিশেষ কিছু মানুষ এ চিন্তাটা করে থাকে।

সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভাবলে দেখবো, এসব চিন্তা করার অবকাশ তাদের নেই। ভারবাহী পশুর মতো তারা জীবনের বোঝা বহন করে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যারা চিন্তা-চেতনায় উঁচুস্তরের তাদের জীবন-জিজ্ঞাসা কী। কোন ধরনের মূল্যবোধ দ্বারা তারা পরিচালিত হচ্ছেন।

আমাদের চারপাশের দুর্গতি, অবনতি, দুর্নীতির চিত্রটা দেখেই আমরা বলে দিই যে, মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। কথাটি নিয়ে আমার দ্বিমত নেই। কারণ তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে আজ আমরা এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। দেশের দিকে তাকালে এ মূল্যায়নের যথার্থতা স্পষ্ট।

’৪৭-এর স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু তার অনেকগুলোই এখন আর চলছে না। ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রাচীন এবং প্রথম সারির রেলওয়ে ব্যবস্থার একটি। একই

সিস্টেমের একটা অংশ আমরা পেলাম কিন্তু আমাদের রেলওয়ে সিস্টেমের অত্যন্ত দুরবস্থা। এটা এখন শুধু অলাভজনকই নয়, সেবার গুণগত দিক থেকেও নিম্নমুখী।

আমাদের পোস্টাল সিস্টেমেও একই অবস্থা। আগে কোলকাতা থেকে পাঠানো চিঠি একদিন পরেই আমরা গ্রামের বাড়িতে বসে পেয়েছি। আবার গ্রামের বাড়ির চিঠি পরের দিন কোলকাতায় পৌঁছে যেত। সেই পোস্টাল সিস্টেম এখনও আছে কিন্তু একদিনের জায়গায় চিঠি যেতে সাতদিন লাগে, যদি আদৌ চিঠি যায়।

শিক্ষার অবস্থাও একই। কথায় কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের কথা আমরা বলি। একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝানো হতো। এখন এ কথাটি আমার কাছে খুবই লজ্জাজনক মনে হয়। আমরা জানি, শিক্ষার মান এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বর্তমান সামগ্রিক অবস্থার পেছনে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি আছে নৈতিক ব্যাখ্যাও। আজকের এ অচলাবস্থার কারণ আমাদের ইচ্ছাশক্তি, সততা ও সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে অনীহা এবং যোগ্যতম ব্যক্তির শূন্যতা।

অথচ বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছিলো একটা নৈতিক মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে। আমরা দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতায় রুদ্ধ ছিলাম। কোনো নাগরিক মর্যাদা আমাদের দেয়া হয় নি। প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একসময় আমরা উপলব্ধি করলাম, পরাধীনতার জীবন যাপন আর করবো না। নিজেদের ভাবনা দিয়ে যেন নিজেদের ভাগ্য গড়তে পারি সেজন্যে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা একটা রাষ্ট্র গঠন করলাম। স্বাধীনতা আমাদের সামনে সুযোগ-সুবিধার অবারিত পথ খুলে দিলো।

কিন্তু আমরা সে সুযোগের অপব্যবহার করলাম। প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাওয়ার জন্যে সবাই ব্যগ্র ও লোলুপ হয়ে পড়লাম। সেবার মানসিকতা অপসৃত হয়ে গেল এবং শুধুমাত্র নেয়ার মনোভাব সেখানে এসে গেল। জাতির এ ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যর্থতা।

কীভাবে আমরা এ থেকে বেরিয়ে আসবো? কীভাবে আমরা ব্যক্তিজীবনে এবং সামষ্টিক-জীবনে মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো? এর জন্যে দরকার মানুষের চেতনার পরিবর্তন, যা সে লাভ করবে ধর্ম এবং শিক্ষা থেকে। আশার কথা হলো, এ বিপর্যয় থেকে উত্তরণের চিন্তা-ভাবনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত নয় এমন একটি গোষ্ঠী আছে–যাদেরকে

বলা হয় সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ। সুশাসন এবং মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তারা কাজ করছেন।

শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা যেতে পারে। পরিবারকেন্দ্রিক নৈতিক ও জীবনমুখী ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ছোটবেলা থেকেই একটি শিশুকে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এই নতুন প্রজন্ম পরবর্তী দায়িত্ব পালনে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার কথা বলা যেতে পারে। ৩০ থেকে ৩৫ বছর পূর্বে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো অনুন্নত। জাতিগত সংঘাতও ছিলো প্রকট। সেই মালয়েশিয়া আজ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আছে উন্নত দেশের কাতারে। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের দক্ষ নেতৃত্বের কারণে।

আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আমাদের সার্বিক পরিস্থিতি আজ সুখকর নয় বটে, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আমাদেরও যদি এমন যোগ্য নেতৃত্ব আসে যিনি প্রকৃত মূল্যবোধে উজ্জীবিত–দেশে সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করবেন এবং সেবক হিসেবে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন তাহলে আমাদের দেশও ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ আমি মনে করি, জনগণের চিন্তাধারা সঠিক পথেই আছে। এখন শুধু দরকার যোগ্য নেতৃত্ব।

আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের অনেক ব্যর্থতা থাকতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একজন মানুষ যদি তার নিজের আদর্শে, নিজের মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কিছু একটা গড়তে চান তিনি তা পারেন।

আমি দেখেছি, কর্মজীবন শেষে অবসর জীবনে এসে একজন ব্যক্তি ঠিক করলেন, গ্রামের স্কুলটাকে তিনি গড়ে তুলবেন এবং এ কাজে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে অজপাড়াগাঁয়ের একটি স্কুলকে তিনি অনেক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। সেই স্কুলে এখন ২০০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। চট্টগ্রামে দেখেছি, একজন ডাক্তার নিজ উদ্যোগে একটি চক্ষু হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে বিশ্বমানের সেবা দিচ্ছেন। বাংলাদেশের হাজার হাজার সন্তান বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জনের একটা অংশ দেশে পাঠাচ্ছে। তারা দেশের জন্যে কাজ করতে চাইছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে।

কোনো কিছু গড়ার জন্যে যখন একজন মানুষের একটা ভিশন বা

মনছবি থাকে, যখন তিনি ঐকান্তিকভাবে কাজটি করতে চান তখনই তিনি সফল হন। যেমন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আমি দেখছি, এখানে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি আনুকূল্য ছাড়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি-প্রচেষ্টা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কিছু গড়ার আয়োজন চলছে।

সুতরাং এই যে চাওয়া, একান্তভাবে চাওয়া, আমাদের চিন্তা-চেতনার সমস্ত শক্তি দিয়ে চাওয়া–এর ফল পাওয়া যাবেই। সেদিক থেকে আমি নৈরাশ্যবাদী নই। হয়তো স্বচক্ষে দেখে যেতে পারবো না, কিন্তু মানসচক্ষে দেখতে পাই–অবক্ষয়, বৈষম্য এবং অবিচার দূরের সংকল্পের মাধ্যমে সবাই মিলে আমরা সুখী-সমৃদ্ধ একটি দেশ গড়ছি।

[২০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

আপনার 'আমি'কে
খুঁজে বের করুন।
তাহলেই দেখবেন,
আপনার স্বপ্ন পূরণের
ক্ষমতা ও সামর্থ্য
নিহিত রয়েছে
আপনার ভেতরেই।

আগে জানুন
আপনি কেন বাঁচবেন।
তাহলেই পারিপার্শ্বিক
নেতিবাচকতা থেকে
নিজেকে রক্ষা
করতে পারবেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুজাফ্‌ফর আহমেদ বর্তমানে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন ও সুশাসনের জন্যে নাগরিক (সুজন)-এর সভাপতি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতি এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বলেন।

শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়ে

অধ্যাপক ড. মুজাফ্‌ফর আহমেদ

আমার বাবা ১৯২৯ সালে বিসিএস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলেন। তখন বিশ্বজুড়ে চলছিলো অর্থনৈতিক মহামন্দা। বাবা কর্মজীবন শেষ করেন সরকারের সচিব হিসেবে। রিটায়ারের সময় তার বাড়িতে যে আসবাবগুলো ছিলো, অ্যানটিক্‌স হিসেবে হয়তো তার কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু আজকাল একজন পিয়নের বাড়িতেও দেখা যাবে এর চেয়ে দামি, সুন্দর আসবাবপত্র।

বাবা যে ডিপার্টমেন্টের সচিব ছিলেন সেটি ঢাকার সব খাস জমি তত্ত্বাবধান করতো। ইচ্ছে করলেই তিনি প্রচুর জমি-জমার মালিক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শুভানুধ্যায়ীরা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, রিটায়ারের পর গ্রামের বাড়ি চলে যাবো। শেষমেষ নানা অনুরোধ-উপরোধে বাধ্য হয়ে বাবা একটা দরখাস্ত করলেন, যাতে তিনি ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকার সবচেয়ে ছোট প্লটটি তার জন্যে চাইলেন।

ঐ প্লটটিতেই এখন আমাদের একমাত্র বাড়ি, কারণ গ্রামের বাড়ির সবকিছু পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবেন আর অফিসে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন–এটাই ছিলো বাবার চিন্তা। শুধু তিনি একাই নন, সে সময়ে সমাজের শিক্ষিত পেশাজীবী মানুষেরা সবাই এভাবেই ভাবতেন। পার্থিব সম্পদের পেছনে তারা ছুটেছেন খুব কমই।

কিন্তু সেই দিন আর নেই। এখন চলছে কনজিউমারিজম বা ভোগবাদের যুগ। এখন প্রত্যেক ঈদেই আমাদের নতুন কাপড় কিনতে হয়। দুদিন পর পর রেস্তোরাঁয় না খেলে তৃপ্তি হয় না। একটা বিয়ের জন্যে ১০টি অনুষ্ঠান করতে হয়। বিলাসবহুল কমিউনিটি সেন্টারে একেকটি আয়োজন করতে গিয়ে অর্থের যে অপচয় আমরা করি তা যেন কোনো ব্যাপারই নয়।

একসময় একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মাত্র ১০ টাকাতেই সারা মাসের নাস্তা হয়ে যেত। কিন্তু এখন শুধু একদিনের সকালবেলার নাস্তাতেই তার লাগে ৫০ টাকা। অর্থাৎ সবার মধ্যে একটা ভোগের মানসিকতা, লোভ আর কামনা। আর এ প্রবণতাই আমাদেরকে ঠেলে দিয়েছে আজকের এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতিগ্রস্ততার দিকে।

ছোটবেলায় বাড়িতে দেখেছি মায়ের ঘরের তাকে সারি বেধে রাখা হয়েছে অজস্র বই। আমার জীবনের প্রথম আনন্দের দিন ছিলো ক্লাস ফোরে পড়ার সময় পত্রিকায় আমার একটা লেখা ছাপা হবার পর বাবা আমাকে এক টাকা দিয়ে একটা গীতাঞ্জলি কিনে দিয়েছিলেন। সেই গীতাঞ্জলিটা আমার কাছে এখনও আছে।

এখন কিন্তু কোনো বাবা তার ছেলেকে গীতাঞ্জলি দিয়ে খুশি করতে পারবেন না, এখন ছেলেকে হয় পিৎজা হাটের পিৎজা অথবা মুভেনপিকের আইসক্রিম খাওয়াতে হবে। আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে ঝাড়বাতি দেখেছি, বাড়িতে লাগানোর চিন্তা করি নি। কিন্তু এখন ঢাকায় এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে ড্রয়িংরুমের ঝাড়বাতিটার দামই দশ লাখ টাকা। ধনীরা এখন ধনের প্রদর্শনী করতে উদগ্রীব।

দুর্নীতি কমাতে হলে প্রথমে প্রয়োজন এই ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যা শুরু করতে হবে শিশুর পরিবার থেকেই। তার ভেতর জাগিয়ে তুলতে হবে শোকর এবং সবরের মানসিকতা। যা পেয়েছি এজন্যে আল্লাহর কাছে শোকর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং যা পাই নি এজন্যে সবর অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ, যাতে আল্লাহ দেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পরিবারগুলোতে এখন এ শিক্ষা দেয়ার মানসিকতা নেই।

বিশ্বব্যাংকের মতে, দুর্নীতি হলো–Use of public property for private gain অর্থাৎ জনগণের সেবা না করে সরকারি অফিসের ক্ষমতা নিজের কাজে ব্যবহার করাই হলো দুর্নীতি। কিন্তু এটা দুর্নীতির একটা আংশিক সংজ্ঞা। ১৯৯৬ সালে আমরা দুর্নীতির ওপর প্রথম একটি জাতীয় জরিপ চালাই। এতে সাধারণ মানুষ দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলো

এভাবে–যার যা কর্তব্য সে যদি তা না করে তাহলে সেটাই হলো দুর্নীতি।

দুর্নীতির এ ব্যাখ্যার সঙ্গে হজরত ওমর (রা) এর একটি ঘটনার খুবই মিল পাই। হজরত ওমর (রা) আবু হোরায়রা (রা)-কে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে আবু হোরায়রা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ ধনী হয়ে যান। হজরত ওমর তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং শাসন কাজের চেয়ে ব্যবসায় বেশি মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বলেন। ওমরের যুক্তি ছিলো–একজন সরকারি কর্মচারী শুধু দাপ্তরিক সময়ের জন্যে নয়, বরং ২৪ ঘণ্টার জন্যেই জনগণের সেবক। এর খেলাফ করা মানেই নীতিহীনতা। এজন্যে পরে আবু হোরায়রার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এখন সরকারি চাকরি নিয়ে কত কথাই না পত্রিকায় দেখি। প্রাইমারি স্কুলের একটা চাকরির জন্যে নাকি ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। চাকরি পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক টাকাটা নানাভাবে তোলার চেষ্টা করেন। ছাত্রবৃত্তির টাকা বা খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির টাকা থেকে সরিয়ে, বই ছাত্রদের না দিয়ে বাইরের দোকানে বিক্রি করে বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করে ইত্যাদি নানাভাবে এখন দুর্নীতি হয়।

সংসদ নির্বাচনে দাঁড়ানো এখন একটা বিনিয়োগের মতো। যে যত বেশি খরচ করতে পারবে তারই জয়ের সম্ভাবনা তত বেশি। আর নির্বাচিত হওয়ার পর মূল টার্গেটই হয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কত তাড়াতাড়ি সে টাকা তোলা যায়। তার মানে দুর্নীতি এখন জাতীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রাইমারি শিক্ষক বা ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা একটি বহুল আলোচিত দুর্নীতি। এডভোকেট বা ডাক্তারের মতো পেশাজীবীদের অনেকেই তাদের বিপুল উপার্জনের অনুপাতে ট্যাক্স দেন না। কারণ ট্যাক্স আদায়কারীদের সাথে তাদের রয়েছে ভাগাভাগির বোঝাপড়া।

কিন্তু ঘুষ নেয়া বা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়াই শুধু দুর্নীতি নয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা ডা. ইব্রাহীমের সারাদিন কাটতো হাসপাতালে রোগী দেখে ও ক্লাস নিয়ে। আজকাল এটা একটা বিরল ব্যাপার। ডাক্তাররা বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাটান প্রাইভেট প্রাকটিস করে। এমন ডাক্তারও আছেন যারা একসাথে ৪/৫ জন রোগী দেখেন। কর্তব্যের এ অবহেলা কি দুর্নীতি নয়? এই যে খাবারে ভেজাল দেয়া হচ্ছে, ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণে ভবন ধসে পড়ছে, জমির সীমানা ছাপিয়ে সরকারি জায়গা দখল করা হচ্ছে এগুলো কি দুর্নীতি নয়?

দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে তদনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। যেমন, সিঙ্গাপুরে দুর্নীতি ধরা পড়ার সাথে সাথে তার বিচার হয় এবং শাস্তি হিসেবে এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখন পৃথিবীতে দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ হলো সিঙ্গাপুর। আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর অধিকাংশই দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতির প্রসঙ্গ এলে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী আফ্রিকার দুর্নীতির কথা বলেন, জ্বালানী কোম্পানি এনরনের দুর্নীতির কথা বলেন। কিন্তু এসব জায়গায়ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা–দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে শুরু কিন্তু করতে হবে নিজেকে দিয়েই। জবাবদিহিতাটা থাকতে হবে নিজের কাছে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার হিসেব নেয়ার জন্যে এমন একজন আছেন যার কাছে কিছুই ফাঁকি দেয়া যায় না। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পর আমাকেও অনেকরকম হয়রানি, জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার ২০ বছরের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু এতে আমার কোনো অস্বস্তি নেই, কারণ আমি খুব চুলচেরা হিসেব করে বলতে পারবো যে, চাকরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি কত টাকা পেয়েছি।

বিশ্বজুড়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মোট ১৬৯টি চ্যাপ্টার আছে। বাংলাদেশকে বলা হয় স্টারশিপ অফ দ্য মুভমেন্ট। কারণ দুর্নীতি নিয়ে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কাজ করেছি। অন্যান্য দেশে যেখানে জাতীয় দুর্নীতি নিয়ে কাজ হয়েছে সেখানে আমরা কাজ করছি তৃণমূল পর্যায়ের দুর্নীতি নিয়ে। কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অডিট, ব্যুরো অফ এন্টি-করাপশন, পাবলিক একাউন্টস কমিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, পৌরসভা, চট্টগ্রাম বন্দর এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে আমরা কাজ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানে কেবল দুর্নীতির পরিমাণই বের করছি না, তা প্রতিকারের পরামর্শও দিচ্ছি।

আমার কাজের জন্যে সরকার, পুঁজিপতি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রচুর সমালোচনা শুনতে হয়। কিন্তু আমি যখন সাধারণ মানুষের কাছে যাই, তখন পাই অফুরন্ত ভালবাসা আর শ্রদ্ধা। এখন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে অন্তত একটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যা আগে ছিলো না। আমি আশাবাদী–এ অবস্থার উত্তরণ ঘটবে। কারণ এখনও দুর্নীতি যারা করেন তাদের চেয়ে যারা দুর্নীতি করেন না, তাদের সংখ্যাই বেশি।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

আলোকিত মানুষ গড়ার অগ্রপথিক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। 'আলোকিত মানুষ চাই'–আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি রয়েছেন সংগ্রামশীল। ২০০৪ সালে র‍্যামন-ম্যাগসেসাই পুরস্কারে ভূষিত অধ্যাপক সায়ীদ কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩০০ উচ্ছ্বাস-১৪ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন। কোর্সের প্রত্যয়ন-অনুভূতি ও সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়ে তার আশা ও উপলব্ধির কথা।

দুর্দশার বৃত্ত ভাঙতে চাই আত্মশক্তির জাগরণ

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে–'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর। পূর্ণ হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর।' হে সুন্দর, আমি তোমার সঙ্গ পেয়েছি। তোমার সান্নিধ্যে আমিও সুন্দর ও পূর্ণ হয়ে উঠেছি। আমার অন্তর আজ ধন্য। অর্থাৎ সুন্দর হতে হলে একজন মানুষকে সুন্দরের কাছে যেতে হবে। বড় হতে হলে যেতে হবে বড়-র কাছে। তরুণ প্রজন্মকে বইয়ের মাধ্যমে এমন সৌন্দর্য ও আলোর সন্ধান দেয়ার স্বপ্ন নিয়েই আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যাত্রা শুরু করেছিলাম।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু বড় মাপের মানুষ গড়ে তোলার কথা ভাবলেও পরবর্তীতে দেশের সার্বিক অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, আমাদের একটা সামগ্রিক জাগরণ প্রয়োজন। তার জন্যে চাই অসংখ্য আলোকিত ও উচ্চায়ত মানুষ। যাদের ভেতরে ন্যায়ের, সত্যের আগুন থাকবে। থাকবে পরার্থের আর মানবিক মূল্যবোধের আগুন।

সত্যিকার অর্থে আলোকিত হতে হলে বই পড়ার পাশাপাশি একজন মানুষকে জীবনের কাছে যেতে হবে, মানুষের দুঃখের কাছে যেতে হবে। দুঃখের সাধ্যমতো প্রত্যুত্তর দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের সমৃদ্ধ ও বড়

জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে এমন আলোকিত মানুষের নেতৃত্ব প্রয়োজন আমাদের। আলোকিত মানুষ আসলে একটি স্বপ্নের নাম। এটি একটি গন্তব্য ও লক্ষ্য। এ লক্ষ্য ও স্বপ্নের পথে যে যতটা এগিয়ে যেতে পারে সে ততটাই আলোকিত।

দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্য তার একটি কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন জীবনের গভীরতম দর্শন। যার মর্মার্থ হলো–কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতি বিচিত্র জায়গা। পদ্মপাতার ওপর জল যেমন টলমল করে যেকোনো সময় পড়ে যেতে পারে, আমাদের জীবনও তেমনই চপল, যেকোনো মুহূর্তেই চলে যেতে পারে। তাই ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করো না। কাল নিমেষেই সব হরণ করে নিয়ে যাবে। কিছুই নেই পৃথিবীতে, শুধু একটি জিনিসই আছে–'ক্ষণমীহ সজ্জন ও সঙ্গতিরেকা'। অর্থাৎ সজ্জনের বন্ধুত্ব। সজ্জনের বন্ধু হও, সজ্জনের সাথে সঙ্ঘ গড়ে তোলো।

আসলে সৎসঙ্ঘই মানুষের জীবন ও জাতির জীবনকে উন্নত করে তোলে। শুধু ভালো হলেই হবে না, ভালোদের সঙ্ঘ চাই। শুধু ধর্ম হলেই হবে না, ধর্মের ভালো মানুষদের সঙ্ঘ চাই। এজন্যে সব মহান ধর্মেই সঙ্ঘশক্তি গড়ে তোলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ সঙ্ঘ ছাড়া কোনো চেতনা পৃথিবীতে স্থায়ী হয় না।

পৃথিবীতে যত ধরনের সৃজনশীলতা আছে, সংগঠন হলো তার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মাত্রার সৃজনশীলতা। কারণ সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা স্থাপত্য–সবকিছুর চেয়েও যে জাতির সাংগঠনিক শক্তি যত উন্নত তারা তত সমৃদ্ধ, তারাই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়। বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে তাই সাংগঠনিক শক্তিতে উন্নত হতে হবে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি অভিনন্দন জানাই–উন্নততর জীবনের প্রয়াসে এটি একটি সঙ্ঘ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে যা আমাদের জাতির জন্যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

একটি জাতির প্রবাদ প্রবচনগুলোর মধ্যে তার চরিত্র প্রকাশ পায়। আমাদের প্রবাদ হচ্ছে 'বসতে দিলে শুতে চায়।' তাহলে শুতে যে চায় সে ঘুমাতেও চায়, নিশ্চয় মরতেও চায়। কারণ তার জন্যে সেটা আরো আরামদায়ক। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই নিষ্ক্রিয়, ম্রিয়মাণ। অথচ বড় জাতিতে পরিণত হতে চাইলে হওয়া উচিত এর উল্টোটা–বসতে পেলে দাঁড়াতে চায়; দাঁড়াতে পারলে হাঁটতে চায়, দৌড়াতে চায়। দৌড়াতে পারলে জয় চায়, সাম্রাজ্য চায়।

কোয়ান্টাম মানুষের মধ্যে এই উজ্জীবন ও আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটানোর

মাধ্যমে তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে, শক্তিমান করে তুলছে। আত্মশক্তিতে জেগে না ওঠা পর্যন্ত একজন মানুষ নিজের অনটন দারিদ্র দুর্বলতা জরা-ব্যাধি দুর্দশাগুলো দেখতে পায় না। দেখে না বলে সে আরোগ্যও চায় না। ফলে এসবের বৃত্তে আরো জড়িয়ে যায়। তাই মানুষকে জাগাতে হবে। কোয়ান্টাম এই জাগানোর পতাকাই বহন করছে।

এ জাগরণ আমি নিজের মধ্যেও অনুভব করেছি। বছর দুয়েক আগে একটা অসুস্থতা আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। দুর্বলতায় আমি একসময় যেন ভেঙে যাই। একটা নিষ্ক্রিয়তা, অবসন্নতা ভর করে আমার ওপর। যে আমি সারাজীবন আশার কথা বলেছি সেই আমিই যেন বার্ধক্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসি, আমার কণ্ঠে তখন হতাশার গান।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে উপলব্ধি হলো—এটা আমার বার্ধক্যের জন্যে নয়, আমার ভেতরে আত্মশক্তির অভাব ঘটেছে। রোগের ক্লান্তি, অসহায়তা আমাকে কিছুটা নেতিবাচক করে দিয়েছে। কোর্সে প্রথমদিনেই আমি একটা পরিবর্তন অনুভব করলাম। ধীরে ধীরে আমি যেন শক্তি ফিরে পাচ্ছি, ইতিবাচক হয়ে উঠছি। আমি আবার আগের মতোই সজীব ও সপ্রাণ হয়ে উঠলাম।

কোয়ান্টামে এটা আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি। হতাশাচ্ছন্ন রোগাক্রান্ত অসংখ্য মানুষ এখানে এসে সুস্থতার অনুভূতিতে জেগে উঠেছেন। হাজার হাজার মানুষকে জেগে ওঠার জন্যে, বড় হয়ে ওঠার জন্যে, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্যে কোয়ান্টাম সহযোগিতা করছে। এজন্যে ব্যক্তিগতভাবে শুধু আমি নই, সারা জাতির ঋণ এই প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকবে। কারণ রোগমুক্তি ও সুস্থতার অনুভূতি নিঃসন্দেহে আনন্দের; কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করে যে রোগমুক্তি—এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।

আমার স্ত্রী বছর দশেক আগে মেরুদণ্ডের ব্যথায় প্রায় ৯ মাস বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ওভাবে দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকা তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিলো। কত রকম চিকিৎসা ওষুধ থেরাপি, কিন্তু কিছুতেই সারে না। সেসময় তিনি কোয়ান্টাম কোর্স করলেন এবং আমি খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, তার ব্যথা চলে গেল। তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, দিব্যি হাঁটাহাঁটি করছেন। এভাবে ঘরে বাইরে অসংখ্য মানুষের নিরাময় ও সাফল্য দেখে আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অগণিত কৃতজ্ঞ মানুষের একটি সঙ্ঘ।

আসলে মনের শান্ত অবস্থাতেই মন সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, উত্তেজনা আর শক্তি এক নহে। ইহারা পরস্পরবিরোধী,

কারণ উত্তেজিত মুহূর্তে আমরা সবচেয়ে শক্তিহীন। কোয়ান্টামের ভাষায়, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। আর মেডিটেশনে ঘটে এর ঠিক উল্টোটা।

মেডিটেশন আমাদের শরীর-মনকে একটা সুস্থির, সমাহিত অবস্থায় নিয়ে আসে। তাই মেডিটেশনে 'আমি সুস্থ, আমি ভালো আছি'—এ আপাত সাধারণ কথাগুলোই হয়ে ওঠে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক তখন সবচেয়ে সজাগ ও উজ্জীবিত।

মানুষ তার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়েই সবকিছু করে। এই মস্তিষ্ক যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। মেডিটেশন এই নেতিবাচকতা থেকে মস্তিষ্ককে মুক্ত করে। আর আমাদের প্রত্যেকের মনের একটা শক্তি আছে। আমাদের সে শক্তির জাগরণ প্রয়োজন। মেডিটেশন সেই শক্তির জাগরণ ঘটায়। মেডিটেশন করে আমার জীবনীশক্তি বেড়েছে। আমি আগের চেয়ে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠেছি।

'৭১-এ স্বাধীনতার জন্যে আমরা একটা যুদ্ধ করেছিলাম, সেটা ছিলো স্বল্পস্থায়ী ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে শুরু হয়েছে আমাদের সত্যিকারের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ—নিজের অক্ষমতা পাপ পচন পতন রোগের বিরুদ্ধে আমাদের সেই যুদ্ধ। কোয়ান্টাম সেই যুদ্ধেরই একটি অনন্য সাধারণ উদাহরণ।

কোয়ান্টাম জাতির সামনে ২০২৫ সালের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন তুলে ধরেছে। 'স্বপ্ন' মানে গন্তব্য। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা ভেবেছিলাম, আমরা একটা সোনার বাংলা পেয়ে গেছি। এখন শুধু ঘরে শুয়ে ঘুমালেই সব হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না। কিছুদিন পরই আমরা টের পেলাম, সোনার বাংলা বলে আসলে কিছু নেই, বাংলা যা আছে সেটা কাদামাটির। একে আমাদের কষ্টে চেষ্টায় ঘামে শ্রমে যত্নে আত্মোৎসর্গে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে হবে।

আমি মনে করি, আমাদের রাষ্ট্র সময়ের সাথে ধীরে ধীরে গঠিত হচ্ছে। একটা ঝিনুকের মধ্যে বালির কণা ঢুকলে যেমন সেই কণাটিকে ঘিরে মুক্তো তৈরি হয়, তেমনি জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে আমাদের দেশে নিঃশব্দে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র-কাঠামো গড়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, এভাবেই জাতি হিসেবে আমরা একটি বড় স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাবো।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জুলাই ২০১০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম শমশের আলী দেশের নেতৃস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানী। একাধারে তিনি শিক্ষাবিদ গবেষক লেখক ও টিভি-ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার সুগভীর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। আল্লামা এম. শমশের আলী কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পবিত্র কোরআন কণিকা ও অডিও সিডি 'হে মানুষ শোনো'র মোড়ক উন্মোচন করেন।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম

আল্লামা ড. এম শমশের আলী

'মানুষ রাতের আকাশ দেখে বিস্মিত হয়, সমুদ্রের বিস্তৃতি দেখে অভিভূত হয়; কিন্তু সে জানে না মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সে নিজেই।' একবার আমেরিকায় বোস্টনের একটি মিউজিয়ামে সেন্ট অগাস্টিনের লেখা এ উদ্ধৃতিটি পড়ে মনে হয়েছিলো সত্যিই স্রষ্টা মানুষকে কত সুন্দর করে বানিয়েছেন! কী অদ্ভুত এক মনোদৈহিক সিস্টেমের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। তাইতো বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের শেষ সীমা মহাবিশ্ব নয়, বরং তা হলো–মানুষের মস্তিষ্ক।

মানুষ যদি তার মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানে, এর কার্যপরিধি সম্পর্কে বোঝে এবং নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে সে এক অসাধারণ মানুষ হতে পারে। সকল সমস্যা সমাধানের কাণ্ডারি হতে পারে সে নিজেই।

আর এ নিয়ন্ত্রণ এনে দেয় মেডিটেশন। মেডিটেশনে আত্মনিমগ্ন হয়ে একজন মানুষ সংযোগ সাধন করতে পারে তার অন্তরের আমি'র সাথে, সে নিজেকে বুঝতে পারে, নিজের সাথে নিজে কথা বলতে পারে, প্রকৃতির নৈঃশব্দকে উপলব্ধি করতে পারে। তাই নিজেকে চেনার জন্যে, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানার জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন।

স্রষ্টা মানুষের জন্যেই প্রকৃতির সবকিছুকে সাজিয়েছেন। এ অপার দানের জন্যে মানুষের উচিত প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাছে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কারণ কৃতজ্ঞচিত্ততা ছাড়া সার্থক মানুষ হওয়া যায় না। আসলে যে মানুষ শুধু নিজের জন্যে বাঁচে, সে বেঁচে থেকেও যেমন শান্তি পায় না তেমনি মৃত্যুর পরেও হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। আর যে মানুষ অন্যের জন্যে বাঁচে, সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, সবসময় ভাবে 'আমি কী দিতে পারি' সে অমর হয়ে থাকে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্রষ্টার স্মরণ এবং বিশ্বজনীন মমতা ও ভালবাসায় তাঁর সৃষ্টিকে লালন–এটাই হওয়া উচিত জীবন সম্পর্কে একজন মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন' নামটাকে আমার খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। 'কোয়ান্টাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিমাণ। কিন্তু একজন পদার্থবিদ হিসেবে 'কোয়ান্টাম' শব্দের গুরুত্ব আমার কাছে আরো বেশি। কারণ দৃশ্যজগতে সবকিছু একইরকম হলেও বিজ্ঞানের চোখে ল'জ অব দ্য স্মল আর ডিফ্রেন্ট ফ্রম দা ল'জ অব দ্য লার্জ। অর্থাৎ বিজ্ঞানে বড় জিনিসের জগৎ আর ছোট জিনিসের জগৎ এক নয়।

দৃশ্যজগতে শক্তিকে আমরা দেখি নিরবচ্ছিন্ন হিসেবে। কৌণিক ভরবেগ, এঙ্গুলার মোমেন্টাম সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু আমরা যদি ছোট জিনিসের জগতে যাই, তাহলে দেখবো সেখানে পদার্থের অণুরা যে গতি বিনিময় করছে তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। থোকায় থোকায়, গুচ্ছে গুচ্ছে চলে এ শক্তির আদান-প্রদান। আর এটাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

এখন আমরা যদি আমাদের দেহের দিকে তাকাই, আমাদের সমস্ত চেতনার মূল হলো নিউরোন, যা অতি সূক্ষ্ম। আর এ নিউরোনগুলো যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায়ই পড়ে। সুতরাং 'কোয়ান্টাম' নাম দেয়াটা খুব যথার্থ হয়েছে। কারণ কোয়ান্টাম শেখায় আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে চেতনার গভীর থেকে একজন মানুষ কীভাবে পাবে তার অশান্তি, অসুস্থতা আর ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার পথ। কোয়ান্টাম শেখায় দেহ-মনের অফুরন্ত শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কীভাবে একজন মানুষ তার কাজে লাগাতে পারে।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছানো, তাকে আত্মবিশ্বাস যোগানো–এটাই হলো তার সবচেয়ে বড় সেবা। অর্থ দিয়ে তার কোনো পরিমাপ হয় না। গত ১৯ বছর ধরে নিরলস সেবার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম সফলভাবে ৩৩০টিরও বেশি কোর্স সম্পন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে এ এক

মাইলফলক। কারণ মেডিটেশন কোর্সের মতো একটি বিষয়–যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো ধারণা ছিলো না, তার ৩০০ তম কোর্স হওয়াটাই প্রমাণ করে–এ কোর্স মানুষের জীবনের কোথায় স্থান করে নিয়েছে। একজন এসেছে, উপকার পেয়েছে, তার বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়কে বলেছে, নিয়ে এসেছে তাকেও। এভাবেই তো এগিয়েছে কোয়ান্টাম চেতনা।

মোরাকাবা, ধ্যান, মেডিটেশন–এগুলো ইসলামের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। যেমন, নামাজ–মুসলমানদের দৈনন্দিন এই ফরজ ইবাদতটি আসলে ধ্যান এবং যোগাসনের একটি যুগপৎ উপযোগিতা। আমরা যখন নামাজ পড়ি, দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নিবিষ্টচিত্তে স্রষ্টার কাছে আমরা আত্মনিবেদন করি। আমি হয়তো স্রষ্টাকে দেখছি না, শুনছি না; কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন, তিনি আমাকে শুনছেন। এই যে নিবিষ্টচিত্তে কল্পনা, একাগ্রচিত্ততা–এটাই তো ধ্যান।

একবার হযরত আলীর (রা) পায়ে তীর বিঁধলো। প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি কাতরাচ্ছেন। কয়েকজন সাহাবী তীর খুলতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তীরে হাত দিলেই আলী (রা) চিৎকার করে ওঠেন ব্যথায়। রসুল (স) বললেন, আলী যখন নামাজে সিজদায় যাবে তখন তীরটা খুলে নিও। কারণ নামাজে সে এত নিমগ্ন থাকবে যে, কিছুই সে টের পাবে না। তা-ই হলো। আলী (রা) নামাজে দাঁড়ালেন। সাহাবীরা তীর খুলে নিলেন। তিনি কিছুই টের পেলেন না।

মোবাইল ফোনের এ যুগে এক দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক দেশে সরাসরি কথা বলা, কথা শোনা এখন খুব দৈনন্দিন একটি ব্যাপার। একসময় এটা যতই অকল্পনীয় ব্যাপার হোক না কেন, এখনকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে আমরা জানছি, কলারের মোবাইল থেকে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট সিগনাল ট্রান্সমিট হচ্ছে। সেই সিগনালটা রিসিভড্ হচ্ছে রিসিভারের মোবাইলে। আর সেটা সম্ভব হচ্ছে কলার এবং রিসিভারের মধ্যে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনিং হচ্ছে বলে।

একইভাবে বান্দা যদি আল্লাহকে ডাকতে পারে, টিউনিংটা যদি ঠিকভাবে হয়, তখন স্রষ্টার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্যে অলি-আউলিয়ারা এই ধ্যানের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। নিবিষ্টচিত্তে যিনি ধ্যান করেন তিনিই বুঝতে পারেন যে, কীভাবে ধ্যান করলে আল্লাহর সঙ্গে তার একটা সংযোগ হবে। এই যোগাযোগ বাইরের মানুষ টের পায় না। সেরকম বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে, যিনি আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জীবনের সবকিছু বিধায়ক–তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতিই হলো ধ্যান।

নামাজে যোগাসন বা ব্যায়ামের উপযোগিতাও আমরা লাভ করি। আমরা রুকুতে যাই, সিজদায় যাই, মাথা থেকে রক্ত চলাচল হয়। আমরা যখন আঙুলে গুণতে থাকি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'–তখন আমাদের আঙুলের যে কতগুলো পয়েন্টের কম্প্রেশন তা রক্ত চলাচলকে স্বচ্ছন্দ করে। সুতরাং দৈহিক, আত্মিক, মানসিক–সবদিক দিয়ে নামাজ আমাদের উপকার করে। ধ্যান থেকেও আমরা দৈহিক-মানসিক এবং বিশেষত আত্মিকভাবে উপকৃত হই।

বিক্ষিপ্ততা কাজের কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে কনসেন্ট্রেশন বা পূর্ণ মনোযোগ এনার্জি ফোকাসিং করে এর কার্যকারিতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক বড় কাজও হয়ে যায় খুব সহজে। ধ্যান বা মেডিটেশনে মূলত এ কাজটিই হয়। বিশেষ একটি দিকে আমি চিন্তা ধাবিত করছি, শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে এবং সে শক্তি দিয়ে সম্ভব হচ্ছে অনেক অভাবনীয় কাজ।

ধ্যান বা মেডিটেশন এভাবে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে অসাধারণভাবে জাগিয়ে তোলে। মেডিটেশনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। মেডিটেশন মানুষকে মনোদৈহিক এবং আত্মিকভাবে জাগিয়ে তোলে, শক্তিমান করে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জুলাই ২০০৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের
শৃঙ্খলমুক্তির পথ মেডিটেশন।
মেডিটেশন অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করে
নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধিতে আর
সংযুক্ত করে 'অন্তরের আমি'র সাথে–
আপনার শক্তির মূল উৎসের সাথে–
সৃষ্টি করে মুক্ত বিশ্বাস।

বাংলা লোকসংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা জামান আব্বাসী। বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই ভাটিয়ালি জারি সারি ভাওয়াইয়া মারফতি মুর্শিদি দেহতত্ত্ব ইত্যাদি লোকগীতি নিজে পরিবেশন করার পাশাপাশি তার পরিচালনায় জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ভরা নদীর বাঁকে, লৌকিক বাংলা, আমার ঠিকানা'র মাধ্যমে লোকসংগীতকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তিনি বাংলা লোকসংগীতকে পরিচিত ও প্রশংসিত করেছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৫৫ ব্যাচে অংশ নেন।

আমাদের সন্তানদের জন্যে এ কোর্স অবশ্য কর্তব্য

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

বাবা চেয়েছিলেন আমি সিনেমার ওপর পড়াশোনা করবো, অভিনয় করবো, ছবি তৈরি করবো। বাবা আরো বলেছিলেন, যা-ই হও না কেন তুমি যেন আব্বাস উদ্দিনের ছেলে হও, সত্যিকার একজন ভালো মানুষ হও। ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা সবসময়ই ছিলো, হতে পেরেছি কি না সে বিচার স্রষ্টা করবেন। তবে আমি নিশ্চয়ই আব্বাস উদ্দিনের ছেলে। তার চেয়েও অন্য যে পরিচয়–আমি নিজেকে অন্বেষণ করেছি।

বাবা আমাদের কখনো নামাজ পড়তে বলেন নি। কিন্তু নামাজের প্রতি আমাদের ভালবাসা তৈরি হওয়ার সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন। আব্বা যখন নামাজ পড়তেন তখন তা দেখার ব্যাপার ছিলো। এটা ছিলো একজন সমর্পিত মানুষের পরিপূর্ণ নিবেদন, ছিলো সত্যিকারের সেজদা। সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত, অত্যন্ত পরিশীলিত এবং আর্টিস্টিক। রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখেছি স্রষ্টার সান্নিধ্যে তার সময় কেটেছে।

আসলে কারো সাথে যদি সম্পর্ক করতে ইচ্ছা করে, সে প্রেমিক/ প্রেমিকা হোক, বস্ হোক বা তার বস্ বা স্রষ্টা হোক, আপনার মস্তিষ্ককে জানাতে হবে–আমি এ সম্পর্ক চাই। সংযোগ স্থাপনের জন্যে আত্মনিবেদন করতে হবে, না হলে সবই পণ্ডশ্রম। রবীন্দ্রনাথ ভোর চারটায় প্রার্থনার ঘরে যেতেন।

তার কাব্যে, তার সাহিত্যে এই অন্বেষা ছিলো।

আমার স্মৃতির ভান্ডারে অসংখ্য চমৎকার দৃশ্যের একটি হলো–বাবা নামাজ পড়াচ্ছেন, পেছনে আমরা ৩ ভাই-বোন। এটা হচ্ছে আমাদের নামাজের পাঠ। আমি কখনো আমার বাবাকে ছাড়ি নি; আমার সবসময় মনে হয়, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। আজিমপুর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গান ভেসে এলো–'ও কি একবার আসিয়া, সোনার চাঁদ মোর যাও দেখিয়ারে'। গাড়ি থামাতে বললাম। সেখানে গিয়ে বললাম, 'বাবা তুমি ডেকেছিলে না, আমি এসেছি।'

মাঝে মাঝে গান এত ভালো হয়!–বলেন অনেকেই। আমি কখনো কাউকে বলি নি–গান তো আমি গাই নি, আমার বাবা গাইছিলেন। মায়ের সঙ্গেও আমার এমনই সম্পর্ক। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'। যে মাকে ভালবাসে না, সে মাতৃভূমিকে ভালবাসে না। যে মাকে যত্ন করতে পারে নি তার সব মিথ্যা। কী হবে তার হজে গিয়ে, কী হবে এত পড়াশোনা করে?

আমার আব্বা একদিন নজরুলের বাড়িতে ছিলেন। দুপুরের খাওয়া তখনও হয় নি। তিনি বললেন, কাজীদা একটা জায়নামাজ পাওয়া যাবে? আমি জোহরের নামাজ পড়বো। কাজীদা জায়নামাজ বিছিয়ে দিয়ে গানটি লিখলেন–'হে নামাজী, আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ।' এ গানগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস কথা বলবে। যারা গবেষণা করবেন, বাংলাদেশকে ভালবাসবেন, বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করবেন তারা দেখবেন এগুলোর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে।

মদীনায় যাওয়ার সুযোগ হলো। খুব ইচ্ছে হলো নবীজীকে (স) আমার গান শোনাই। তাঁকে বললাম, 'তুমি তো আমাকে ভালবাসো। আমার পিতা আব্বাস উদ্দিন ৪ শতাধিক হামদ/ নাত গেয়ে সমস্ত বাংলার অবহেলিত কৃষক মুসলিম ভাইদের জাগিয়েছে, আমার পিতার বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম হাজার হাজার গান লিখে মুসলমানদেরকে তাদের রসুলের প্রতি মোহাব্বত, আল্লাহর প্রতি ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে। পিতার বন্ধু গোলাম মোস্তফা যিনি 'বিশ্বনবী' লিখেছিলেন, তারা কেউ-ই এখানে আসতে পারেন নি। তুমি কি তাদেরকে ভালবাসো না? তাহলে তুমি যেখানে ঘুমিয়ে আছো, ঠিক তার পাশে আমাকে বসতে দাও।'

তিনি আমার কথা শুনলেন। সুযোগ পেয়ে একটার পর একটা গান তাঁকে শুনিয়েছি–'আমার মুহাম্মদের নামের ধেয়ান, হৃদয়ে যার রয়'–আমার চোখে

পানি। আমি উপলব্ধি করেছি তাঁকে–এটাই তো গান।

একসময় সুযোগ হলো এর জন্যে কাজ করার। সে সময় আমি আমেরিকাতে। মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ২০০ বই পেলাম লাইব্রেরিতে। শুরু হলো লেখা। লেখার সময় নবীর সাথে এমন ভালবাসা হলো যে, আমি এক পাতা লিখছি আর চোখের পানিতে তা ভিজে যাচ্ছে। সাধারণ তরুণদের মনের জিজ্ঞাসা আমার মনের মধ্যে নিয়ে আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি বইটিতে।

বইটি যখন বেরোয়, প্রকাশক সন্দেহ প্রকাশ করলেন বিক্রির ব্যাপারে। আমি আল্লাহকে বললাম, হে আল্লাহ! মার্কেটিং সম্পর্কে তোমার তো অভিজ্ঞতা আছে! তাহলে তুমি এ দায়িত্ব নাও! অবিশ্বাস্যভাবে মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই ১ম সংস্করণ শেষ হলো। দ্বিতীয় সংস্করণের অভিজ্ঞতাও একইরকম। আসলে বিশ্বাস করলে এমনই হয়। যেকোনো কাজ আমরা যদি বিশুদ্ধ নিয়তে করি, অন্তর থেকে বলি, তাহলে আমাদের প্রভু–যিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন, তাকে যা কিছু বলবো তিনি তা শুনবেন, সাহায্য করবেন।

প্রখ্যাত সুফি সাধক মওলানা জালালুদ্দিন রুমীর স্মরণে ২০০৭ সালকে 'ইয়ার অফ দা রুমী' ঘোষণা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সে বছরের মে মাসে ইস্তাম্বুলে রুমীর ওপর এক সেমিনারে অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনের সুযোগ হয়েছিলো। আমি রুমীকে ভালবাসি।

রুমী এমন একজন মানুষ, এমন একজন কবি যিনি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গ্রহণ করেছেন। সব ধর্মবিশ্বাসকে তিনি সম্মান করেছেন। তিনি বলেছেন, মানবমণ্ডলী এক জাতি, আল্লাহ যেকোনো মানুষের তওবা কবুল করবেন। পাশ্চাত্যে এখন ইংরেজ লেখকদের তুলনায় রুমীর বইয়ের পাঠক সংখ্যা বেশি। এখন অনেকে বলে, মুসলমানরা নাকি যুদ্ধংদেহী। তারাই যখন রুমীর কবিতায় আকৃষ্ট হয়, তারা দেখে মুসলমানদের অন্তরে প্রবাহিত মমতার ফল্গুধারা।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেখানে চর্মচক্ষুতে দেখার বাইরেও যা আছে সেটা হচ্ছে মন। মনটাকে যে যত ওপরের দিকে নিতে পারবে, সে অনেক কিছুই দেখতে পারবে। এটা খুব গোপন জগত, এই গোপন জগতে যারা যেতে চান তাদের আলাদা চলা-বলা, আলাদা সংগীত, আলাদা জিকির। পৃথিবী থেকে অনেকখানি গুটিয়ে নেন তারা নিজেদেরকে। এই সূক্ষ্ম জগতে সর্বক্ষণের উপস্থিতি যার, সেই দয়াময় পরম প্রভুকে প্রতিটি মুহূর্ত উপলব্ধি করাই তাকওয়ার মূল কথা। এটা হলো তাকওয়ার পরিচ্ছদ, এই পরিচ্ছদটা

যিনি পড়েছেন তিনি অম্লান নির্মল ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন।

এ জীবনের জন্যে অনেক সময় দিয়েছি। এখন যে জীবন আমাদের হাতছানি দিচ্ছে তার জন্যে বেশি কাজ করা প্রয়োজন। সেটা শুধু নিজের জন্যে নয়, যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই এগিয়ে যেতে হবে। সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে, সর্বোপরি মমতা আর ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে হবে পৃথিবীটাকে।

মহাজাতক যে কোর্সটি প্রবর্তন করেছেন এবং নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে যে হাজার মানুষ তার কোর্সে অংশ নিয়েছেন, আমিও তাদের একজন। আমি অনেক বয়স্ক হলেও সেখানে গিয়েছি একটি ছোট্ট শিশু হিসেবেই। মহাজাতকের বক্তব্য শুনেছি, উপভোগ করেছি এবং নোটও নিয়েছি।

কয়েকজন নবীন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এসেছেন? আমি বললাম, দেখ, তোমরা এসেছ বৈজ্ঞানিকভাবে মনের নিয়ন্ত্রণ ও একাগ্রতা বৃদ্ধির কৌশল শিখতে কিংবা ক্যারিয়ার সম্পর্কে জ্ঞান নিতে। আর আমি মেডিটেশন কোর্স করছি কারণ আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি–জানতে চাই যে, এগুলোর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি উপকৃত হয়েছি। কোর্সের বিষয়বস্তু এবং আমার বিশ্বাসকে সমন্বয় করতে পেরেছি। যারা সত্যিকার জীবনবোধ সম্পর্কে ধারণা নিতে চান তাদের উচিত হবে এরকম একজন সত্যিকারের গুরু–যার কাছে মানুষ দীক্ষা নিতে পারে তার কাছে যাওয়া এবং জীবনযাপনের এ বিজ্ঞান শিখে নেয়া।

আমি আমার জীবনীগ্রন্থ 'জীবন নদীর উজানে'-তে মহাজাতকের কথাও লিখেছি। তার কাছ থেকে যে অনেক কিছু শিখেছি তা উল্লেখ করেছি। মহাজাতকের সহাস্য উপস্থাপন, সুন্দর বাচনভঙ্গি, সহজভাবে কথা বলার সাবলীলতায় আমি মুগ্ধ। আমি তার একজন ভক্ত। তিনি একজন আত্মিক গুরু। মেডিটেশনের গুরু। তার কাছে না গিয়েও অনেক কিছু পাওয়া যায়। এটাই হলো আধ্যাত্মিক শিক্ষার একটি ছন্দ।

আমি মনে করি, আমাদের সন্তানদের জন্যে এ কোর্স অবশ্য কর্তব্য। যারা জীবনকে সুন্দর দেখতে চান অর্থাৎ জীবনের সাথে আরো অনেক কিছুকে যোগ করে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে চান তারা কোয়ান্টাম থেকে জীবনযাপনের এ বিজ্ঞান শিখতে পারেন।

অনুলিখন : নূর আখতার হেলেন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। একজন প্রগতিশীল ছাত্রনেতা, বিপ্লবী রাজবন্দি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, তেজোদীপ্ত সাংবাদিক, অকুতোভয় সাংস্কৃতিক যোদ্ধা–বহু পরিচয়ের বিরল সমাবেশ ঘটেছে তার ব্যক্তিত্বে। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি বলেছেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা দিক নিয়ে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ লাখো মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস

কামাল লোহানী

এক প্রৌঢ়া বিধবা। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্পে তার ১৭ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে এসে বললেন–'আমার এই ছেলেটিকে আপনারা সাথে নিয়ে নিন। যুদ্ধের জন্যে কোনোভাবে কাজে লাগানো যায় কি না দেখবেন।' ছেলেটি কদিন পরে এক অপারেশনে গিয়ে মারা গেছে শুনে সেই মহিলা ৯ বছর বয়সী তার একমাত্র বেঁচে থাকা ছেলেকে নিয়ে এসে বললেন, 'এবার একে নিয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধের জন্যে আমি আমার এ সন্তানকেও উৎসর্গ করছি।'

১২ বছর বয়সী এক কিশোর। দাঁড়িয়ে আছে এক পাকিস্তানি সৈন্যের সামনে। কদিন আগে তাদের গ্রামে ঢুকে পড়া পাকিস্তানি বাহিনীরই একজন সদস্য এই সৈন্য। ইতোমধ্যেই গ্রামটিতে চালিয়েছে তারা ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ। পাকিস্তানি সৈন্যটির তৃষ্ণা মেটাবার খায়েশ চরিতার্থ করতে সে বাধ্য হয়েছে জীবনে প্রথমবারের মতো ডাব গাছে চড়তে। বন্দুকের মুখে ডাব পেড়ে আনলো। হুকুম মোতাবেক দা এনে ডাব কেটেও দিলো ছেলেটি। কিন্তু যেই না সৈন্যটি গলা উঁচু করে ডাবের পানি খেতে লাগলো অমনি কিশোরটির

মাথায় খেলে গেল বুদ্ধি। গলায় চালিয়ে দিলো ধারালো দা-এর পোঁচ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো সৈন্যটির। বর্বর পাক-আর্মির অত্যাচারের বদলা নিতে এভাবেই বাধ্য হলো এক গ্রাম্য কিশোর।

এভাবে লাখো সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ, সমর্থন আর সহযোগিতায় মাত্র ৯ মাসে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে যা এক বিরল ঘটনা।

আসলে আত্মশক্তি-সচেতনতা এবং রুখে দাঁড়ানোর সাহস প্রতিটি মানুষের প্রবৃত্তিজাত। অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনার মাধ্যমে সে যখন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখন এই আত্মশক্তিতে সে হুংকার দিয়ে ওঠে, লড়াই করতে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা আসলে এরকমই একটা ব্যাপার।

১৯৭১ সালে আমি কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করলেন বাংলাদেশের নিজস্ব একটি বেতার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার জন্যে। যার ফলশ্রুতিতে দেয়া হলো ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভের একটি ট্রান্সমিটার।

কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা দোতলা বাড়িতে শুরু হলো এর কার্যক্রম। যেটাতে সদ্য গঠিত প্রবাসী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীও প্রথম কিছুদিন অবস্থান করেছেন। বাড়িটার পেছনেই ছিলো বিএসএফ-এর ব্যারাক। দুপুরে যখন তাদের মেসে খাবার দেয়া হতো তখন সেখানে জড়ো হতো শকুন আর কুকুরের দল। বেতারে আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় মাঝে মাঝে সেসব আওয়াজও ঢুকে পড়তো বৈকি। কিন্তু প্রবাসে বসে একটা যুদ্ধরত জাতির একমাত্র নিজস্ব প্রচার মাধ্যম পরিচালনায় এ ত্রুটিটুকু বোধ হয় অনায়াসেই মেনে নেয়া যায়।

পাকিস্তানি বোমা আঘাত হানার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জনা দশেক বেতার কর্মী ১০ কিলোওয়াটের একটা ছোট্ট টান্সমিটার নিয়ে পালালেন। পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল পাড়ি দিয়ে তাদের একটা দল গিয়ে পৌঁছলো আগরতলায়। এদের মধ্যে সংস্কৃতি কর্মীরা ছিলেন, ছিলেন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী আর দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গে ব্রতী শব্দ-সৈনিকেরা।

বন্য শুকর হেঁটে যাচ্ছে আর তার সামনে বসে ভাত খাচ্ছে বেতারকর্মী। সিগারেটের প্যাকেটের একটুখানি কাগজে কোনোরকমে লেখা খবর থেকে

পড়ে শোনানো হচ্ছে সংবাদ বুলেটিন, তা আবার ইংরেজি অনুবাদ করেও পড়ে শোনাতে হচ্ছে। আবার বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতেও খবর এবং অনুষ্ঠান করতে হবে এই সীমিত লোকবল নিয়েই। যারা খবর পড়তেন কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণের বেতার মানদণ্ডে তারা হয়তো উৎরাবেন না। কিন্তু সে খবর শোনার জন্যেও মানুষ যে কী উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতো–লেপের তলায় দরজা-জানালা বন্ধ করে বা ১০/১২ জন একসাথে বসে হন্যে হয়ে চেষ্টা করতো স্বাধীন বাংলা বেতারের একটু খবর শোনার জন্যে।

একবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে লাগাতার ৩ দিনের হরতালে আমরা ভীষণ অসুবিধায় পড়লাম। কারণ বালিগঞ্জ থেকে ৪৫ মিনিটের গাড়িপথের একটা দূরত্বে স্থাপিত হয়েছিল আমাদের ট্রান্সমিটার। সেখানে অবশ্য আমাদের যাওয়ার সুযোগ ছিলো না। নির্দিষ্ট সময়ে বিএসএফ-এর একজন লোক এসে পোর্টফোলিওতে আমাদের টেপগুলি ভরে নিয়ে যেতেন।

এখন হরতালের মধ্যে কীভাবে সেখানে যাওয়া যাবে–এ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলো। আমরা বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু–এই তিন সার্ভিসের জন্যে তিনজন সংবাদ পাঠক এবং একজন টেকনিশিয়ান পাঠাবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তারা শুধু আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলো। আমরা তখন একটু বিকল্প পথে কাজ করলাম। রণাঙ্গন থেকে মাঝে মাঝে আমাদের সহযোগীরা আসতেন। তারা বলে যেতেন আগামী কয়েকদিনে তাদের সম্ভাব্য অপারেশনগুলোর কিছু পরিকল্পনার কথা। যেমন, এই অপারেশনে এই এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, এতে এরকম ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি।

এসব পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা তখন বসে তৈরি করে ফেললাম আগামী ৩ দিনের জন্যে ৯টা বুলেটিন। অর্থাৎ যা ঘটতে পারে তাকে 'ঘটেছে' হিসেবে বর্ণনা করে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কৌশল। আর এর ফলাফলও এসেছিলো আমাদের অনুকূলেই।

সেই দিনগুলো যতবার স্মরণ করি ততবারই রোমাঞ্চিত হই, শিহরিত হই। ভাবি–কী অসাধারণ বীরত্ব, সাহস আর সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার নজির বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। কিন্তু যখন বর্তমান বাস্তবতার দিকে তাকাই কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি। অবাক লাগে যে, এই কি সেই বাঙালি জাতি যারা একসাথে লড়ে মাত্র ৯ মাসে পরাজিত করেছে পৃথিবীর অন্যতম সুসংগঠিত, সুসজ্জিত একটি সমর বাহিনীকে।

কিন্তু কেন এ অবস্থা? আমার মনে হয় দেশের স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু কারো কারো চাওয়ার উদ্দেশ্যে সততার অভাব ছিলো। আমরা কেউ অর্থলিপ্সু, কেউ ক্ষমতালিপ্সু, কেউ পদলিপ্সু হয়ে পড়লাম। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পর তাকে অর্থবহ করে তোলার জন্যে যে সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রয়াস দরকার, আমরা তা পারি নি।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে তাই এখন দরকার লক্ষ্য এবং মানসিকতার সার্বজনীনতা। সবাইকে এক হয়ে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। আর তা হলো দেশের কল্যাণ, জাতির শেকড় সন্ধান।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

সংখ্যা শক্তি নয়।
শক্তি হলো বিশ্বাস ও সঙ্ঘবদ্ধতা।
পৃথিবীকে সবসময় নেতৃত্ব দিয়েছে
লক্ষ্য সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী
সঙ্ঘবদ্ধ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ।

কাজে উদ্যোগী
না হলে
প্রতিটি কাজই
অসম্ভব মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী একজন সফল বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী। 'Intuition is the highest form of intelligence' উক্তিটি তারই। তিনি উপাচার্য থাকাকালীন দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রেটিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি অতীন্দ্রিয় জগৎ, ইনটুইশন, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বলেন।

ইনটুইশন টেলিপ্যাথি ও প্রজ্ঞার সন্ধানে

অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী

জিন ডিক্সনের সামনে একটি কৃস্টাল বল। গভীর মনোযোগে তিনি এর ভেতরটা দেখছেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, 'আমি হোয়াইট হাউজের ওপর একটি কালো মেঘখণ্ড দেখছি। প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন।' একটি রেস্টুরেন্টে কয়েকজনের সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন ডিক্সন।

এর মধ্যে টিভি চ্যানেলের খবরে বলা হলো প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি আহত অবস্থায় হাসপাতালে। ডালাসে যাওয়ার পথে হঠাৎ আততায়ীর গুলি তার শরীরে এসে বেঁধে।

হাসপাতাল থেকে তখনো কেনেডির মৃত্যুর কথা বলা হয় নি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ডাক্তাররা কেনেডিকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে জানা যায়, জিন ডিক্সন যে সময়ে প্রেসিডেন্টের মারা যাওয়ার কথা বলেছেন ঠিক সেই সময়েই তার মৃত্যু হয়।

আমেরিকান এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কৃস্টাল-বল সাধনা করতেন। তার ব্যক্তিগত জীবনেও এরকম অসংখ্য ঘটনা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে। একবার তার স্বামী আমেরিকার একটি রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যাবেন। বিমানবন্দরে চেকিং পর্যন্ত হয়ে গেছে। একটু পরেই প্লেন ফ্লাই করবে। এমন সময় হঠাৎ

জিন বললেন, তুমি আজকে যেও না। অনেকটা জোর করেই তিনি তার স্বামীকে প্লেন থেকে নামিয়ে আনলেন। ২৫ মিনিট পর খবর এলো প্লেনটি ক্রাশ করেছে এবং যাত্রীদের একজনও আর বেঁচে নেই। সেদিনের সে ঘটনার জন্যে জিনের স্বামী তার কাছে আজীবন ঋণী হয়ে ছিলেন।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ও জয়যাত্রায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্বের জ্ঞানভান্ডারের গভীরতা ও বিস্তৃতি এত ব্যাপক যে, আবিষ্কারের বর্তমান অবস্থানকে সমুদ্র উপকূলের নুড়ির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জ্ঞানের এ মহাসমুদ্রে আমরা এখনো হাবুডুবু খাচ্ছি। বাস্তবে ঘটনা ঘটছে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা রয়ে গেছে পর্দার অন্তরালে। টেলিপ্যাথি, ইনটুইশন কিংবা প্রজ্ঞা এমনই এক বাস্তবতা।

'টেলিপ্যাথি' বা 'চিন্তাযোগাযোগ' সম্পর্কে আজকে অতীন্দ্রিয়বাদীদের চৌহদ্দির বাইরে আলোচনা হলেও গত শতকের শেষ দিকে এটিকে মনে করা হতো অবাস্তব চিন্তা। টেলিপ্যাথির ব্যাপারে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীদের সঙ্ঘবদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে।

আক্ষরিক অর্থে টেলিপ্যাথির সংজ্ঞা করলে দাঁড়ায়–কোনো বস্তুগত মাধ্যম ছাড়া দুই ব্যক্তির মাঝে কথা, ছবি, চিন্তা, ধারণা বা ভাবের আদান-প্রদান। এখানে একজন প্রেরক এবং আরেকজন গ্রাহক। কিন্তু সেই অদৃশ্যমান চ্যানেলটি কী তা আজো আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। সেটা কোনো রেডিও-ওয়েভ বা মাইক্রোওয়েভ নয় বা অন্য কোনো মাধ্যমও নয়। তাই বলে টেলিপ্যাথিকে অস্বীকার করা যাবে না। এটি একটি ধ্রুব সত্য।

ফ্রয়েডের মতে, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ক্ষমতা সহজাত। প্রত্যেকের ভেতরেই এ শক্তি রয়েছে। তাই মনে করা হয়, কোনো তার-তরঙ্গ ছাড়াই এক মস্তিষ্ক থেকে অপর মস্তিষ্কে বাণী প্রেরণ বা গ্রহণ অসম্ভব কিছু নয়। যদি তা অসম্ভবই হতো তাহলে কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী ছেলে বা মেয়ের অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার সাথে সাথেই মায়ের মন উদ্বেলিত হতো না।

এজন্যে কৃস্টাল বল চর্চার বা অতীন্দ্রিয় সাধনার জগতে সর্বক্ষণ বিচরণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পৃথিবীতে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জীবনে একবারও ইনটুইশন কাজ করে নি অথবা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ঘটে নি।

সুফি-সাধকরা ধ্যানস্থ হয়ে আরেকজনের আত্মার অনুভূতিটা নির্ণয় করতে পারেন। এটি কোনো কল্পকাহিনী নয় বরং বাস্তব সত্য। তারা ধ্যানস্থ হয়ে

কারো দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই বলে দিতে পারেন—সে এ মুহূর্তে কী চিন্তা করছিলো, তার অতীতে কী ঘটেছে আর ভবিষ্যতেই বা কী ঘটতে যাচ্ছে।

এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের ১০ হাজার কোটি নিউরোন সেল আলোর গতিতে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করছে। একটি নিউরোনের এক্সন যখন আরেকটি নিউরোনের ডেনড্রাইটে তথ্য প্রেরণ করে তখন তাদের মাঝখানের অতি সূক্ষ্ম ফাঁকে (একে সিন্যাপ্‌স বলা হয়) খুব মৃদু ম্যাগনেটিক ওয়েভ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তাররা বা সাইকিয়াট্রিস্টরা বলেন, কারো মস্তিষ্কে সৃষ্ট এ ওয়েভ যেকোনো কিছু ভেদ করেই আরেকজনের মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে। যার মস্তিষ্কে যাচ্ছে সে-ও সংকেত শনাক্ত করতে পারে। যে কারণে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ঘটেছে এমন দুজন ব্যক্তির মস্তিষ্কের EEG (ইলেকট্রো-এনসেফেলোগ্রাফ) করলে একই ব্রেন ওয়েভ পাওয়া যায়।

টেলিপ্যাথির ক্ষমতা সহজাতভাবে সবার থাকলেও এ ক্ষমতাকে ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের ভাষায় সুইচ অন/অফ করার সামর্থ্য। আর সেটাই সম্ভব মেডিটেশনের মাধ্যমে। কারণ ক্রমাগত মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমেই চিন্তাকে সেই সূক্ষ্ম স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যে স্তরে এই টেলিপ্যাথি যোগাযোগ, ভবিষ্যৎ দর্শন বা জীবনের সাফল্য—সবকিছুই লাভ করা সম্ভব।

যারা মেডিটেশন চর্চা করেন তারা ব্রেনকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করেন। ফলে আর দশজন সাধারণ মানুষের চেয়ে তারা একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করতে পারেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের মধ্যে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ বেশি ফলপ্রসূ হয়। কারণ স্থান-কালে সীমাবদ্ধ সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় চিন্তা, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ বা ভাবাবেগের ফলে এ ওয়েভে ছেদ পড়ে। আর মেডিটেশন ও শিথিলায়নে মনের প্রশান্ত অবস্থায় যোগাযোগটা হয় নির্বিঘ্নে। তখন একজন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক কিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। ফলে এ জ্ঞানকে নিজের কল্যাণে কাজে লাগানোর সাথে সাথে মানব কল্যাণেও প্রয়োগ করতে পারে।

পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা একবার 'Life after death' অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এজন্যে তারা সেসব রোগীদের বাছাই করেন যারা 'কিছুক্ষণ পর মারা যাবে' এমন অবস্থা থেকে আবার বেঁচে উঠেছে। এদের কেউ হয়তো কোমায় চলে গিয়েছিলো, কেউ বা ক্যান্সার কিংবা হার্টের রোগী।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান–এ তিনটি অঞ্চলের রোগীরা প্রায় সবাই একই অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। তারা দেখেছেন একটি গভীর সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে তারা যাচ্ছেন শেষ প্রান্ত থেকে বিচ্ছুরিত একটি সবুজাভ আলোর দিকে। সেই ভ্রমণ এত প্রশান্তির ছিলো যে, বাস্তবে ফিরে আসাটা কারো জন্যেই আনন্দের ছিলো না। সবকিছুর পরেও তবু বলতে হয়, রহস্য লুকিয়ে আছে ব্রেনের মধ্যেই যার গঠনপ্রক্রিয়া, তৎপরতার খবর এখনো মানুষের জানার বাইরে।

যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা দেখছি, অনুভব করছি তার বাইরেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামে আরেকটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা–এর অবস্থান আমাদেরই কপালেরই কোনো একটি অংশে; যা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে, সম্ভাব্য বিপদ-আপদকে বুঝতে পারে। অতীন্দ্রিয় এ ক্ষমতা সবার থাকলেও একে ধরে রাখার জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে। প্রথমত, যে বস্তুজগতে আমরা বাস করছি তার মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়লে এ জগতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আবার বস্তুকে ত্যাগ করেও নয়। বরং দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ধাপে ধাপে এ পথের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে।

আর আত্মশুদ্ধির একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছলে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেমন দেখা যায়, তেমনি যে কারো সাথে স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ করা যায়। যুগে যুগে মহামানবরা এরকম পর্যায়ে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। মধ্যভারতে ধর্ম প্রচার শেষে মহামতি বুদ্ধ শিষ্যদের বললেন তাঁকে নেপালে নিয়ে যেতে। শিষ্যরা বললো, "আপনি তো ঠিকই আছেন"। কপিলাবস্তুতে ফিরে এসে তিনি অসুস্থ হন। তাঁরই নির্দেশে মৃত্যুর আগের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান।

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল আজীবন একটি বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। তিনি বলতেন, আমি জীবনে এমন একটি আলোর মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু সামনে একটি পর্দা থাকায় আলোটাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে না পাওয়ার এ ব্যর্থতা তাকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়াতো। এ আলোটা কী, আর পর্দাটাই বা কী? যারা আলোকিত মানুষ তারাই সে পর্দা উন্মোচন করতে পারেন। নিজেরা যেমন আলোকিত হন তেমনি সে আলো ছড়িয়ে দেন চারপাশের মানুষের মাঝে।

[২০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক। ১৯৯৩ সালে কোয়ান্টাম মেথডের যাত্রাশুরুর দিনটি থেকেই তিনি এ চেতনার একনিষ্ঠ কল্যাণকামী হিসেবে সবসময় অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। ৩০০ কোর্সপূর্তির প্রাক্কালে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট শিক্ষক সমাবেশে তিনি বলেছেন কোয়ান্টাম মেথড নিয়ে তার দীর্ঘ দেড় যুগের পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির কথা।

কোয়ান্টাম ॥ মনুষ্যত্ব ঠিকানা খুঁজে পায় যেখানে

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপরে তার কোনো আস্থা নেই। কিন্তু সেই মানুষগুলোর ওপর তার আস্থা আছে, যাদের মধ্যে অন্তত তিনটি গুণ আছে–যারা সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে, মহান অনুভব যাদের চিত্তে সবসময় থাকে এবং জগৎ ও জীবনের স্বার্থে যারা সঠিক কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

কারণ এই তিনটি গুণ সম্বলিত মানুষ সমাজের জন্যে সম্পদ, দেশের জন্যে সম্পদ। অন্যথায় সে মানুষ নিজের জন্যে বোঝা, সমাজের জন্যে হুমকি, দেশের জন্যে ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ শেষ কথাটি হচ্ছে 'মানুষ চাই'। নিজে মানুষ হলে সমাজটা মানুষ হয়, দেশও মানুষ হয় এবং দিনবদল ঘটে।

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ৩৮ বছর পেরিয়ে গেল। স্বাধীনতা আমাদের কাছে অনেক বড় স্বপ্নের দ্যোতক ছিলো, সূচক ছিলো। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এমনকি সেই ত্রিশের দশকে যখন বাংলাদেশ ভাগ হয় নি তখনই নজরুল বলে গেছেন–'আমাদের বাংলাদেশ, রাজরাণী এখন ভিখারিনী, কাঁদিছে বনে লুটিয়ে কেশ।'

কেন এ অবস্থা? বিভিন্ন সময় গবেষকরা নানান তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন এর কারণ হিসেবে। অথচ সহজ সত্যটি হলো আমাদের যাবতীয় সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা। গত বইমেলায় 'মনুষ্যত্বের সংকট' নামে আমার একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো, যাতে আমি বলেছি আমার চূড়ান্ত উপলব্ধ সত্যের কথা–বাংলাদেশ গড়বার জন্যে মানুষ চাই, যে মানুষের এখন বড় অভাব।

১৬ কোটি মানুষ আমাদের জন্যে সমস্যা নয়। সমস্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জন্যে, আইএমএফ-এর জন্যে। আমার দেশের সবচেয়ে বড় সংকট যেমন মনুষ্যত্বহীনতা, তেমনি আমার দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হতে পারে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা। এই ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাত আছে, ১৬ কোটি মন আছে, ১৬ কোটি মস্তিষ্ক আছে।

এগুলো যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে এই দেশ বিশ্বের বিস্ময় হতে পারে। আর গুরুজীর নেতৃত্বে ফাউন্ডেশন সে কাজটিই করছে। গুরুজী একসময় হাতের রেখা ধরে আমাদের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ তৈরি করে দিতেন। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার সখ্য, ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু তিনি নিজের মতো বদলে গেলেন একদিন। তিনি দেখলেন মানুষের এই রোডম্যাপ তো মানুষ নিজেই তৈরি করতে পারে, যদি মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠে।

সেই মানুষ–যে মানুষের মন আছে, যে মনে নেতিবাচক চিন্তা নেই, আছে কল্যাণভাবনা, আছে সৃষ্টিশীল প্রণোদনা, আছে চেতনা। জাগতিক হতাশা-ব্যর্থতা এবং বিপন্ন, বিষণ্ণতায়ও যে মানুষ নিজের মধ্যে স্থিতধী, সে মানুষ আমাদের জন্যে সম্পদ। গুরুজী এই সম্পদ সৃষ্টির কাজে লেগে গেলেন এবং আমি দেখছি ক্রমেই তিনি বিস্তৃত হচ্ছেন, সম্প্রসারিত হচ্ছেন গভীর শিকড় নিয়ে। তিনি তার শক্তিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সারাদেশে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোয়ান্টামই একদিন এই বাংলাদেশের দিনবদলের অনুঘটক হবে। হয়েছেও ইতোমধ্যে। কারণ রাজনীতি নয়, এখানে কোয়ান্টামের মতো উদ্যোগগুলোই দিনবদল ঘটাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কোয়ান্টাম শুধু তার ব্যাপ্তিই বাড়ায় নি, শুধু কোয়ান্টিফাই-ই করে নি, করেছে কোয়ালিফাই। অর্থাৎ গুণগত মান বাড়াবার কাজ। মানুষকে মানুষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার কাজ। একজন মানুষ তার শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে ধ্যানের মধ্য দিয়ে, ইতিবাচক শক্তির মাধ্যমে কীভাবে জয় করবে–শিখিয়েছে সে প্রক্রিয়া।

আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচকতা যে একজন মানুষের বাস্তবতাকে কীভাবে

বদলে দেয় তার একটা উদাহরণ হলো, একটু বয়স হয়ে গেলেই আমরা বলতে থাকি–বয়স বাড়ছে, এখন আর আগের মতো মনে থাকে না কিছুই। তার মানে আপনি নিজেই নিজেকে বৃদ্ধ করছেন। আপনার শরীরের যন্ত্রগুলোকে আপনি দুর্বল করে দিচ্ছেন।

বিজ্ঞান বলে, ২৮ বছর বয়স থেকে আমরা শারীরিক নিয়মেই স্মৃতিশক্তি হারাতে থাকি আর ৫৮-র মধ্যে স্মৃতিশক্তির জীবন শেষ হয়ে যায়। ৫৮-র পর থেকে বার্ধক্যের লক্ষণগুলো ফুটে উঠতে থাকে, প্রায়ই তার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা হতে থাকে।

কিন্তু একজন সচেতন মানুষ বা আত্মশক্তিসমৃদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আরেকটি সূত্র তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা হলো ৫৮-র পরে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের সেকেন্ডারি মেমোরি গড়ে ওঠে, যিনি তার স্মৃতিকে কর্মক্ষম রাখার জন্যে ভালো কাজে, নতুন নতুন দক্ষতা শেখার কাজে ব্যবহার করেছেন এবং পজিটিভ অটোসাজেশন দিয়েছেন।

অন্যদিকে যারা নেতিবাচক চিন্তায় বেশি সময় ব্যয় করে তাদের স্মৃতিশক্তি সবচেয়ে দুর্বল থাকে। পিকাসো তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ৯৮ বছর বয়সেও সন্তানের জনক হয়েছিলেন। কাজেই মানুষের মধ্যে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাগুলোই জাগিয়ে তুলছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

মানুষের যাবতীয় জ্ঞান মেধা মনন সৃজনের উৎসে রয়েছেন স্রষ্টা। তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমেই মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কিন্তু স্রষ্টা বিস্মরণের কারণে আমাদের সমগ্র চিন্তা-ভাবনা-কর্মে মেধারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য নৈতিকতা আজ অনুপস্থিত। নৈতিকতাহীন মেধা কোনো কিছু গঠন ও বিনির্মাণে কখনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

মেডিটেশন মানুষের মেধার বিকাশে সহায়তা করে। কেননা আত্মনিমগ্ন অবস্থায় একজন মানুষ নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানতে পারে; নিজের ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করে; বুঝতে পারে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে। আত্ম আবিষ্কারের জন্যে প্রতিদিন কিছুটা সময় হলেও নিজের ভেতরে ডুব দেয়া প্রয়োজন। যুগে যুগে সত্যের বাণী নিয়ে যেসব মহামানব এসেছেন জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে ধ্যানমগ্ন হয়েই তারা পেয়েছিলেন এ সত্যের সন্ধান।

ধ্যানমগ্নতা জঞ্জালের মতো নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনাগুলোকে দূর করে ইতিবাচক ভাবনায় নিজেকে উজ্জীবিত করে। ইতিবাচক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি

দ্বারা অসংখ্য মানুষ তার মনোদৈহিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। যার চিন্তা ও ভাবনা ইতিবাচক, তার কর্মও ইতিবাচক হতে বাধ্য। সে কখনো পরাজয় মেনে নেয় না।

আর মেধার বিকাশে বিশ্বাস একটি অপরিহার্য শর্ত। আত্মগর্বী নয়, আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আত্মবিশ্বাস যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলায় একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তারা নিজের ভেতর সবসময় এই বিশ্বাসের শক্তিকে অনুভব করেন। তাদের ভেতর জন্ম নেয় এক নতুন প্রাণশক্তি।

তাই মেধার বিকাশের জন্যে বিশ্বাস ও মেডিটেশন–এ দুটোর সংযোজন করতেই হবে। আর আপন স্বার্থের মাঝে ঘুরপাক খাওয়া মানুষ কখনো মেধাবী হতে পারে না; পৃথিবীকে কিছু দিতে পারে না। আপন স্বার্থ এবং সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে যিনি সেতুবন্ধন করতে পারেন তিনিই সত্যিকারের মেধাবী। মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করে সমাজ বদলের অনুঘটক মানুষেরাই পরিণত হন কালজয়ী অনন্য মানবে।

ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলতেন, তোমরা যেমন মাছের চাষ কর, তেমনি তোমরা মানুষের চাষ কর। এই মানুষের চাষ হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে। আসুন এই চাষ-বাসে একটু সার দিই–আমাদের ফলগুলো যেন বেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষ যেন মনুষ্যত্বের ঠিকানা খুঁজে পায় এই ফাউন্ডেশনে।

১৯৯৩ সালে ১ জানুয়ারি পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। আমার সৌভাগ্য যে সেদিনও আমি ছিলাম। তখন ছিলো শীতের দিন। স্যুট, কোট-টাই পরে বেশ কেতাদুরস্ত হয়ে বক্তৃতা করেছিলাম, গরমে ঘামি নি, কোনো লোডশেডিং ছিলো না; এখন এসে দেখলাম লোডশেডিং হলো, গরমে ঘামলাম, কিন্তু ফাউন্ডেশনের কাজ নিয়ে যা দেখলাম যা শুনলাম তা গরমের ঘাম আর শ্রান্তিটুকু ভুলিয়ে দিয়েছে।

আমার একান্ত কামনা এ প্রতিষ্ঠান আরো বিস্তৃত হবে। হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, নেতিবাচক চিন্তায় বিপন্ন এবং আত্মধ্বংসী ভাবনায় প্রায় বিধ্বস্ত–এমন মানুষগুলোকে পুনরায় আশাবাদের ঠিকানা চিনিয়ে দেবে এ ফাউন্ডেশন।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, আগস্ট ২০০৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক। তিনি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানা দিক নিয়ে এ ভাষণ দেন।

জাতিগত স্বপ্ন পরিবর্তনের সূচনা করে

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ

জাপানের একজন অর্থনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী একবার বলছিলেন, তাদের কাজের সংস্কৃতি আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে একজন শ্রমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গবেষক নিজেদের কাজগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাত তার মধ্যেই মগ্ন থাকে। সে সময় পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে সে খবর তারা রাখেন না, এমনকি পেপারও পড়েন না।

জাপানের এ পদ্ধতি আবার বাংলাদেশে কাজ করবে না। আসলে কাজের সংস্কৃতি নির্ভর করে কর্মী, তার কর্মপরিধি ও কর্ম পরিবেশের ওপর। যদিও প্রত্যেককে তার কাজের মধ্যেই সর্বোচ্চ মনোযোগ ঢেলে দেয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মতো দেশে মন দিয়ে কাজ করার সময় যদি দেখি কেউ অনাহারে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে তখন মানবিক কারণেই মন সেদিকে টানবে। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে আমার মূল কাজ যথাযথ শিক্ষাদান ও গবেষণা। তার পাশাপাশি দেশ সেবার অংশ হিসেবে শিল্প, ব্যবসা বা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আমার ভূমিকা থাকতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই কারো পক্ষে সব কাজে মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। এজন্যে মূল সূত্র হলো নিজের মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী কোথায়, কতটুকু

সময় ও শ্রম দেয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করা–তা নিজের, অন্যের বা দেশের জন্যে হোক না কেন।

ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলো কাজের ক্ষেত্রে যে সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সিস্টেম একটু এদিক-ওদিক হলেই তারা খেই হারিয়ে ফেলে। কয়েক মিনিটের বিদ্যুৎ-বিভ্রাটও তাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট।

আর এদিকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাজারো টানাপোড়েন সামলাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি। ফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে বাড়ছে আমাদের সহনশীলতা, মানিয়ে চলার ক্ষমতা, বিপর্যয় মোকাবিলা করার শক্তি ও সাহস।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক প্রতিভাবান–যাদের জিনিয়াস বলা হয়–তাদের চেয়ে মধ্যম মানের বা অতি সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীরাই সাধারণত ভালো রেজাল্ট করে। এর মূল কারণ হলো ব্যালেন্সিং। কারণ সবগুলো বিষয়ে গড়পড়তায় ভালো করলেই সর্বমোট হিসেবে ভালো করা যায়।

অথচ জিনিয়াস বা ব্রিলিয়ান্টরা তাদের যা করতে বা পড়তে ভালো লাগে সারাক্ষণ সেটার মধ্যেই ডুবে থাকে। গণিত ভালো লাগলে সেটা করতে করতেই বাংলা পড়তে ভুলে যায়। তাদেরকে কোনো ট্র্যাকে রাখা যায় না। ফলে সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা আর প্রথম সারিতে থাকতে পারে না। শুধু ছাত্রজীবনে নয়, একজন মানুষের পুরো জীবনেই সুসমন্বয় প্রয়োজন।

বর্তমান জীবনের দিকগুলো এখন ছড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে পারিবারিক পেশাগত পারিপার্শ্বিক সামাজিক–সর্ব ক্ষেত্রে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রের এত কাজ, এত যোগাযোগ, এত উদ্বেগ ও চ্যালেঞ্জকে ঠান্ডা মাথায় হাসিমুখে মোকাবিলা করার সূত্র রয়েছে মেডিটেশনে।

আমি আরেকটি কৌশল অবলম্বন করি–কম্পার্টমেন্টালাইজেশন অর্থাৎ কাজের বিভক্তিকরণ। একটি কাজ শেষ করে পরবর্তী কাজ শুরু করা এবং তখন আর আগের কাজটি নিয়ে কোনোরকম ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় না ভোগা।

জাতিগতভাবে অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আমাদের মানসিক শান্তির পথে একটি বাধা। আমরা এপ্রিসিয়েশনের চেয়ে কম্পিটিশনে বেশি অভ্যস্ত। প্রতিযোগিতা ভালো, কারণ ক্রমাগত প্রতিযোগিতার মধ্যে না থাকলে ভালো কিছু করা যায় না। কিন্তু 'সে পারছে আর আমি পারছি না' মনে করে প্রতিযোগিতা যদি ঘৃণা-হিংসার পর্যায়ে চলে যায় তখন তা

হয়ে যায় আত্মঘাতী।

খেলায় হেরে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মন একটু খারাপ হবে। কিন্তু সুস্থ প্রতিযোগিতা সেটাই–যেখানে বিজয়ীর ভালো খেলাকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসে বিজিত পক্ষ। আর তখনই আসলে বিজিতের মধ্যে পরবর্তীতে ভালো করার প্রণোদনা কাজ করে। মানসিক স্থিরতা নিয়ে সে আবার মাঠে নামতে পারে।

অর্থনীতিবিদ হিসেবে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন আমাদেরও গবেষণার বিষয়। অর্থনীতির মাপকাঠিতে যদি একাধারে ২৫ বছর কোনো দেশের বার্ষিক জিডিপি ৭%-এর বেশি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায় এবং সে দেশটি ধনী দেশের তালিকায় স্থান পায়।

এ হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ২০০টিরও বেশি দেশের মধ্যে মাত্র ১৩টি দেশ ধনী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং এ দেশগুলোর অবস্থান পূর্ব এশিয়াতেই। এদের কারো কারো অবস্থা একসময় বাংলাদেশের মতো বা তার চেয়েও খারাপ ছিলো। কিন্তু ১৯৫০ সালেও যা তাদের কাছে স্বপ্ন ছিলো আজ তা দৃশ্যমান বাস্তব।

কাজেই জাতিগত স্বপ্ন নিঃসন্দেহে পরিবর্তনের সূচনা করে। তবে বাস্তবে এ পরিবর্তন হতে হবে দেশীয় আদলে, নিজস্ব কাঠামো-উপযোগী করে। ইদানীং গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলোর সংস্কার-পরামর্শ অনেক দেশই মেনে চলছে, কিন্তু তাদের সবাই ধনী হয়ে যায় নি।

আসলে বাইরের সাহায্য নিয়ে কখনোই পরিবর্তন সম্ভব নয়। বরং নিজেদের প্রয়োজন বুঝে যেখানে যেভাবে যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার পরিকল্পনা করলে ফলাফল যেমন কাঙ্ক্ষিত হয়, তেমনি সময়-সম্পদেরও অপচয় রোধ হয়।

আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যতই হোক না কেন, তা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে যদি এর অন্যতম চালিকাশক্তি অর্থাৎ দেশের নেতৃত্ব সৎ, যোগ্য ও দূরদর্শী না হয়। অর্থনীতির সব তত্ত্ব-সূত্র-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই নেতৃত্বের প্রশ্নে এসে থেমে যায়।

একই অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ-কোরিয়া ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলো কিন্তু বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে পড়লো তার উত্তর মেলানোর সময় আজ এসেছে।

একবার সুখী মানুষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার

করেছিলো, যেখানে স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত আমেরিকা ছিলো সবচেয়ে অসুখী মানুষের দেশ। অর্থনৈতিক পরাশক্তি হলেই যে সুখ আসবে তা নয়। আসল সুখ নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর–যা আছে তা নিয়েই একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে পরিতৃপ্ত কি না, সন্তুষ্ট কি না।

এজন্যে অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা আর মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা। তখনই দেশ পরিণত হয় সমৃদ্ধ দেশে, জাতি পরিণত হয় সুখী জাতিতে।

অনুলিখন : শাফিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

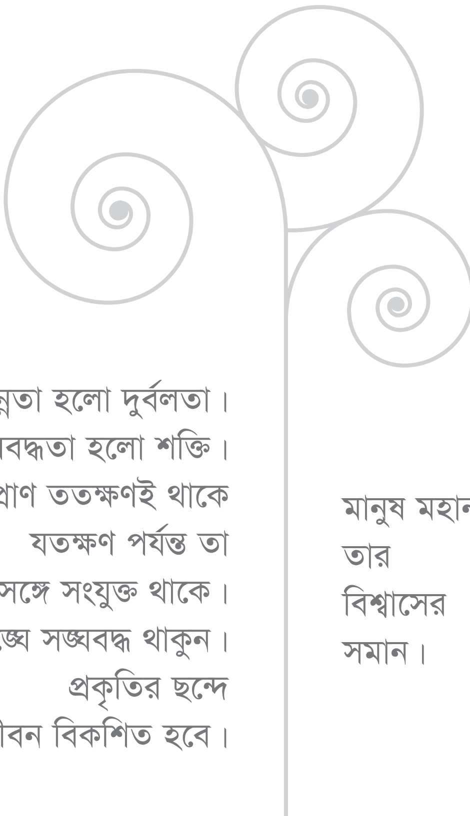

বিচ্ছিন্নতা হলো দুর্বলতা।
আর সঙ্ঘবদ্ধতা হলো শক্তি।
গাছের প্রাণ ততক্ষণই থাকে
যতক্ষণ পর্যন্ত তা
মূলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।
সৎসঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ থাকুন।
প্রকৃতির ছন্দে
আপনার জীবন বিকশিত হবে।

মানুষ মহান
তার
বিশ্বাসের
সমান।

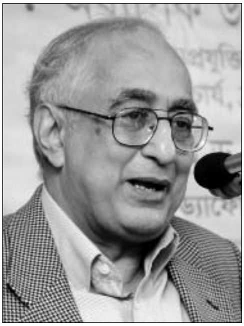

বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তির বিকাশে অন্যতম পথিকৃৎ ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ ভাষণ দেন।

তথ্যপ্রযুক্তিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে কোয়ান্টাম আইসিটি

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

৪০ বছর আগে ক্লাস নেয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের বলতাম—কম্পিউটার কী কী করতে পারে। আর এখন বলি, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কম্পিউটার করতে পারে না এমন কাজ খুব কমই আছে। কম্পিউটারে এখন আমরা কত কিছুই না করতে পারি। একসময় যা ছিলো অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি—কম্পিউটিং, ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার, যোগাযোগের মাধ্যম, অডিও, ভিডিও—এ সবকিছুই এখন কম্পিউটার প্রযুক্তির কল্যাণে এক যন্ত্রের মধ্যে চলে এসেছে। তাই নতুন করে এর নামকরণও হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র তখন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, কম্পিউটার নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যা খুব দ্রুত হিসেব করতে পারে। তখন থেকেই কম্পিউটারের প্রতি আমার আগ্রহ। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন কোনো কম্পিউটার ছিলো না।

১৯৬৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্যে আমি যুক্তরাজ্যে যাই। ওখানে যাওয়ার পরের দিনই ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সেন্টারে গেলাম। তখন কম্পিউটার সেন্টারগুলো ছিলো বিরাট বিরাট একেকটা বিল্ডিং, বিশালাকার কম্পিউটার, সেই সাথে আনুষঙ্গিক বহু যন্ত্রপাতি আর প্রয়োজনীয় তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে দেখি, এটা তারা সবাইকে ব্যবহার করতে দেয় না। যদিও আমার পড়াশোনা আর গবেষণার মূল বিষয় ছিলো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তবু রেজিস্ট্রেশন করে কয়েকদিনের মধ্যেই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখলাম। সে-ও আজ প্রায় ৪৭ বছর আগের কথা।

আমার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিলো উচ্চ ইমারত পরিকল্পনা। ভাবলাম, এক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে উঁচু বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করা যায়। ওখানে তিন বছর আমি এ নিয়ে গবেষণা করেছি। আমাকে যে অফিস-রুম দেয়া হয়েছিলো সেখানে না থেকে বেশিরভাগ সময়ই আমি সেই কম্পিউটার সেন্টারেই থাকতাম। আমার একটা বড় সময় সেখানে কেটেছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ডেভেলপ করে। এভাবেই কম্পিউটারের সাথে আমার যোগাযোগের শুরু।

১৯৬৮ সালের নভেম্বরে পিএইচডি সম্পন্ন করার পর ক্যারিয়ারের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমাকে। একদিকে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আকর্ষণীয় চাকরির অফার, অন্যদিকে দেশে ফিরে আসার তাড়না।

আমার সবসময় মনে হতো, এ জীবনে যদি কিছু দিয়ে যেতে পারি তা আমার মাতৃভূমিকেই দেবো। বিশেষজ্ঞদের প্রবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে একটা যুক্তি কাজ করে যে, বাংলাদেশে থেকে প্রফেশনাল স্যাটিসফ্যাকশন আসে না। কিন্তু আমি বলি, বাংলাদেশে থেকে আমি যত ধরনের প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, মনে হয় না বিদেশে গেলে কেউ এ সুযোগ পেতো।

১৯৬৮ সালে দেশে ফিরে আমি যোগ দিই বুয়েটের প্রভাষক হিসেবে। ততদিনে দেশে কয়েকটি কম্পিউটার এসেছে। ঢাকায় প্রথম কম্পিউটারটি আসে ১৯৬৪ সালে, পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে। তখনকার সময়ে এটি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত গতির কম্পিউটার ছিলো।

বুয়েটে তখন কম্পিউটারের কোনো কোর্স ছিলো না। কর্তৃপক্ষকে বললাম, এখন থেকে কম্পিউটার পড়াতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার সম্বন্ধে ধারণা দেয়ার জন্যে প্রায়ই আমি তাদের নিয়ে যেতাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে।

তারপর গত কয়েক দশকে সবকিছুতে–বিশেষ করে প্রযুক্তিতে কী অকল্পনীয় পরিবর্তন এসেছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আগে প্রথম দিককার সেই ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারগুলো চালাতে এত বিদ্যুৎ লাগতো যে, এটি যখন অন করা হতো তখন আশেপাশের শহরগুলোতে বিদ্যুতের ভোল্টেজ কমে যেত। অথচ সেই অতিকায় বিশাল যন্ত্রের চেয়ে এখনকার

একটি মোবাইল ফোনের ক্ষমতাও কয়েক হাজার গুণ বেশি।

প্রযুক্তির এ সার্বিক উন্নয়নের ধারা গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে। আমার মনে আছে, ১৯৯৬-এর এপ্রিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে আমরা যখন শপথ নিলাম তখন একটাই চিন্তা ছিলো—প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথে বাধাগুলো কীভাবে অতিক্রম করা যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৬-এর জুনে আমরা প্রথম সরাসরি ইন্টারনেটে প্রবেশের সুযোগ পাই। কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে এমন বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আমাদের হয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন ঘরে বসে কাজ আর আয়ের সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে। যার মধ্যে একটি হলো আউটসোর্সিং। আমাদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের যে, আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন তৃতীয়। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা হয়তো প্রথম অবস্থানে পৌঁছে যেতে পারবো। ভারতের ব্যাঙালোরকে বলা হয় আইসিটির 'ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্ল্ড'। কিন্তু আউটসোর্সিংয়ে ব্যাঙালোরের অবস্থান এখন চতুর্থ। বিশ্বজুড়ে বড় বড় কোম্পানি যারা বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজ জোগাড় করে দেয় তাদেরই র‍্যাংকিং এটি। আর আউটসোর্সিংয়ের এ কাজটি গ্রামে বা শহরে যেকোনো স্থানে বসেই করা যেতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এগিয়ে যেতে এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো, দক্ষ মানবসম্পদ। আমার মনে হয়, সীমিত পরিসরে হলেও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেই উদ্যোগ ও দায়িত্বটি নিয়েছে। যা ক্রমান্বয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। এভাবে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগতির বিকল্প নেই।

আইসিটি কার্যক্রম উদ্বোধনের বিষয়টি ছাড়াও 'কোয়ান্টাম' নামটি শোনার সাথে সাথে আমি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। বছর কয়েক আগে কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেদিন অনুষ্ঠানস্থলের সামগ্রিক পরিবেশ দেখে আমি বেশ মোহিত হয়েছিলাম। জীবনে আমি দেশে-বিদেশে বহু বক্তৃতা দিয়েছি। কিন্তু এত আগ্রহী আর মনোযোগী শ্রোতা আমি মনে হয় আর কোথাও পাই নি। এরকম শ্রোতার সামনে বলতে পারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের একটি ব্যাপার।

আমার বন্ধু-বান্ধব, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, ছাত্র ও পরিচিতদের

মধ্যে অনেকেই আছেন যারা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করেছেন। কোয়ান্টামের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্বন্ধে আমি প্রায়ই তাদের কাছে শুনি এবং কোর্স করে তাদের অনেকেই এখানে নিবেদিতভাবে কাজ করছেন।

কোয়ান্টামের প্রত্যেকটি কাজই বেশ সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আরো একটি নতুন কার্যক্রমের দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি। ১৯ বছর আগে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম যে সাফল্য অর্জন করেছে সেজন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের আমি অভিনন্দন জানাই।

আমি আশা করি, কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রম থেকে যারা প্রশিক্ষণ নেবেন তারা নিজেরা যেমন সমৃদ্ধ হবেন, তেমনি জাতীয় সমৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন। কারণ, আজ আমাদের চাই এমন এক দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী তরুণ প্রজন্ম–যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বের দরবারে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করাবে। সমৃদ্ধ স্বদেশের এ স্বপ্ন প্রতিটি তরুণ-হৃদয়ে বুনে দেয়ার জন্যেই নিরলস কাজ করে যেতে হবে আমাদের।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জানুয়ারি ২০১২ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মনের অতিচেতন স্তর
মহাবিশ্বের সকল জ্ঞানভাণ্ডারের
সাথে সরাসরি সংযুক্ত।
আত্মনিমগ্ন অবস্থায়ই
অতিচেতন স্তর থেকে
জ্ঞান ও উপলব্ধি
সচেতন স্তরে প্রবেশ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭৯ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের প্রত্যয়নে দেয়া বক্তব্যে এবং সাক্ষাৎকারে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মেডিটেশনের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন।

নিরাময় ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে মেডিটেশন

অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম

একজন মানুষ হাঁটতে হাঁটতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোনোভাবেই আর হাঁটতে পারছে না, ক্লান্তিতে মাটিতে পড়ে আছে। হয়তো কাছেই তার বাড়ি কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও তার নেই। এমন সময় সে যদি শোনে–একটা বাঘ আসছে, তাহলে সে উঠে দৌড় দেবে। শক্তিহীন হয়ে পড়া মানুষটি দৌড় দেয়ার এ শক্তিটুকু পেলো কোথায়?

ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। এক্ষেত্রে 'বাঘ আসছে'–এ তথ্যটি সাইকোলজিক্যাল ইনপুট হিসেবে লোকটির ভেতরের শক্তিটুকু জাগিয়ে দিলো। সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজির চমৎকার ও বাস্তবভিত্তিক একটি উদাহরণ এটি।

সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি বিষয়টি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখনো নতুন। ১৯৭০ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। মনের শক্তির মাধ্যমে নার্ভাস সিস্টেমকে প্রভাবিত করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত ও পূর্ণ কর্মক্ষম করে তোলাই এর প্রধান কাজ। বর্তমানে দেশের ৬০টি সেন্টারে এইডস ও হেপাটাইটিস আক্রান্ত

রোগীদেরকে আমরা এ পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং করছি।

একজন মানুষ যখন জানতে পারে তার এইডস হয়েছে বা দুরারোগ্য কোনো রোগে সে আক্রান্ত তখন স্বাভাবিকভাবেই সে বিষণ্ণতা ও হতাশায় ভেঙে পড়ে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত চিকিৎসা ও ওষুধে খুব বেশি উপকার পাওয়া যায় না। কিন্তু কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে রোগীর মনের ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত ও কর্মক্ষম (Immune Boosting) করে তোলা যায়। এটা সরাসরি ব্রেনের হাইপোথ্যালামাস থেকে শরীরের নার্ভাস সিস্টেমকে প্রভাবিত করে।

গতানুগতিক চিকিৎসার চেয়ে এ পদ্ধতির সামগ্রিক ফলাফল অনেক ভালো এবং এতে কোনো ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না। সত্যি বলতে কি, শুধু কথার মাধ্যমে সাইকোলজিক্যাল ইনপুট দিয়ে একজন মানুষকে যেমন মেরে ফেলা যায়, আবার মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচিয়ে তোলাও সম্ভব। মূলত এই কাউন্সেলিং-ই রোগীর মনের ভেতরে ইতিবাচক অটোসাজেশন বা প্রত্যয়নে রূপ নেয়। রোগী ফিরে পায় বিশ্বাস, অনুভব করে অন্তর্গত শক্তি ও নিরাময়ের তীব্র আকুতি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে গুরুজীর আলোচনায় যা আরো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

এইডস ছাড়াও ক্যান্সার, হেপাটাইটিস ও বিভিন্ন ক্রনিক ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমরা এখন সাইকোলজিক্যাল ও নিউট্রিশনাল ইনপুটকে চিকিৎসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছি। কারণ এসব ক্ষেত্রে এখনো তেমন কোনো কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয় নি। এ পদ্ধতিতে আমরা রোগীদের অনেকখানি উপকার করতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় আমরা চিকিৎসকরা প্রকৃতপক্ষে রোগীদেরকে যথাযথ সেবা দিতে পারছি না বা দিচ্ছি না। শুধু কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করছি। উপযুক্ত কাউন্সেলিংয়ের অভাবে রোগীর মানসিক, আত্মিকসহ সার্বিক পরিচর্যা তাই হচ্ছে না। ওষুধ খেয়ে উপকার হয়তো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সামগ্রিক নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায় যথাযথ কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে।

তাই রোগীদের সাথে কথা বলাটা এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। রোগীরা চিকিৎসার জন্যে যে বিদেশে যাচ্ছেন তার একটি বড় কারণ হলো ডাক্তারদের কাউন্সেলিংয়ের অভাব। কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ইনপুট দিতে হলে রোগীর সাথে কথা বলতে হবে।

কোয়ান্টাম কোর্সে এসে অনেকেই বিভিন্ন রোগ থেকে সেরে উঠছেন। কিন্তু গুরুজী তো কাউকে কোনো ওষুধ দিচ্ছেন না, তার বিশ্বাসের কথা আর কোয়ান্টামের ইতিবাচক পরিবেশই এক্ষেত্রে নিরাময়ের প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। সাথে ওষুধ আর ডাক্তারের পরামর্শ তো সহায়ক শক্তি হিসেবে থাকছেই।

মূলত নিজেকে জানার ও আত্ম-অনুভবের তাগিদ থেকেই আমার কোয়ান্টামে আসা। সার্বিকভাবে এটি চমৎকার একটি প্রক্রিয়া। এখানে আমি নিজেকে আরো সম্পৃক্ত করতে চাই। কোয়ান্টাম হিলিং প্রক্রিয়াকে আরো বিস্তারিত উপলব্ধি করতে চাই, যাতে এ থেকে রোগীরা আরো বেশি উপকৃত হতে পারেন।

সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে চমৎকার, সমৃদ্ধ ও বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও প্রক্রিয়া আমি এখানে দেখলাম। এর মাধ্যমে রোগমুক্তির প্রক্রিয়া অনেক সহজ হবে বলে আমি আশা করি। মানব কল্যাণের চিন্তা করে গুরুজী কোর্সটিকে সেভাবেই সাজিয়েছেন।

আত্মনির্মাণ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টামের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আমি জেনেছি। স্ব-অর্থায়নে বাংলাদেশে কোয়ান্টাম ল্যাবের মতো একটি অত্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজটিও অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকেই যাতে ফ্যাক্টর এইট, ফ্যাক্টর নাইন এবং ইমিউনোগ্লোবিউলিনসহ অন্যান্য সুপার কম্পোনেন্টগুলো সরবরাহ করা যায় সে লক্ষ্যে আমি সবরকম সহযোগিতা করতে চাই।

এ ব্লাড ডোনেশন সেন্টারটিকে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। আর কোয়ান্টামের প্রতিটি কাজই যেরকম সিস্টেমেটিক, মেথডিক্যাল ও সু-পরিকল্পনাপ্রসূত তাতে এ কাজটি অনেক সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশ নিয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। অমিত সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের সামনে। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী, দক্ষ এবং যেকোনো কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। দক্ষতার দিক থেকে এদেশের মানুষ জাপানের সমকক্ষ, কিছু কিছু ব্যাপারে এগিয়েও আছি আমরা। আমরা পিছিয়ে আছি শুধুমাত্র উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সিস্টেমের অভাবে। তাই প্রয়োজন সুসংহত ও দক্ষ নেতৃত্ব।

আর সে নেতৃত্ব দিতে এদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের তরুণরাই বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে খুব ভালো কাজ করছে। কিন্তু শুধু সিস্টেমের অভাবে দেশে অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষ নেতৃত্ব ও সবখানে চমৎকার একটি সিস্টেম গড়ে উঠলে জাতি হিসেবে আমরা খুব অল্প সময়েই জাপানের মতো দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে পারি। আমি বিশ্বাস করি সে যোগ্যতা আমাদের রয়েছে।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক ‘কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস’ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রশান্ত মন
নিরাময় প্রক্রিয়াকে
বেগবান করে।
মনের সুখ
দেহের অসুখকে
সবসময়
ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

‘দেহ ও মনে
আমি সম্পূর্ণ
সুস্থ হতে পারি’–
এ বিশ্বাসই
পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে
প্রথম প্রয়োজন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ কে এম সাদেক। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বার কাউন্সিল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, ল' কমিশন এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস্-এর সদস্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছু শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্ত্রী-কন্যা ও নাতনিকে নিয়ে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭২ ব্যাচে অংশ নেন।

সমস্যাটা ছিলো মনের, সমাধানের সূত্রও তাই পেয়েছি মনেরই নিয়ন্ত্রণে

বিচারপতি এ কে এম সাদেক

বছরখানেক আগে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস্-এর একটি অধিবেশনে যোগ দিতে জার্মানিতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্টে একটা দুর্ঘটনা হলো।

বিমানের ল্যাডার থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম। ১৪ দিন কোমায় ছিলাম। দেশে এসেও হাসপাতালে থাকতে হলো কিছুদিন। দুর্বলতা ছিলো, হাঁটতে কষ্ট হতো। তারপরও ধীরে ধীরে সেরেই উঠছিলাম। কিন্তু বছর কয়েক আগে কিছু সমস্যার কারণে মানসিক উদ্বেগ, কষ্ট এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করলো আমার। সেই থেকে ছন্দপতন হলো স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের।

এমন সময় আমার নাতনিরা ধরলো আমাকে–'নানাভাই, মেডিটেশনে চলো। তুমি ভালো হয়ে যাবে।' এদিকে আমার মনেও চলছে ভাবনার তোলপাড়, শরীরের কোনো সমস্যা তো আমার অসুস্থতা ঘটায় নি। এ শরীর নিয়েই তো এতদিন দিব্যি ছিলাম। যেদিন টেনশন করলাম, মনে কষ্ট পেলাম সেদিনই অসুস্থ হলাম। তার মানে অসুখটা মনে, হৃৎপিণ্ডে নয়; সমস্যাটা

ব্রেনের চিন্তায়, স্নায়ুতে নয়। অর্থাৎ সমাধানের সূত্রও রয়েছে মনে। এই ভেবে নাতনিদের সাথে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭২ তম ব্যাচে অংশ নিলাম।

দেখলাম, আমার পর্যবেক্ষণ সঠিক। কোর্সের প্রথমদিন গাড়ি থেকে নেমে হলে এসে বসতে কয়েকজনের সহযোগিতা লেগেছিলো আমার। দ্বিতীয় দিন শুধু লাঠিতে ভর করেই হেঁটে এসেছি। আর তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন লাঠি এবং কারো সহযোগিতা ছাড়াই আমি হাঁটছি, কথাও বলতে পারছি বেশ স্পষ্টভাবে। কারণ কোর্সের এ দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে মানসিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে ফিরে এসেছে আমার সুস্থতাও।

শুধু সুস্থতাই নয়, কোর্সে এসে সতীর্থ এবং কোয়ান্টামের কাউন্সিলর অর্গানাইজার প্রো-কোয়ান্টিয়ার–সবাই যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সমমর্মিতা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন সেটা আমাকে অভিভূত করেছে, আশাবাদী করেছে।

একবার বিদেশে ভ্রমণের সময় মালপত্রসহ হুইল চেয়ারে বসা অসুস্থ আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রী বেশ অসহায় বোধ করছিলেন। সেই সময় একজন বিদেশি সহযাত্রী যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আসলে একটি জাতির উত্থানের প্রকাশ হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, সমমর্মিতা ও নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতায়। কোয়ান্টামে এসে আমি এর সবই দেখেছি।

আমার জন্ম ১৯২৮ সালের ১০ আগস্ট কুমিল্লার মুরাদনগরে। দাদা এবং বাবা দুজনই ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। সমৃদ্ধ আইন পেশার সুবাদে দাদা হাজী আবদুস সোবহান একটা জমিদারিও কিনে ফেলেন।

বংশের প্রথম সন্তান বলে প্রাচুর্য এবং প্রশ্রয় দুটোই আমি পেয়েছি অঢেল, কিন্তু বখে যাই নি। কারণ একজন দায়িত্বশীল পিতার মতোই আমার বাবা তার সন্তানদের লালন করেছেন সীমিত চাহিদায় অভ্যস্ত করে, কষ্ট এবং পরিশ্রমের মানসিকতা দিয়ে। জমিদারের ছেলে হয়েও বছরে আমরা পেতাম সাধারণ কাপড়ের দুই সেট জামা-হাফপ্যান্ট। কলেজে পড়ার সময় ঢাকা-কুমিল্লা যাতায়াত করেছি সবসময় ইন্টার ক্লাসে চড়ে।

একবার কলেজ ছাত্রদের জন্যে রেলওয়ে একটা সুবিধা দিলো–যে ক্লাসের টিকেট কাটা হবে ভ্রমণ করা যাবে তার ওপরের ক্লাসে। স্বাভাবিকভাবেই আমি ইন্টার ক্লাসের টিকেট কেটে সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে বাড়ি গেলাম।

এটা শুনে বাবা বললেন, ‘কেন, থার্ড ক্লাসের টিকেট কেটে ইন্টার ক্লাসে

আসতে পারলে না? এখনই যদি সেকেন্ড ক্লাসের আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে যাও, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে তো সামলাতে পারবে না!'

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। সেখানে অনার্স শেষ করে আবার ভর্তি হলাম এলএলবিতে। পরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং আইন–দুই বিভাগেই শিক্ষকতা করেছি।

পরবর্তীতে আইন পেশা শুরু করার বছর চারেক পর জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিসিএস-এ ফার্স্ট হলাম। মুন্সেফ হিসেবে শুরু হলো আমার সরকারি চাকরিজীবন।

এরপর পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে আমি চলে গেলাম লাহোরে। আমি খুব ভ্রমণপ্রিয় ছিলাম। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়তাম–সীমান্তবর্তী সোয়াত ভ্যালি, খাইবারপাস প্রভৃতি ঘুরে এলাম।

এ চাকরির সময়ই ১৯৭১-এ চলে এলাম ঢাকায়, আর যাওয়া হয় নি। মুক্তিযুদ্ধে আমার দু'ভাই ছিলেন, আমার বোনের স্বামী যুদ্ধে শহীদ হলেন। যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে আমার কর্মজীবন শুরু করলাম।

টাঙ্গাইলে ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর আমি যখন অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন একটি সরকারি চিঠি এলো–আমাকে হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এসেছে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ।

পেশাজীবনে আমি সবসময়ই চেষ্টা করেছি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালনের। লোভ বা অন্যায়ের সাথে আপস না করার শিক্ষাটি পারিবারিকভাবেই আমি ধারণ করেছি। ফলে সাফল্য, সম্মান ও সুনামের পাশাপাশি প্রশান্তি আর প্রাচুর্যও পেয়েছি।

জনশক্তি আমাদের একটা অমূল্য সম্পদ। সমাজের দুটো গোষ্ঠীকে আমরা যদি সুযোগ দিতে পারি তাহলে আমাদের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে বলে মনে করি। একটি হলো নারী সমাজ, আরেকটি আদিবাসী গোষ্ঠী। কারণ ধৈর্য, সহনশীলতা এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা প্রভৃতি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কারণে জাতি গঠনে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছি। যতই দেখেছি ততই মনে হয়েছে, মেধা-প্রতিভা-সম্ভাবনায় আমাদের তরুণ প্রজন্ম সত্যিই অসাধারণ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আমি লক্ষ করলাম, এখানে একদিকে তরুণদের

জন্যে যেমন রয়েছে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা, তেমনি নারীরা এখানে বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছেন আত্মনির্মাণ ও সৃষ্টির সেবায় শরিক হতে। একই সাথে বান্দরবানের অবহেলিত জনপদ লামায় চলছে নানামুখী সেবা কার্যক্রম।

কোয়ান্টাম মেথডকে আমার কাছে একটি বৈজ্ঞানিক এবং পরীক্ষিত প্রক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। কারণ সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তি অর্জনের কমান্ড যখন মেডিটেশনের আলফা লেভেলে দেয়া হয় সেটাই স্থায়ী হয়, কার্যকরী হয়। সুস্থতার জন্যে কোর্স করতে এলেও আমার উপলব্ধির ভান্ডারে জমা হয়ে গেল আরো অনেক মূল্যবান রত্ন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

পৃথিবীতে মানুষই
একমাত্র সৃষ্টি
যে চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা
তার জৈবিক অবস্থা
বদলাতে পারে।

আপনার অতিচেতনার সাথে
সংযোগ স্থাপন করার জন্যে
প্রয়োজন নীরব মুহূর্ত।
প্রতিদিন হাজারো কাজের ফাঁকে
এই নীরব মুহূর্ত বের করে নিন।

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী। `Journey within Islam' তার লেখা একটি উল্লেখযোগ্য ও বহুল পঠিত বই। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি এ ভাষণ দেন।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে ভালো হওয়ার শক্তি

বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হুগলি কলেজে বাবার চাকরি সুবাদে আমরা ছিলাম হুগলির শিবপুরে। যুদ্ধের ডামাডোল বেড়ে যাওয়ায় বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন বগুড়ার পৈত্রিক বাড়িতে আমাদের রেখে আসবেন। ট্রেনে চেপে আমরা রওনা হলাম। পথিমধ্যে কিছু আমেরিকান সৈন্য উঠলো আমাদের বগিতে।

আমাদের ঠিক উল্টো পাশের বেঞ্চিতে বসেছিলো এক তরুণ সৈনিক। হঠাৎ তার হাতে একটা পিঁপড়া দেখে আব্বাকে সে জিজ্ঞেস করলো, এর বাংলা কী? আব্বা বললেন, পিঁপড়া। কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা করেও সে উচ্চারণ করতে পারছিলো না।

হঠাৎ দেখলাম পিঁপড়াটাকে সে আলতো স্পর্শে পাশে নামিয়ে রাখলো, যাতে এর কোনো ক্ষতি না হয়। দৃশ্যটা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিলো। একটা লোক কাঁধে বন্দুক নিয়ে মানুষ খুন করতে যাচ্ছে অথচ একটা ছোট পিঁপড়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও তার কতখানি সতর্ক প্রচেষ্টা। তার মানে, প্রতিটি মানুষই ভালো মানুষ হিসেবে ভালো মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। খারাপ হয় সে পরিবেশ-পরিস্থিতি বা প্রবৃত্তির শিকার হয়ে।

প্রতিটি মানুষই তার ভালো-মন্দ কাজের ব্যাপারে স্বাধীন এবং স্রষ্টার কাছে ব্যক্তিগতভাবেই দায়বদ্ধ। এই স্বাধীনতাকে যদি সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, যদি উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি দেয়া যায় তাহলে তার খারাপ প্রবৃত্তি এবং প্রবণতাকেও সে দমন করতে পারবে অনেকাংশে। আর রাষ্ট্রব্যবস্থার রয়েছে এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমাদের সংবিধানের ৫৯-৬০ বিধানে স্থানীয় শাসনের কথা বলা হয়েছে। সেটা যদি বাস্তবায়িত হতো অর্থাৎ ছোট ছোট এলাকাভিত্তিক গঠিত হতো একেকটি লোকাল ইউনিট বা রিপাবলিক, তাহলে সেটাই হতো সত্যিকার অর্থে জনকর্তৃত্বের সরকার। যেখানে জনগণ স্বাধীন-স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের চাওয়া-পাওয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।

কিছুদিন আগে কুড়িগ্রাম থেকে কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক এসেছিলেন তাদের দুঃখের কথা জানাতে। সমস্যাটা এরকম—পুঁটিমারির দিকে ব্রহ্মপুত্র বাঁধের একটা জায়গা ভেঙে যাওয়ায় তা মেরামতের জন্যে টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ বরাদ্দ দেয়ার সময় আমলারা আরেকটি প্রকল্প অনুমোদন করলেন—ঐ ভাঙনের জায়গায় অর্ধবৃত্তাকারে আরেকটি বিকল্প বাঁধ তৈরি করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্যা প্রতিরোধ হবে বটে, কিন্তু বিনিময়ে মোট ৬টি গ্রামের মানুষকে বাস্তুহারা হতে হবে, যেখানে রয়েছে তিনফসলী জমি।

গ্রামবাসীদের দুঃখটা এখানেই যে, নিজেদের এলাকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকার তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে তাতে যে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি সেটা সরকারকে বোঝানোর কোনো সুযোগ তারা পাচ্ছে না। বছরের কিছু সময় বন্যাকে মেনে নিতে তাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু বাস্তুহারা, জীবিকাহারা হয়ে গেলে তাদের অস্তিত্বই তো বিপন্ন হয়ে যাবে।

স্থানীয় বিষয়গুলোর সর্বোত্তম সমন্বয় ছাড়াও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আরেকটি কার্যকর দিক হলো কর্মকর্তা, নেতৃবৃন্দ এমনকি সাধারণ মানুষেরও সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেমন, মামলা-মোকদ্দমা থেকেই একটা উদাহরণ দেই। জমি-জমার মামলায় বাদী-বিবাদী দুই পক্ষেই মিথ্যা সাক্ষী পাওয়া যায়। তারা গ্রাম থেকে অনেক দূরে একটা আদালতে এসে খুব অবলীলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে যায়। কিন্তু আদালতটা যদি ঐ গ্রামেই হতো, তাহলে তারা আর এ সুযোগটি পেত না। কারণ তখন পরিচিত পরিমণ্ডলে নিন্দার মুখোমুখি হওয়ার ভয় থাকতো।

আমার বিচারিক জীবনে মুসলিম আইনের কিছু রায় নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছিলো তালাকপ্রাপ্তা নারীর তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়া প্রসঙ্গে। আরেকটি ছিলো ওয়ারিশদের অসিয়ত করা যাবে কি না সে প্রসঙ্গে। আর সবচেয়ে আলোচিত রায়টি ছিলো ফতোয়া বা আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তির আছে কি না সে প্রসঙ্গে।

প্রথমটিতে আমি বলেছিলাম, তালাকপ্রাপ্তার তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণের অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলেছিলাম, ওয়ারিশকেও অসিয়ত করা যেতে পারে তবে প্রশ্ন থাকলে তা আদালতে ফয়সালা হতে পারে। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে, ফতোয়া দেয়ার অধিকার আদালতের, কোনো ব্যক্তির নয়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি রায় দিতে চেষ্টা করেছি কোরআন-হাদীসের সঠিক বর্ণনা ও রীতিকে অনুসরণ করে। কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্যতা বা স্বাভাবিক মানবিকতা বিবেচনার বদলে রায়গুলো সম্মুখীন হয়েছে উগ্র আবেগ বা একদেশদর্শী সমালোচনার।

অন্যের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে আমি যেমন সবসময় সম্মান করেছি, নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করতে গিয়েও কোনো ভয়-হুমকি-ধামকির মুখে বিচলিত হই নি। ফতোয়া সংক্রান্ত রায়টির পর আমার প্রতি নানারকম হুমকি এসেছে, ভুয়া বোমার প্যাকেট ফেলে রাখা হয়েছে আমার বাড়িতে। এজন্যে প্রশাসন থেকে বিশেষ নিরাপত্তা পুলিশও দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি সম্মতি দিই নি।

মানুষের এই স্বাধীন সত্তা হরণের আরেকটি উদাহরণ হলো বিশ্বায়ন। এখন পণ্যের প্রসার নির্ভর করে তার কার্যকারিতার ওপরে নয়, কত সুন্দরী বা জনপ্রিয় তারকা এর মডেল হলেন তার ওপর। কিছু নারী তাদের সৌন্দর্যকে বানিয়েছে পণ্য।

বিশ্বব্যাংক বা দাতাগোষ্ঠীগুলোও সাহায্য করে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্বব্যাংক অঢেল অর্থ দিলো রাস্তা তৈরি করার জন্যে। আমরা রাস্তা করলাম। ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলাম যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ এবং সুলভ মাধ্যম রেল-ব্যবস্থাকে। বিনিময়ে রাস্তা তৈরির পর তাদের বাস-ট্রাক-গাড়ি আমদানির পথই সুগম হলো।

আমরা সমস্যার সার্বিক সমাধান না করে আংশিক সমাধানের পেছনে

ছুটতে থাকি। আমাদের এখানে দুর্নীতি হয়, মানুষ ঘুষ খায়। কারণ বিপুল অর্থ দিয়ে কেনার মতো প্রচুর পণ্য বাজারে রয়েছে। একটা পিৎজার দাম যদি আড়াই হাজার টাকা বা একটা পারফিউমের দাম যদি সাত হাজার টাকা হয়, সেটা কেনার জন্যেও অবশ্যই কিছু মানুষ তৈরি হবে যারা প্রলুব্ধ হবে অবৈধ উপার্জনের পথে। আর এ সবকিছুর পেছনেই আছে পুঁজিবাদী চক্রের হাত।

এ বিষয়গুলোতে এখন আমাদের সচেতনতা দরকার। ব্যক্তি থেকে জাতি–সব পর্যায়েই প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কোরআন অনুসারে এই প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সীমাটা খুব সহজবোধ্য একটি ব্যাপার। আর এভাবেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগতভাবে আমরা আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো একটি সফল, সমৃদ্ধ এবং সর্বজনীন শক্তি হিসেবে।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বন্দিত্ব ইট-পাথরের দেয়াল,
লোহার শিকল বা পাটের দড়িতে নয়,
আসল বন্দিত্ব হচ্ছে মনে।
মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে
যে কেউ তার শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে।

বাস্তবতা নির্মাণের শক্তি
আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে।
বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও
আমরা এ বিশালতাকে
সীমিত করে ফেলি।

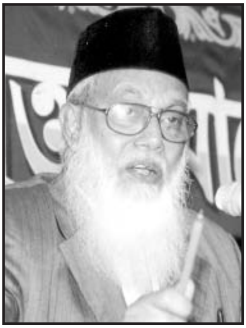

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় এ ভাষণ দেন।

ধ্যান ॥ আল্লাহকে উপলব্ধি করার পথ

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যরা নিজেকে জানার বা আত্ম উপলব্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আসলে নিজেকে বোঝার চেষ্টাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যদি স্রষ্টাকে চিনতে চাও তবে আগে নিজেকে চেনো। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, মানুষ আমার রহস্য। আমি মানুষের রহস্য। এই রহস্য উদঘাটনের জন্যেই মানুষের সৃষ্টি।

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির ওপর আধিপত্য দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন তার প্রতিনিধি। একমাত্র মানুষকেই তিনি দিয়েছেন সেই জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা যা দিয়ে সে আল্লাহর অসীম সৃষ্টিশীলতা ও কুশলতাকে অনুধাবন করতে পারে।

মানুষকে তিনি কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা যায় এভাবে যে, পবিত্র কোরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে মানুষের জন্মরহস্যকেই তিনি তুলে ধরেছেন–'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে।' মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোরআন নাযিলের ৯০০ বছর পর ১৬৭৭ সালে

মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর স্পার্ম সেল নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরাও একই তথ্য দিলেন।

মানুষ যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তা তিনটি মাপকাঠি দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। স্থান, গতি এবং বিশেষ বিবেক। স্থানের মাপকাঠিতে অন্যান্য সৃষ্টিবস্তুর তুলনায় মানুষ যথেষ্ট ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব। সাড়ে ৩ হাতের মানুষকে ২৫ হাজার মাইলের পৃথিবীর তুলনায় একটি বালিকণাই বলা যায়। আর সে যখন পৃথিবীরও ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের তুলনায় দাঁড়ায় তখন কী হয় তা বলাই বাহুল্য। এটা তো বাহ্যিক। কিন্তু মানুষের অন্তর্গত স্থানের কি কোনো সীমাবদ্ধতা আছে?

মানুষের ব্রেনে নিউরোন সেল রয়েছে ১০০ বিলিয়ন। আমি যদি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করি তাহলে এক সূর্য তো বটেই এরকম হাজার-কোটি সূর্যের ধারক গ্যালাক্সিকে আমার ভেতরে নিতে কোনো অসুবিধা হয়? হয় না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এটাই।

দুই হলো গতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে 'মন' নামের এক রহস্যময় অস্তিত্ব। এই মনের গতিকে কি আলোর গতি বা অন্য কোনো মাপক দিয়ে পরিমাপ করা যায়? আলোর গতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। মনের গতি কি এর চেয়েও বেশি নয়?

তৃতীয় হলো বিশেষ বিবেক। সাধারণ সচেতনতা আল্লাহ সবাইকেই দিয়েছেন। একটা পিঁপড়াও জানে কোথায় ঘর করলে ডিম নিরাপদ থাকবে। সাইবেরিয়া থেকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতের পাখি যেমন বাংলাদেশে আসে তেমনি আবার ঠিক ঠিক পথ চিনে ফিরেও যায়। মানুষকে আল্লাহ এই সাধারণ বিবেক যেমন দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন বিশেষ বিবেক–মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রজন্মান্তরে যে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়ে আসছে।

আর যদি কুশলতার কথা বলি তাহলে যেকোনো সৃষ্টির চেয়ে বিস্ময়কর বোধ হবে মানুষের সৃষ্টি। মানুষের ডিএনএ-তে ৩শ কোটি কোড রয়েছে। মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের সঞ্চার হয় তখনই স্থির হয়ে যায় কোন জিন শরীরের কোন অংশটি তৈরি করবে। এমনকি তা নাকের সূক্ষ্ম লোম থেকে শুরু করে মুখের দাঁড়ি পর্যন্ত।

আল্লাহর সৃষ্টির এই পরিকল্পনা ও আর্কিটেক্চারাল কনসেপ্ট–এটা এত নিখুঁত ও রহস্যময় যে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে আমি কে, কেন এসেছি,

সৃষ্টিজগতে আমার অবস্থান কোথায়—এই আত্মজ্ঞানই হওয়া উচিত মানুষের সকল জ্ঞান, সকল শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। আর ধ্যান বা আত্মমগ্নতা এই আত্মজ্ঞান লাভেরই মোক্ষপথ। পবিত্র কোরআনে এ ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন, আসমান-জমিন এবং দিবা-রাত্রি পরিবর্তনের মধ্যে আমি চিন্তাশীলদের জন্যে রেখেছি নিদর্শন।

জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ঘটনা হলো মৃত্যু। কিন্তু সময়টা অনিশ্চিত। অলি-বুজুর্গ, সাধক যারা এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেন তারা বলেন, দমে দমে আল্লাহকে স্মরণ কর। কারণ যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণই জীবন। যেমন, কেউ কোমায় আছে, কথা বলতে পারে না, খেতে পারে না, কাউকে চেনে না। বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কৃত্রিম যন্ত্রপাতি দিয়ে। তারপরও কিন্তু কেউ বলবে না যে, লোকটা মারা গেছে। কারণ তার এখনও দম আছে।

এই দম আমরা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বার নিই আর ছাড়ি। একবার দম নিয়ে যদি তার পরের বার ছাড়তে না পারতাম তাহলে সেটাই কিন্তু হতো আমার মৃত্যু-মুহূর্ত। তার মানে প্রতি মুহূর্তেই আমার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত—বলা উচিত শোকর আলহামদুলিল্লাহ। যে ধর্মাবলম্বী হই না কেন স্রষ্টার প্রতি ধন্যবাদ জানানোর বিকল্প কিছু হতে পারে না। কারণ আলো বাতাস পানিসহ চারপাশের সমস্ত পরিবেশটা বিবেচনা করলে আমরা প্রতি মুহূর্তেই স্রষ্টার আশীর্বাদপুষ্ট।

এই শুকরিয়া, এই স্মরণ এবং এই উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি, প্রয়োজন ধ্যান। ব্যায়াম করলে একজন মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন। কিন্তু সুষম মানসিক গঠন ও বিকাশে প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতি বা ধ্যানের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে ইলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

নবীজী (স) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান করেছেন। একসময় আল্লাহ তাঁকে যথাযথ সত্যে উপনীত করেছেন। ধ্যানকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ কিছু খুঁটি ঠিক করে দিয়েছেন যাতে আমরা দিকভ্রান্ত না হই বা ছিটকে না পড়ি। কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ—ইসলামের এ ফরজগুলোই সেই খুঁটি।

সূরা আর-রহমানে আল্লাহ বলছেন, হে জ্বীন ও মানুষ, তোমরা অসীমে যেতে পারবে। কিন্তু পারবে না আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে। ধ্যানের

মাধ্যমে আমরা এই অসীমেই যেতে পারি। ধ্যানে আমি যখন আল্লাহকে চিন্তা করবো তখন সূর্যের ভেতর দিয়ে চলে গেলেও এর হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপ শরীরে লাগে না। মনের গতিকে কোনো ছাদ, কোনো দেয়াল, কোনো হিমালয়ই আটকে রাখতে পারে না। ধ্যানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ প্রদত্ত এই অসীম শক্তি মানবমনে পরিণত হয় উপলব্ধ সত্যে।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রচলিত সংস্কার যখন
ধর্মাচারের রূপ নেয়
তখন ধর্মের গণ্ডি
ক্ষুদ্র হয়ে আসে।
আর ধর্ম যখন
সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়,
সে তার আপন
উদারতা ও উজ্জ্বলতায়
প্রস্ফুটিত হয়।

স্রষ্টায় সমর্পণ এবং
অহম কখনো
সহাবস্থান করতে পারে না।
সত্তা থেকে অহমের
দুর্গন্ধময় অস্তিত্বকে
অপসারণ করতে পারলেই
সমর্পণের প্রশান্তিময়
সুবাতাস বইতে শুরু করে।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দলের ফার্স্ট সেক্রেটারি অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় এ ভাষণ দেন।

এখনও স্বপ্ন দেখি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের

অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান

ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা যেকোনো জাতির সোনালি ভবিষ্যৎ গড়ার অন্যতম প্রেরণা। বাঙালি জাতিরও রয়েছে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস ও এক গৌরবময় অতীত–যা সে ভুলে গিয়েছিলো পরধন লুণ্ঠনকারী ইংরেজ বেনিয়াদের শাসনের চক্রান্তে পড়ে। আজ আমাদের প্রয়োজনেই সেই সমৃদ্ধ ইতিহাসকে জানতে হবে, কারণ তা আমাদের স্বপ্ন দেখাবে ভবিষ্যতের এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।

প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা বঙ্গদেশ। আজকের বাংলাদেশ তারই অংশ। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, প্রাচীন বঙ্গদেশের সীমানা ছিলো উত্তরে হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ, পশ্চিমে ময়ুরভঞ্জের পাহাড়, বন ঘেরা মালভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অসংখ্য ছোট-বড় নদী বিধৌত বাংলাদেশ। এত ছোট অঞ্চলে এত সংখ্যক নদ-নদী পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। পলিমাটি সমৃদ্ধ বাংলার মাটি তাই কৃষকের প্রাচুর্যের উৎস।

ভৌগোলিক কারণে বাংলার মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বাঙালির স্বভাবেও প্রভাব ফেলেছে। আবেগ আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর এবং কোমল ও শান্ত স্বভাবের বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে পরিচিত হয়েছে সভ্যতার শুরু

থেকেই। অন্যদিকে কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের মতো নিত্যসঙ্গী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে গিয়ে বাঙালি হয়ে উঠেছে দৃঢ়প্রত্যয়ী, আপসহীন ও সংগ্রামী।

স্বাধীনতা তাই তার রক্তের ছন্দে ছন্দে। নৌকা নির্মাণে দক্ষতার কারণে নৌ-প্রতিরক্ষা বা নৌ-যুদ্ধে বাঙালির খ্যাতির কাহিনী ছিলো সবার জানা। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, "পরিবহনের কাজে এবং যুদ্ধের কাজে তারা বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহার করতো। দুর্গ আক্রমণের জন্যে তৈরি নৌকাগুলোর গলুইয়ের সামনের দিক ছিলো দুর্গের উচ্চতারও বেশি। ফলে বাঙালি সৈন্যরা সহজেই দুর্গ দখল করে নিতে পারতো।"

বস্তুত উত্তাল নদ-নদী, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা এবং আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে প্রাচীনকালে বঙ্গভূমি বহুদিন বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বাঙালি যুগ যুগ ধরে তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলো। এমনকি বাইরের কোনো শক্তি সাময়িকভাবে বাংলাকে দখল করে নিলেও অচিরেই বাঙালি সেই অধীনতা ছিন্ন করতো। বিশেষ করে উত্তর-ভারতীয় সম্রাটদের অনেকেই নানাভাবে চেষ্টা করেও এখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। মুসলমান আমলে সমগ্র বাংলায় সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং প্রায় তিন শতাব্দী এ ধারা অক্ষুণ্ন ছিলো। এসময় স্বাধীনভাবে বাঙালি জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

ইতিহাস সচেতনতার অভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অস্বচ্ছ। আলেক্সান্ডারের ভারত আক্রমণের পর গ্রিক ঐতিহাসিকদের লেখায় আমরা জানতে পারি, খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে বাংলা একটি পরাক্রমশালী দেশ ছিলো। আলেক্সান্ডার বিপাশা নদীর তীরে এসে খবর পান, গঙ্গারিড়ই ও প্রাসিঅয় রাজ্যের রাজা অথবা রাজাগণ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাকে বাধা দিতে তৈরি হয়ে আছেন। এটা শুনে গ্রিক সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়লো এবং ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

টলেমির রচনা ও 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল নিয়ে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠিত ছিলো বলে উল্লেখ আছে। এই রাজ্যের রাজধানী শহর গঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিলো। বাংলায় যে সূক্ষ্ম মসলিন তৈরি হতো তা এই বন্দর থেকেই সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি করা হতো। এই নগরের কাছেই সোনার খনি ছিলো। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, বাংলার সুবর্ণ বীথি ও সুবর্ণ গ্রামের উল্লেখ থেকে মনে করা হয় যে, বাংলায় সোনার খনি ছিলো। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমিতে ক্যালটিস

নামক এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল ছিলো। কৃষিকাজে যেমন তারা দক্ষ ছিলো তেমনি ছিলো শিল্পক্ষেত্রেও। ধান পাট নীল ইক্ষু এবং অতি উন্নত মানের কার্পাস তুলাসহ আম কাঁঠাল নারকেল সুপারি কলা লেবু ডালিম ডুমুরসহ বহু ফল-ফলাদির চাষ হতো এখানে।

আজকের কুটির শিল্প, প্রাচীনকালে মূলত শিল্প ছিলো। সেই অর্থে প্রাচীন বাংলা তখনকার বিশ্বে একটি শিল্পোন্নত দেশ ছিলো। বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প এবং ধাতুশিল্প ছিলো প্রধান। তারা তাম্র এবং লৌহের ব্যবহার জানতো। বস্ত্রশিল্পে তখনকার বিশ্বে তারা সবচাইতে উন্নত ছিলো, যে শিল্পের সুনাম ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো বিশ্বব্যাপী। ৩০০ কাউন্টের সুতা তারা কাটতে পারতো।

ইংরেজ কোম্পানির চিঠি থেকে ঢাকায় তৈরি যে বস্ত্রসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো–মলমল আলাবালি সরবতি তঞ্জীব তেরিন্দাম নয়নসুখ শিরবান্ধানি (পাগড়ি) ডুরিয়া জামদানি। মসলিন বস্ত্রের প্রকারভেদ সম্পর্কে ব্রাডলী বাট বলেন, আব-ই-রওয়াঁ বা প্রবহমান পানি এবং শবনম বা শিশির ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান; অথচ জামদানি, পুষ্পিত মসলিন এবং মলমল খাস বা রাজমসলিনও কম সুন্দর ছিলো না। তিনি আরও বলেন, "For transparency, fineness and delicacy of workmanship these fabrics have never been equalled and not all the improvement in the art of manufacture in modern times have been able to approach them" উৎকৃষ্ট কাপড় অনেক বেশি দামে বিক্রি হতো। সাধারণ মানুষের জন্যে স্বল্প মূল্যের মোটা বস্ত্রও এখানে তৈরি হতো।

বস্ত্র শিল্পসহ চামড়া মৃৎ ধাতু স্বর্ণ এবং নৌকা শকট কাঠ এবং হাতির দাঁতের শিল্পীদের কারিগরি এবং প্রযুক্তি জ্ঞান ছিলো অতি উন্নত মানের এবং অনেক দেশের তুলনায় অগ্রসর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়াও বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের বিস্তার ছিলো সমুদ্রপথে সিংহল সুমাত্রা যবদ্বীপ বোর্নিও এবং স্থলপথে চীন আসাম আর দুর্গম হিমালয়ের পথ দিয়ে নেপাল ভুটান ও তিব্বত পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারিত ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের মিশর ছাড়িয়ে ইউরোপের রোম পর্যন্ত।

চতুর্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকার পর্যটক ইবনে বতুতা উত্তর-আফ্রিকা, আরব

হয়ে ভারত বাংলা চীন এবং ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন–সবাই মিশরের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন–"But as far as I can see, by two voyages I have made in the kingdom of Bengal I am of opinion that advantage rather belongs to it (Bengal) than to Egypt. It bears rice in such abundance that it not only feed its neighbours but many very remote points too"

বঙ্গদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বাঙালিরা মূলত ছিলো অসাম্প্রদায়িক। বাঙালির মূল দর্শন ছিলো, কবির ভাষায়–'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বাংলাদেশের প্রাচুর্য, রমরমা বাণিজ্য এবং সুলভ জীবন-প্রণালীর জন্যে ইউরোপ থেকে আগত বণিকদের মুখে মুখে তখন একটি প্রবচন প্রচলিত ছিলো–There are hundred open gates to enter into the kingdom of Bengal and not one to come away again. বস্তুত তখনকার যুগে বাংলাদেশকে বলা হতো ভারতের স্বর্গ।

সেই বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে আজ 'মিসকিন' হিসেবে পরিচিত আর বিশ্বের কাছে অনুন্নত, দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত। তথাকথিত উন্নয়নের জন্যে পশ্চিমা ধনী দেশগুলোর অনুদান ও ঋণের আশায় হন্যে হতে হয় আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে।

অথচ আজো আমরা দরিদ্র নই। আমাদের আছে উন্মুক্ত নীল আকাশ, বাতাস, সূর্যের তাপ, আছে পানিসম্পদ, আছে জনসম্পদ। প্রয়োজন একে সুপরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদনের কাজে লাগানো। এছাড়া এখনও আছে মাটির নিচে অবিশ্বাস্য রকমের খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। যা নেই তা হলো সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব, যারা জাতিকে দেখাবেন আত্মমর্যাদা আর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার স্বপ্ন।

সীমিত পরিসরে হলেও সে দায়িত্বটা নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। সত্যিকারের আত্মসচেতন, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন স্বাধীনচেতা মানুষ গড়ার মাধ্যমে হাজার বছরের লাঞ্ছিত উৎপীড়িত শোষিত জাতিকে আবার একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গর্বিত গরীয়ান সভ্যতায় পরিণত করার লক্ষ্যে তাদের এই চেষ্টায় আমিও একাত্মতা ঘোষণা করি।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

কাজী ফজলুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। 'শিকড়' নামে এক অসাধারণ কথাসাহিত্যের তিনি স্রষ্টা। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৯ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

ইতিবাচক চিন্তা সাধারণ প্রতিভাকে কালজয়ী করে

কাজী ফজলুর রহমান

পৃথিবীতে যারা সফল হয়েছেন তাদের অধিকাংশই সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু ইতিবাচক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন। আমার চেয়ে জীবনে যারা বেশি সফল, তাদের বেশিরভাগই আমার চেয়ে প্রতিভাধর–একথা আমি মনে করি না। তারা বেশি সফলকাম হয়েছেন ইতিবাচক চিন্তার কারণে।

নেতিবাচক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত না হলে আরো সাফল্যের শিরোপা আসতো আমাদের জীবনে। ব্যর্থতার ভয়ে, লোকলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে আমি জীবনে অনেক বড়, অনেক ভালো কিছু করতে পারি নি। এই স্বীকারোক্তি করার মধ্যে আমার কোনো গ্লানি নেই।

আমি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। আমি দেখেছি, যারা সফল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত তাদের দু-একজন ছাড়া বাকি সবাই সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের চিন্তা, তাদের আত্মবিশ্বাসের জন্যেই তারা সফল হয়েছেন।

আবার অনেক প্রতিভাবান মানুষকে দেখেছি, নেতিবাচক ও অগোছালো চিন্তা-ভাবনার কারণে যারা কিছুই করতে পারেন নি। তরুণ বয়সে কোয়ান্টাম মেথডের মতো ইতিবাচক চিন্তার প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেলে সমাজকে

কিছু দিয়ে যেতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ছাত্রজীবনে কিছু কিছু লিখতাম, তারপর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কিছু লিখি নি। কেন লিখি নি? আসলে লোকলজ্জা ও সমালোচনার ভয়েই লিখি নি। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর এক প্রিয়জনের উৎসাহে আবার লেখা শুরু করলাম। নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ আমি নই, কিন্তু লিখতে তো পারছি। এখন ভাবি, যদি ঐ পঁয়ত্রিশ বছর লেখার কাজে লাগাতাম, হয়তো এর চেয়ে বেশি কিছু লিখতে পারতাম।

ফরাসি দার্শনিক মঁন্তে বলেছেন, 'মাই লাইফ হ্যাজ বিন ফুল অব টেরিবল মিসফরচুনস মোস্ট অব হুইচ নেভার হ্যাপেন্ড'। অর্থাৎ আমার সারা জীবনে আপদ-বিপদ-দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা ছিলো বহুতর, যার বেশিরভাগই কোনোদিন ঘটে নি। আমার নিজের জীবনেও এত বিপদ, এত দুর্ভাগ্য গেছে যে, এখন আমি আর তা মনে করতে পারি না। কারণ এর বেশিরভাগই বাস্তবে ঘটে নি।

আসল কথা হচ্ছে–আমাদের জীবনে শঙ্কা, বিপদ ও উদ্বেগের কারণেই আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলি। দু-একটি বিপজ্জনক ঘটনা যে ঘটে না তা নয়; তবে বিপজ্জনক ঘটনার চাইতে মঙ্গলজনক ঘটনাই ঘটে বেশি।

'দি আর্ট অব লিভিং' বইটিতে লেখক দার্শনিক লি-উ-ট্যাং বলেছেন, 'ফিকস দি ফ্যাক্টস, কুইট ওরি; দেন ডু সামথিং এ্যাবাউট ইট'। 'ঠিক আছে, একটা কিছু হবে, চিন্তা করে লাভ নেই। এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি, সেটাই বড় কথা।' উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলি বলেছেন, 'লাইফ ইজ টু শর্ট টু বি ডেস্ট্রাকটেড বাই লিটল থিংস'।

আমার আম্মা কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে, প্রবাদ আছে–কুকুর দিনে দিনে দিল্লী অবধি যেতে পারে। কিন্তু সে কেন যেতে পারছে না? পারছে না তার জ্ঞাতির সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ার জন্যে, মনোযোগ বিঘ্নের জন্যে। পথে পথে ঝগড়া-ঝাঁটি না করলে কুকুর দিনে দিনে দিল্লী চলে যেতে পারতো।

আমরাও অনেক সময় ঠিক তেমনি। কে আমার নিন্দা করেছে, কে আমাকে আজেবাজে কথা বলেছে, তার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে, তাকে আমি দেখিয়ে দেবো–এসব ভাবতে গিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে সরে পড়ছি। এটি যেন আমার তরুণ বন্ধুদের জীবনে না হয় এবং জাতির জীবনেও না ঘটে।

[শততম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও লেখক। তেল-গ্যাস বিদ্যুৎ এবং বন্দর ও খনিজ সম্পদ রক্ষা কমিটির সদস্য সচিব। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি বিশ্বায়নের নানা দিক নিয়ে বলেন।

মানবিক বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেই

অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ

অন্তর্গতভাবে মানুষ একক, অখণ্ড একটি জাতি। অর্থাৎ মানবজাতি। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মেই তার মধ্যে কিছু বৈচিত্র আছে, পার্থক্য আছে। যেমন–গায়ের রঙ, জাতীয়তা, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একেক মানুষের একেক বৈশিষ্ট্য হতে পারে এবং এটাই খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু এ পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতে যদি তার সাথে বৈষম্য করা হয়, নিপীড়ন, নির্যাতন করা হয় বা তাকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে সেটা খুবই অযৌক্তিক একটি ব্যাপার। কারণ এ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিলো তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। যেমন, একজন মানুষ কোন দেশে, কোন বর্ণে, কোন ধর্মে বা কোন ভাষা নিয়ে জন্মাবে এটা সে নিজে নির্ধারণ করে না, এটা নির্ধারিত হয়।

কিন্তু তারপরও এ পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতেই যুগে যুগে দেশে দেশে বৈষম্য হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন, ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে বিভেদটাকে খুব প্রকটভাবে তুলে ধরতো ইউরোপীয় শাসকরা তা হলো গায়ের রঙের প্রভেদ। এটা তারা করতো তাদের শাসন এবং আধিপত্যকে কায়েম করার জন্যেই।

ধর্মের ভিত্তিতে এমনকি ভাষা বা জাতিগত বিভেদের কারণে একই ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেও থাকতে পারে এই বিদ্বেষ। যেমনটি আমরা দেখেছি পাকিস্তান আমলে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম শাসকগোষ্ঠী বাঙালি

মুসলমানকে পুরো মুসলমান বলে স্বীকার করতো না। আর তারপর যে বৈষম্যটি কোনো দেশে কোনোকালেই পুরোপুরি নির্মূল হয় নি, তা হলো লিঙ্গ বৈষম্য–নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিভেদ। অথচ নারী-পুরুষের এই পার্থক্যগুলো খুব স্বাভাবিক জৈবিক পার্থক্য এবং এটা আছে বলেই নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে একটা সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে পারেন।

বৈষম্যের এই যে নানা রূপ, নানা মাত্রা এর বিপরীতে একটি অখণ্ড মানবসমাজের ঐক্যের জন্যেই বিশ্বায়নের ধারণার উদ্ভব। বলাবাহুল্য, তাতে মানবসমাজের এই স্বাভাবিক বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে। কিন্তু তারপরও তারা হবে অখণ্ড ঐক্যসমৃদ্ধ একটি মানবসমাজ। সেটা বিশ্বায়নের প্রচলিত ধারণা নয়, বরং সেটা হলো এক মানবিক বিশ্বায়ন। যেখানে একটি দেশ বাকি পৃথিবীর সঙ্গে তার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলোর একটা বিনিময়ের মাধ্যমে সুস্থ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারে।

আমাদের সম্পদের অভাব আছে এ কথাটি বাংলাদেশ এবং পৃথিবী–দু'ক্ষেত্রেই খুবই ভুল একটি কথা। বলা হয়, পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের অর্ধেকেরও বেশি দরিদ্র। বাংলাদেশের ৭ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে।

এ দারিদ্র সম্পদের অভাবে নয়, বরং সম্পদের অসম ব্যবহার এবং অসম বণ্টনের জন্যে হয়েছে। এ দারিদ্র হয়েছে মানসিক দৈন্য এবং পরনির্ভরশীল মনোভাব থেকে। যেমন, জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি একটি হিসেব করে দেখিয়েছিলো যে, পৃথিবীর জমি, পানি এবং প্রযুক্তি–এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে যে খাদ্য উৎপাদন করা যাবে তাতে ৬০০০ কোটি মানুষের খাবারের সংস্থান হবে যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা হলো মাত্র ৬০০ কোটি।

গত ৩৪ বছরে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়েছে ১০০ ভাগ এবং এ সময়ে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে ১৭০ ভাগ। এখন বাংলাদেশে মাথাপিছু খাদ্যের উৎপাদনও বেশি। কিন্তু তারপরও ৬০ ভাগ শিশু এখানে অপুষ্টির শিকার।

পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ হয় যে খাতে তা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা বা শিক্ষা নয়, তা হলো সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম। প্রতিবছর ৯০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয় এ খাতে। আর এর ৬০ ভাগ অর্থাৎ ৬০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে একা আমেরিকাই। তারপরও আমেরিকা প্রতিনিয়তই হুমকি মনে করে এমন সব দেশকে যারা এর ১ ভাগও খরচ করে না। অথচ জাতিসংঘের একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, এই খরচের মাত্র ১০০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করলেই সারা পৃথিবীর সব

মানুষের জন্যে নিরাপদ পানির সংস্থান করা সম্ভব।

মাটি পানি খনি এবং জনসম্পদ মিলিয়ে বাংলাদেশের মতো এত সমৃদ্ধ অঞ্চল খুব কমই আছে। মাটি যদি উর্বর হয়, তাহলে তা সোনার খনির চেয়েও দামি হতে পারে। কারণ সোনার খনি তুলে ফেললেই শেষ। কিন্তু যে মাটি উর্বর তা তো অনন্তকাল ধরে উৎপাদন দিতে থাকে। আর বাংলাদেশের আছে সেই মাটি।

বাংলাদেশের মতো এত সমৃদ্ধ পানি সম্পদ আছে খুব কম দেশেই। এমনকি বিপুল জনসংখ্যাও আমাদের জন্যে সম্পদ হতে পারে যদি এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়। কারণ মানুষ শুধু মুখ নিয়েই জন্মায় নি, এর সাথে আরো আছে তার হাত পা এবং অমিত সম্ভাবনাময় মস্তিষ্ক। একটা কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে আমরা কত আফসোস করি কিন্তু এই কম্পিউটারের চেয়েও হাজার গুণ শক্তিশালী যে মস্তিষ্কগুলো ফুটপাথে বস্তিতে হেলায় নষ্ট হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের ভাবনা নেই।

এগুলো তো মাটির ওপরের সম্পদ। আর মাটির নিচের সম্পদের মধ্যে রয়েছে গ্যাস, কয়লা। কিন্তু একটি দেশের শাসকগোষ্ঠী যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্যে কতিপয় কোম্পানি বা বিদেশি গোষ্ঠীর ক্রীড়নকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে এতসব সম্পদ বরং সে দেশের জন্যে বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়, বিশেষত সে চক্রান্ত যদি অনবায়নযোগ্য সম্পদ নিয়ে হয়। বাংলাদেশের অবস্থাও যেন অনেকটা সেরকম। কিছুদিন আগে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে শুনছিলাম, পৃথিবীতে যে দুটি তেল ভাণ্ডারকে কিছুই করা হয় নি তার একটি হলো আলাস্কা এবং আরেকটি হলো বঙ্গোপসাগর।

এই তেল বা গ্যাসকে যদি আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করি তাহলে কত কিছুই না করতে পারবো। এখন দেশের ৭০ ভাগ মানুষের কাছে কোনো বিদ্যুৎ নেই। গ্যাস দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো। বিদ্যুৎ হলে উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায় এবং তা হয় দূষণমুক্ত। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রতিনিধি হিসেবে যারা আবির্ভূত হয়েছে তাদের মত অনুযায়ী এসব সম্পদ আমাদের উত্তোলন বা ব্যবহার করার সামর্থ্য নেই। এর জন্যে বিদেশি বিনিয়োগ লাগবে, বিদেশি কনসালটেন্ট লাগবে। তারা এসে মাইলের পর মাইল কৃষিজমি নষ্ট করবে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করবে, পানি শুকিয়ে মরুভূমি বানাবে। তারপর গ্যাস বা কয়লা সব তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাছেই আবার বিক্রি করবে দ্বিগুণ, তিনগুণ বা তার চেয়েও বেশি দামে।

'দাতা সংস্থা' বা 'বিদেশি সাহায্য' শব্দগুলো আমাদের খুব পরিচিত।

আমরা কেউ কেউ মনে করি এটা বোধহয় হাতেম তাঈ বা হাজী মুহম্মদ মুহসীনের দান। কিন্তু আসলে 'দাতা সংস্থা' বলতে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে বোঝায়, আর 'সাহায্য' বলতে বোঝায় এদের নিজস্ব কৌশল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশকে ঋণ দেয়া।

আর এরকম বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নির্বিচার বাস্তবায়ন করেই আমাদের ওপর নেমে এসেছে আর্সেনিক নামের এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের খড়গ। গভীর নলকূপ দিয়ে নির্বিচারে পানি উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভে পানির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এই আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে চলছে তাদের হাজার কোটি টাকার নতুন নতুন প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতিযোগিতা।

বলাবাহুল্য, এসব প্রকল্পের কাজ আর্সেনিক সমস্যার কারণ উদঘাটন নয়, সমাধানও নয়; বরং উদ্দেশ্য একটাই–নানারকম জরিপ করা আর কনসালটেন্টের লাখ লাখ ডলারের বেতন গোনা। মাঝখান থেকে ভুক্তভোগী হলাম আমরা–যারা মাটির নিচের বা ওপরের কোনো পানির ওপরই ভরসা করতে পারছি না। আর এই সুযোগে বোতলজাত পানি ও পানীয়ের ব্যবসা হয়ে উঠেছে রমরমা যা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গবেষণায় স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এখন যে বিশ্বায়ন চলছে তা আসলে একচেটিয়াকরণ। যা নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি রাষ্ট্র, কয়েকটি সংস্থা এবং গুটিকয়েক বহুজাতিক কোম্পানি। যাদের কাছে মুনাফাটাই মুখ্য। বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় মুনাফা হয় এমন সব খাতই এখন বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র; যেমন : পর্নোগ্রাফি ড্রাগস কিংবা অস্ত্রের মতো ক্ষতিকর পণ্য।

এ প্রেক্ষাপটে মানবিক বিশ্বায়নের পথ যতই দুর্গম হোক, আমি বিশ্বাস করি সেটা অসম্ভব নয়। কারণ এ অবস্থা বদলানো যাবে না বা বাংলাদেশ পারবে না–এ ধরনের মানসিক হতাশা এবং হীনম্মন্যতা থেকে ধীরে ধীরে আমরা বেরিয়ে আসছি।

মানুষের ভেতরের অমিত সম্ভাবনা এবং তার সঙ্গে সম্পদ যোগ করে যে বিপুল ক্ষমতার স্ফূরণ সম্ভব সেটা ভাবলেই বিশ্বাস হয় যে, এই পরিবর্তন অবশ্যই আমরা করতে পারবো। সকল প্রকার জাতিগত হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে এই আত্মবিশ্বাস এবং স্বপ্ন দেখার প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম ইতোমধ্যেই শুরু করেছে–এটা খুবই ইতিবাচক একটি দিক।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বিশিষ্ট পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশে পানি সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে এ বক্তব্য দেন।

শুরু করতে হবে যা আছে তা দিয়েই

অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত

পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিলো যে বইটির মাধ্যমে সেটি হলো র‍্যাচেল কারসনের লেখা 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' বা নীরব বসন্ত। অর্থাৎ সভ্যতার অত্যাচারে জর্জরিত এমন এক পৃথিবীর কথা লেখিকা বলেছেন, যেখানে বসন্তে কোনো ফুল ফুটবে না, পাখি ডাকবে না, মৌমাছি গুনগুন করবে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই কথাটা হওয়া উচিত 'লাইফলেস ওয়াটার' বা জীবনশূন্য পানি। অর্থাৎ এমন পানি যেখানে কোনো জীবন নেই, প্রাণ নেই। কারণ আজ থেকে ৪০/৫০ বছর আগে গ্রামের পুকুরে-বিলে হাত দিলেই মেনি মাছ, টাকি মাছ পাওয়া যেত। আর এখন সে বিলটাকেই শীতকালে শুকনো খটখটে করে লাগাচ্ছি বোরো ধান। ফলে বর্ষায় সেখানে থৈ থৈ পানি আছে বটে, কিন্তু সে পানিতে কোনো মাছ নেই।

আমাদের দেশে একসময় 'জলি ধান' বলে একপ্রকার ধানের চাষ হতো, যা বৈশাখ মাসের প্রথমে নিচু জমিতে লাগিয়ে দেয়ার পর বর্ষার পানির সাথে সাথে বাড়তো। অর্থাৎ পানি ১০ ফুট হলে ধান গাছ ১২ ফুট। ঐ পানিতে শিং-টাকি-গজার ইত্যাদি মাছও দিব্যি ঘুরে বেড়াতো। রাতে হয়তো গিয়ে আশ্রয় নিতো ক্ষেতের কোনায় বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখার গর্তটিতে। অর্থাৎ

একই সাথে ধান এবং মাছের চাষ।

এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হয় সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা টেকসই উন্নয়ন, কেউ কেউ বলেন ধারণযোগ্য উন্নয়ন। অর্থাৎ এমন উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের অধিকার মেটাবে কিন্তু ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে না। যে উন্নয়নে প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহৃত হবে, কিন্তু তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। যেমন, জ্বালানী কাঠের জন্যে আমি গাছের ডাল কাটতে পারি, গাছটাকে নয়। বিল থেকে মাছ ধরতে পারি কিন্তু বিলটাকে যেন শুকিয়ে না ফেলি।

২০০২ সালে 'জোহান্সবার্গ প্ল্যান অব ইমপ্লিমেনটেশনের' মধ্য দিয়ে বিশ্ব উন্নয়নের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হয়েছে। তা হলো, উন্নয়নের একটি ধারায় বিশ্ব হাঁটবে। সবাইকে তার সাথে তাল মিলিয়েই চলতে হবে। যে চলতে পারবে না সে পিছিয়ে পড়বে। এ চলাটাকেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' হিসেবে। কিন্তু বাংলাদেশ কি এই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের পথে এগুচ্ছে? আমরা যদি শুধু পানির দিকে তাকাই, তাহলেও উত্তরটা হবে 'না'।

পৃথিবীতে পানির ব্যবহারকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। একটি হলো পানির জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট; আরেকটি হলো মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপট।

পানি জীবনের জন্যে এমন একটি উপকরণ যা অপরিহার্য। খাওয়া থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা, কৃষি, মৎস্য উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন–কোথায় নেই পানির ব্যবহার? যেমন, আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন পানি পান করি। আবার ধান, গমের মতো আমাদের প্রধান খাদ্যশস্যগুলো উৎপাদনেও লাগে প্রচুর পানি। বিশেষত ধান উৎপাদনে যে পানি লাগে তা গমের তুলনায় ১০ গুণ। এ পানিটা যতটা না গাছের জন্যে, তার চেয়ে বেশি নিড়ানির সুবিধার জন্যে। যে কারণে আমাদের সেচ ব্যবস্থার উৎপাদন ক্ষমতার হার মাত্র ৩০-৩৫ ভাগ।

বাংলাদেশে সরকারি নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো–সেচের জন্যে পানির ব্যবস্থা হতে হবে সবার আগে। এমনকি শিল্পের জন্যে পানির প্রয়োজন নিয়েও কমই মাথা ঘামানো হয়। অথচ শিল্পের জন্যে বিদ্যুৎ আর গ্যাসের মতো পানিও অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান। যেমন, যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গে গত ৫০ বছরে তেমন কোনো শিল্প গড়ে ওঠে নি। এর অন্যতম কারণ হলো পানির অভাব।

বিষয়টি নিয়ে আমাদের এখন ভাবা উচিত। কৃষি একসময় আমাদের জিডিপির ৮০% ছিলো। এখন তা নেমে এসেছে মাত্র ২৩-২৪%-এ। কৃষিতে

আর নতুন কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগও নেই।

নৌ-পরিবহণ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা পরিবহন। একটি পণ্য নৌপথে পরিবহণে যা লাগে, রেলপথে লাগে এর তিনগুণ আর সড়কপথে ছয়গুণ। ১০০ বছর আগে আমাদের দেশে ৩০,০০০ মাইল নৌপথ ছিলো। এখন সেটা কমে হয়েছে মাত্র ১০,০০০ মাইল। এর মূল কারণ স্রেফ যত্নের অভাব।

মোঘল, সুলতানী বা হিন্দু শাসনামলের ইতিহাসে আমরা দেখি, সে সময় গ্রামভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ছিলো। নিয়মিত নদী পুনঃখনন করা হতো, গ্রামের পঞ্চায়েতের অধীনে অষ্টপ্রহরীরা পালা করে পাহারা দিতেন নদী অবকাঠামোকে, 'গ্রাম সরঞ্জামী' নামে একদল পেশাজীবীই ছিলেন যারা পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ করতেন।

কিন্তু গত ১০০ বছরে ক্রমাগত অযত্ন, অবহেলা আর অব্যবস্থাপনার ফলে সেই জলপথ আমরা হারিয়েছি। এমনকি দাতারাও জলপথ ব্যবস্থাপনাকে নিরুৎসাহিত করেছে–সড়কপথের উন্নয়নের জন্যে কাড়ি কাড়ি অর্থ ঢেলে। আর এর পেছনে কাজ করেছে তাদের কায়েমী স্বার্থ। কারণ সড়কপথের উন্নয়ন মানেই তাদের প্রস্তুতকৃত গাড়ি, জ্বালানী তেল বিক্রির সুযোগ। আর গাড়ি মানেই পার্টস বিক্রি করে বিপুল অংকের মুনাফা হাতিয়ে নেয়া। তাদের এই চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে আমরা এখন পাথরের মতো পণ্যও পরিবহন করছি সড়ক পথে।

নদীভাঙন ভূমিধস বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস–এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আবহমানকাল ধরেই কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গী। প্রশ্ন হলো, এখন এত ক্ষয়ক্ষতি হয় কেন? কারণ এগুলোর প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃক্ষকে আমরা ধ্বংস করেছি। সুন্দরবন থেকে ভোলা পর্যন্ত আমাদের ছিলো বিস্তৃত কোস্টাল গ্রিনবেল্ট। আমরাই তা নষ্ট করেছি। কলাপাড়া, বরগুনা অঞ্চলে কয়েক বছর আগেও দেখেছি, গ্রামের লোকজন মাটির নিচে লোহার রড ঢুকিয়ে সুন্দরী গাছের গুঁড়ি টানছে। আমরা হিসেব করে দেখেছি, যদি দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত একটা গ্রিনবেল্ট তৈরি করা যায় তাহলে জলোচ্ছ্বাসের শক্তিটাকে সে ঠেকাতে পারে।

পানিকে একটি সমন্বিত বা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার প্রবণতা আমাদের নেই। আমরা মনে করি, পানি শুধু কৃষির জন্যে। ৫০ বছর আগেও আমাদের ধান চাষ ছিলো ঋতুভিত্তিক–আবহাওয়া, বৃষ্টি আর মাটির বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে চমৎকার এক প্রাকৃতিক কৃষিকাজ।

একসময় এই বাংলায় ৪ হাজার প্রজাতির ধান হতো যার প্রতিটিই ছিলো

নিজস্ব রং, গন্ধ আর বৈশিষ্ট্যে আলাদা। অথচ এখন চালের প্রকার বলতে চিনিগুঁড়া বা কাটারিভোগ জাতীয় দু'একটা নামই বার বার ঘুরে ফিরে আসে।

এ অবস্থাটা হলো '৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে উচ্চ ফলনশীল ধানের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যখন আমরা নির্বিচারে ধানের জমি বাড়ালাম, নদীতে বাঁধ দিলাম, বছরের পর বছর একই জমিতে শুধু ধানই চাষ করলাম। আর এভাবে আমরা আমাদের ইকো-সিস্টেমেরও বারোটা বাজিয়েছি। যদিও এটা করা হয়েছে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে। কিন্তু খাদ্য কি কেবল ভাত? প্রোটিনের উৎস মাছের জন্যে কি আমরা চিন্তা করেছি?

দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে, এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা প্রধানত দুটো। প্রথমত, আমরা এ সংক্রান্ত কিছু ধারণা, সমাধান বা প্রস্তাবনার ব্যাপারে এমন অনড় হয়ে বসে থাকি যে, সেখান থেকে আর নড়তে পারি না। দ্বিতীয়ত, পানিকে একটা সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে দেখার বদলে আমরা দেখি একটা খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত উপকরণ হিসেবে।

আরেকটি সমস্যা হলো, পানি সম্পদের ওপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকা। সারা বছরে বঙ্গোপসাগরে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তার ৯২%-ই আসে বাইরে থেকে, যার ওপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে যখন পানির দরকার নেই, তখন বেশি পানি পাই; আর যখন পানি দরকার হয় তখন মোটেই পাই না।

পানি নিয়ে ভারতের মতো একটি দেশ–যার ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে লক্ষণীয় সাযুজ্য–তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে আমাদের আরো নমনীয় এবং সমাধানের একাধিক পথের অনুসন্ধানী হতে হবে।

আমাদের এখন প্রয়োজন–পুরো হিস্যা পাওয়ার আগে দেশের ভেতর এখন যে পানি-সম্পদটুকু আছে, তার সুব্যবস্থাপনা। এরপর পর্যায়ক্রমে হিস্যা পাওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনা, কৌশল সবই বদলাতে পারে। অর্থাৎ কবে আমি পুরো চাহিদামাফিক পানি পাবো এবং তারপর পরিকল্পনা করবো–এ দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিশ্চয়তার চাইতে যা আছে তা দিয়ে শুরু করাটা আমার কাছে বেশি কার্যকরী ও বাস্তবভিত্তিক বলে মনে হয়। কারণ গোটা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে ক্ষতিটা কিন্তু আমাদেরই।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, আগস্ট ২০০৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

টেকসই উন্নয়ন ধারণার একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষনীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি এ ভাষণ দেন।

পরিবর্তনের জন্যে চাই একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

'দেশের অবস্থা কী'–এ প্রশ্নের উত্তরে এক রিকশাচালক বলছিলেন, "আর বইলেন না ভাই, খুব খারাপ অবস্থা, রাজনীতির মধ্যেও পলিটিক্স ঢুইকা গেছে।" কথাটার অর্থ হয়তো ভুল কিন্তু এর আবেদনটা দেশের সাধারণ জনগণ সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। কী সমাজনীতি, কী অর্থনীতি–সবই এই পলিটিক্সে জর্জরিত।

রাজনৈতিক দলগুলোর একটা প্রচলিত স্লোগান হচ্ছে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। অথচ জনগণ আসলে কী চায় তা না জেনেই তারা বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে যান। তারা অধিকাংশ সময়ই থাকেন বাঁশের বেড়া দেয়া পৃথক মঞ্চে, জনতার কাছাকাছি আসতে পারেন না। জনগণের চাওয়াও তাই তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না।

সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের এসব কথাকে সবার সামনে তুলে ধরতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আমরা একটি উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত সব এলাকায় আমরা যাচ্ছি। সেখানকার কৃষক শ্রমিক রিকশাচালক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সাধারণ

মানুষের কথা শুনছি, তাদের চাওয়াগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করছি। এগুলোর আলোকে আমরা তৈরি করবো আমাদের প্রস্তাবনা।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে আমরা পরিণত হয়েছি বিভিন্ন বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর ক্রীড়নকে। অথচ যে সম্মান আমরা তাদের দিই তার কানাকড়িও আমরা দিই না আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের, যাদের উপার্জনের ৪৫০ কোটি ডলার আমরা পেয়েছি গত অর্থ-বছরে, যা জাতীয় আয়ের ৭.৫%। যদিও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এই বিপুল পরিমাণ অর্থকেও আমরা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করতে পারি নি।

যদি আমরা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চাই তাহলে বিনিয়োগ করতে হবে। এটা হতে পারে দেশি অথবা বিদেশি। জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ বিনিয়োগ করে আমরা প্রবৃদ্ধি পাই ৫.৩%। অথচ অর্থনীতিবিদদের মতে, আমাদের পাওয়া উচিত ৮.৫%। এর কারণ অনেকগুলো, হয় তথ্য ভুল অথবা তথ্য ঠিক আছে কিন্তু চুরি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অদক্ষতা হতে পারে, হতে পারে বিনিয়োগের যথাযথ ক্ষেত্রের অভাব।

বিদেশি বিনিয়োগ শুনলেই আমরা কেউ কেউ খুব উল্লসিত হয়ে উঠি। কিন্তু টেলিকমিউনিকেশন বা মোবাইল ফোনের মতো খাতে সামান্য বিনিয়োগ করে রাতারাতি কাঁড়ি কাঁড়ি মুনাফা বিদেশি কোম্পানি হাতিয়ে নিলে দেশের কোনো লাভ হয় না।

বিনিয়োগের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো শক্তি-সম্পদের পর্যাপ্ততা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট নয়। এছাড়া গ্যাস যে হারে ব্যবহার হচ্ছে তা বজায় থাকলে আগামী ১৫ বছর পর আমাদের গ্যাস-ভান্ডার হবে শূন্য। তারপর কী হবে কেউ জানি না। কারণ একটাই—তাৎক্ষণিকতাদুষ্ট ব্যবস্থাপনা।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্বের ওপর চালাচ্ছে নিরন্তর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তৃতীয় বিশ্বকে একের পর এক বিভিন্নরকম প্রকল্পে মাতিয়ে রাখাটাই হলো আন্তর্জাতিক বিশ্বের অন্যতম কূটনীতি। যেমন, গত শতাব্দির ৭০-এর দশকে শুরু হলো বাজার অর্থনীতি। '৭২-এ বলা হলো অর্থ নয়, পরিবেশই সব। '৮০-তে তাদের মুখে শোনা গেল, যা কিছু পারো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে রেখে যাও। '৯২-এ এলো টেকসই উন্নয়নের ধারণা। '৯৫-এ ২০:২০ কনট্রাক্ট। জাতীয় বাজেট থেকে ২০% রাখা হলো

সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে।

এদিকে ২০০০ সালে প্রকল্পের মাত্রা গেল বদলে, দারিদ্র প্রাধান্য পেলো। বাংলাদেশের উন্নতি হচ্ছে না–কথাটা ঠিক নয়। উন্নতি হচ্ছে কিন্তু তার ফল চলে যাচ্ছে মাত্র কয়েকজনের পকেটে। সরকারি একটি হিসেবে দেখা যায়, '৯১-'৯২ সালে আমাদের দেশে সবচেয়ে দরিদ্রের তুলনায় সবচেয়ে ধনীর আয় ছিলো ১৮ গুণ বেশি।

মাত্র ৫ বছর পর '৯৫-'৯৬-এ সেই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ গুণ। ২০০০-এ ৪৬ গুণ এবং ২০০৫-এ এসে হলো ৮৪ গুণ। কী অবিশ্বাস্য পরিমাণ বৈষম্য নিয়ে চলছে আমাদের সমাজ।

এমন একটা সময় ছিলো যখন কেউ যদি সুদ-ঘুষ খেতো, লোকজন তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতো। আর এখন কে অনেক টাকার মালিক–এটাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। টাকার উৎসটা বৈধ না অবৈধ সেটা কোনো ব্যাপার নয়। যদি আপনি ঘুষ না খান তাহলে অফিসের সবাই মনে করবে আপনি গোলমেলে লোক, আপনাকে সরাতে হবে–এটাই আজকের বাস্তবতা।

এ বাস্তবতা বদলানোর জন্যে দরকার লক্ষ্য। বাংলাদেশে আমরা কোনোদিন কোনো লক্ষ্য স্থির করি নি। ঠিক করি নি যে, আজ থেকে ২০/২৫/৩০ বছর পর আমরা কোথায় যেতে চাই।

আমরা যদি আজ থেকে ২০ বছর পর এমন একটা সমাজ চাই যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, সবার জন্যে থাকবে সমান সুযোগ। অজ-পাড়াগাঁয়ের একজন ছেলেও যদি বিজ্ঞানী হতে চায় বা কৃষিবিদ হতে চায়–সেই সুযোগ সে পাবে। অর্থনীতি হবে সজীব ও সচল এবং রাজনীতি হবে অংশীদারিত্বমূলক গণতান্ত্রিক। তাহলে আমাদের সবার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকবে সে লক্ষ্যে পৌঁছার।

এখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কয়টি পথের কথা বলা যায়, তার অন্যতম হলো শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। আমাদের শিক্ষার মান খুবই নিচু। শিক্ষার প্রধান যে দুটো দিক–নৈতিকতা এবং দক্ষতা–এ দুটোরই প্রকট অভাব আমাদের শিক্ষায়।

এছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাথাপিছু বার্ষিক ৩৬ ডলার খরচ করলে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে আমাদের মাথাপিছু গড় ব্যয় মাত্র ৪ ডলার।

এতসব নেতিবাচক বাস্তবতার মধ্যেও এখন আমাদেরকেই হাল ধরতে হবে। পরিবর্তনের আন্দোলনের সূচনা করতে হবে। যে আন্দোলনের হাতিয়ার লাঠি-সোটা বা গুলি-বন্দুক নয়। সে আন্দোলনের হাতিয়ার হওয়া চাই নতুন চিন্তা, নতুন ধারণা এবং মানুষের পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসা। তাহলেই আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

অনুলিখন : নূরুল মুকতাদির বাপ্পী

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

উষ্ণ হৃদয় ও
ঠান্ডা মস্তিষ্কের
সম্মিলনেই
সাধারণ মানুষ
অনন্য মানুষে
রূপান্তরিত হয়।

জীবনের লক্ষ্যকে পরিষ্কার রাখুন।
সবসময় বিশ্বাস করুন–
বড় কিছু করার জন্যে
আপনি পৃথিবীতে এসেছেন।
বিশ্বাসের আলোকে
কর্মপন্থা রচনা করুন।
ঝর্নার গতিময়তায় কাজ করুন।
সাফল্য আপনার পদচুম্বন করবেই।

মরহুম অধ্যাপক ড. মাহমুদ-উল আমীন ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা ছাড়াও সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের ফেলো ও সচিব। ১৯৯৩ সলে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৭ম ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

অবিশ্বাসের অবকাশ আছে কি?

অধ্যাপক ড. মাহমুদ-উল আমীন

আমরা জানি বস্তুর বিনাশ নেই, শুধু তাদের অবস্থান্তর ঘটে অথবা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের সাধারণ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা–দেখে, শুনে, স্বাদ ও স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেই আমরা বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হই।

যার অবয়ব অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ আছে তা-ই বস্তু। একের পর একটি তল একত্রে সাজালে বেধ পাওয়া যায়। বস্তু ত্রিমাত্রিক আর তল দ্বিমাত্রিক। তলের শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, বেধ নেই। আবার অনেকগুলো রেখা পর পর রাখলেই একটি তল পাওয়া যায়। রেখার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার বা প্রস্থ নেই। তাই রেখা একমাত্রিক।

কিন্তু রেখা কী? একটি চলমান বিন্দুর পথক্রমকে রেখা বলে। অর্থাৎ বহু বিন্দুর সমষ্টি হচ্ছে রেখা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সকল বস্তুর গাঠনিক একক হচ্ছে বিন্দু। বিন্দুর সমষ্টি মিলিয়েই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ অর্থাৎ বস্তু গঠিত হয়। বিন্দুকে অনুভব করতে পারলেই বস্তুর অনুভূতি সত্য হবে। কিন্তু বিন্দু কী? জ্যামিতির সংজ্ঞায় বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, অবস্থান আছে।

যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিংবা বেধ নেই সে কেমন বস্তু? সংজ্ঞা অনুসারে সে তো

বস্তু নয়—অথচ তারই সমন্বয়ে বস্তু গঠিত। এখানে অনুভব স্পর্শ স্বাদ ইত্যাদি ছাড়াই বিশ্বাসকে ভিত্তি করতে হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বস্তুর অস্তিত্বের ভিত্তিও বিশ্বাস।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। প্রাথমিক জ্যামিতিতে আমরা পড়েছি যে, দুটি সমান্তরাল রেখা দুদিকে বাড়ালে এরা কখনো কাছে আসে না, একত্রে মিলিত হয় না এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সবসময় সমান থাকে। কিন্তু উচ্চতর গণিতে বলা হয় যে, সমান্তরাল রেখাগুলো অসীম বা 'ইনফিনিটি'তে মিলিত হয়।

অসীম বা ইনফিনিটি কী? এ-ও একটি ধারণা, স্বতঃসিদ্ধের মতো অর্থাৎ বিশ্বাসের ব্যাপার। তাহলে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে রয়েছে বিশ্বাসের ব্যাপার। অথচ সাধারণভাবে আমরা মনে করি যে, বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো ব্যাপার নেই। পরীক্ষা, মাপ-জোক করে, যাচাইয়ের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই। অথচ মূলে বিশ্বাস ছাড়া বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

ভৌত-রাসায়নিকভাবে বস্তুর একক অণু। আধুনিককালে অণু আরো ক্ষুদ্র অংশে, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিতে বিভাজ্য বলে প্রমাণিত। আবার এদেরও ক্ষুদ্রতর কণা Particles-এর কথা জানা যায়। এ সবের শেষে নাকি স্পন্দন। আমরা শক্তি বা Energy-এর যে ধারণা পাই, তা-ও কতগুলো তরঙ্গ বা স্পন্দন বা ছন্দ। শব্দ তাপ আলো বিদ্যুৎ—সবই কম্পন বা তরঙ্গ। বস্তুর মূলে তরঙ্গ, শক্তির মূলেও তরঙ্গ। তবে বস্তু ও শক্তি কোনো বিশেষ অবস্থাতে কি এক? একাকার?

মেডিটেশন বা ধ্যানে আমরা বিশ্বজগতের ধারণা পেয়েছি। কী অসীম এর বিস্তার! নক্ষত্ররাজির দূরত্ব আলোকবর্ষে প্রকাশ করতে হয়। সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য থেকে বিকিরিত আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছুতে আট মিনিট লাগে। কোনো বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হলেই আমরা তা দেখতে পাই, না হলে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। সুতরাং দিনে আমরা যা দেখি তার বিকিরণ শুরু হয় পৃথিবীর মতে ঐ সময় থেকে আট মিনিট আগে। তাহলে আমরা আট মিনিট অতীতের ঘটনা দেখি কি?

ব্যাপারটা কল্পনা করলে কেমন দাঁড়ায়! হেঁয়ালির মতো মনে হয় না কি? বর্তমান অতীত হয়ে যায়, বর্তমান আর বর্তমান থাকে না। আমরা যা বাস্তব বলে দেখি তা কখনকার বাস্তব? বস্তুজগতের অবস্থা যদি এই হয় তবে মনশ্চক্ষে অতীত বা ভবিষ্যৎ দর্শন করা কি অসম্ভব বা অযৌক্তিক হবে?

সুতরাং অতিচেতনা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

ষাটের দশকের কথা। আমি ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে ৩/৪ জন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং বেশ কজন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। সেখানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হতো। এরকম একটি সভায় একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বক্তৃতা করছিলেন। বক্তা এবং বক্তৃতার শিরোনাম আজ আর ঠিক মনে নেই। কিন্তু তার বক্তব্যের যে নির্যাস, সে কথা মনে আছে।

তিনি বলেছিলেন যে, ভৌত-বিজ্ঞানে সকল বিষয়ই সংখ্যা ও পরিমাপ দ্বারা মূল্যায়ন করেই তথ্য ও তত্ত্ব বিবৃত হয়। কিন্তু অসীম বিশ্বজগৎ বিষয়ে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এমন একটি পর্যায় উপস্থিত হয় যখন তা আর ভৌত-বিজ্ঞান অর্থাৎ Physical Sciences দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা Metaphysical পর্যায়ে চলে যায় এবং দর্শন শাস্ত্রের বিষয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ একটা অবস্থায় Physics আর Metaphysics-এর বিভেদ-রেখা টানা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে কথাটি সত্য। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় ভৌত অবস্থা অতিক্রম করে আধিভৌত বা Metaphysical পর্যায়ে চলে যায়।

প্রতিটি বস্তুতে শক্তি আছে। প্রচ্ছন্ন শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হলে অর্থাৎ কাজে লাগলে তা সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উন্মোচিত করাই যেকোনো ক্রিয়ার (কাজের) চালিকাশক্তি। মানুষের সকল শারীরবৃত্তীয় অর্থাৎ Physiological কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হয়।

এ শক্তির মুক্তি যে হারে হবে বিভিন্ন বিক্রিয়ার গতিও সেভাবে ওঠা-নামা করবে। এসব কাজের গতি স্বাভাবিক অবস্থায় তরঙ্গের মতো একটি মধ্যমা রেখার ওপরে ও নিচে ওঠানামা করবে। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেশি ওঠানামা করলে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মানুষের দেহেই আছে। স্নায়ুতন্ত্র এবং বিভিন্ন হরমোন এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করে।

সিম্প্যাথেটিক ও প্যারা-সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলিকে সাধারণত উদ্দীপ্ত এবং প্রশমিত করে। হরমোনগুলোর ক্ষরণও মস্তিষ্ক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ স্নায়ুতন্ত্র তথা স্নায়ুকোষ বা নিউরোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্নায়ু কাজ করে Charged আয়নের

দ্রুত সঞ্চারণের মাধ্যমে, যা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হিসেবে শনাক্ত করা যায় এবং মাপা যায়। এখানেও তরঙ্গ।

কোয়ান্টাম মেথডেও মনোজগতের এই স্পন্দন বা তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে–আলফা বিটা গামা থিটা ডেল্টা। এদের নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি আমাদের মধ্যেই আছে। সাধনা বা মেডিটেশন দ্বারা এদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের ইচ্ছাধীন করার কৌশল কোয়ান্টাম মেথডে শেখানো হয়েছে। এর ভিত্তি বৈজ্ঞানিক, আয়ত্তকরণ চর্চা ও সাধনা সাপেক্ষ। এখানে সন্দিগ্ধ হবার অবকাশ দেখি না।

মহাজাতক কোয়ান্টাম মেথড দ্বারা যেসব কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন তা সকলের জন্যে কল্যাণকর। বহুজন এ থেকে উপকৃত হয়েছেন ও হবেন। এর চর্চা ও সাধনা দ্বারা আমরা সকলে প্রো-একটিভ হয়ে সমাজের জন্যে কল্যাণকর কাজ করে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করি, এই আমার কামনা।

[২০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

ভ্রান্ত বিশ্বাস কিংবা মুক্ত বিশ্বাস–
উভয়েরই রয়েছে সম্মোহনী শক্তি।
আপনি তথ্য বা ধারণার আলোকে
বার বার যা ব্যক্ত করেন
অবচেতন মন তা-ই বিশ্বাস করে
সম্মোহিত হয়।

সকল বিজ্ঞানের
সেরা বিজ্ঞান হলো
জীবনযাপনের
বিজ্ঞান।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী-পরিচালক এডভোকেট সালমা আলী। তার সাহসী ভূমিকার ফলেই দক্ষিণ-এশিয়ায় নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। একাধিক দেশি-বিদেশি আইন ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি বলেছেন নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, আইনি অধিকার ও নানা বিষয় নিয়ে। এডভোকেট সালমা আলী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭৩ ব্যাচে অংশ নেন।

নির্যাতিতাকে মানসিকভাবে পুনর্বাসিত করতে পারে কোয়ান্টাম

এডভোকেট সালমা আলী

আজ থেকে ২১ বছর আগে একটি পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করে মহিলা আইনজীবী সমিতি। সে সময় আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আইন পেশার সঙ্গে জড়িত মহিলাদের সংগঠিত করা, তাদের দক্ষতা বাড়ানো এবং পুরুষ সহকর্মীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যাতে পিছিয়ে না পড়েন, সেজন্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ।

সংগঠন করার পর আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষদের অনেকেই বিশেষত মহিলারা নির্যাতনের শিকার হয়ে আমাদের কাছে আসছেন সাহায্য ও পরামর্শ নিতে। চরম দারিদ্রপীড়িত বা অসহায়, বিপর্যস্ত এই নির্যাতিতাদের সাহায্য করার জন্যেই তখন আমরা শুরু করলাম আইনি সহায়তা দেয়ার কাজ।

এর মধ্যেই একটা জরিপের কাজে এক জেল পরিদর্শনে গিয়ে দেখলাম ভয়ংকর এক অবস্থা। নিরাপত্তা হেফাজতের নামে অপরাধী বন্দিদের সঙ্গে বছরের পর বছর বন্দি হয়ে আছে অপরাধের শিকার মানুষগুলোও, যাদের অধিকাংশই মহিলা। এমনকি একজন আসামী জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে সুযোগ-সুবিধা ও বরাদ্দ পাচ্ছে, এদের তা-ও নেই। তার ওপর আছে রক্ষক নামধারী ভক্ষকদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক।

বিষয়টা এত দাগ কাটলো যে, আমরা এদের জন্যে কাজ শুরু করলাম। দেখলাম শুধু দেশে নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন জেলখানায়ও প্রচুর বাংলাদেশি মেয়ে আটকে আছে। এদেরকে উদ্ধার করার পর যে সমস্যাটি সামনে এলো তা হলো এদেরকে কোথায় রাখা হবে। কারণ তাদের বেশির ভাগেরই পরিবারে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না। সরকার বা এনজিওগুলোর মধ্যেও এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। অফিসের ভেতরেই ৫ জন অসহায় নারীকে আশ্রয় দেয়ার মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করলাম মহিলা আইনজীবী সমিতির শেল্টার হোম 'প্রশান্তি'র কার্যক্রম।

এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও রয়েছে এর ব্যাপক পরিচিতি। তবে এখন আমরা বিভিন্ন এনজিও ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করি। ফলে দেশের কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যদি কোনো ঘটনা ঘটে আমরা ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে পারি স্থানীয় এনজিওগুলোর সহায়তায়। জেলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সহযোগিতায় 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' স্থাপন করেছি। এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীকে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আইনি সহায়তা ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে মানসিক সমর্থন দেয়া হয়।

আমাদের অবস্থান থেকে একটি মেয়েকে সাহায্য করা মানে তার পুরো দায়িত্ব নেয়া। এমনকি ভিকটিম নিজেই যখন মামলা করতে ভয় পায় বা দীর্ঘসূত্রিতায় হাঁপিয়ে ওঠে তখন আইনি সহায়তা দেয়াটাও কঠিন হয়ে যায়। তাকে দিনের পর দিন বোঝাতে হয়, ভরসা দিতে হয়, নিরাপত্তা দিতে হয়। এমনকি সাক্ষীকেও রাজি করাতে হয়, তার নিরাপত্তা বিধান করতে হয়। আবার কিছু বিশেষ পরিস্থিতি আসতে পারে। যেমন, পাচার থেকে উদ্ধার পাওয়া কাউকে দেশে ফিরিয়ে আনলেও মামলার প্রয়োজনে আবার বিদেশে পাঠাতে হতে পারে বা কেউ হয়তো মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তখন এ খরচও আমরাই বহন করি।

নির্যাতনের ব্যাপারে আমরা মনে করি, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ কার্যকরী। জন্ম নিবন্ধন আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন—এমন কয়েকটি আইন যা আমাদের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার প্রণয়ন করেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি, আইন থাকলেও আইনের বাস্তবায়ন আমাদের নেই। এজন্যে শুধু সরকার বা রাজনীতিকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ দায়িত্ব আমাদেরও।

আসলে আমরা যে অবস্থা থেকে একজন নির্যাতিতাকে উদ্ধার করি এটা কিন্তু তার নির্যাতনের ইতিহাসের দ্বিতীয় উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানের সূচনা

তার নিজের পরিবার, গোত্র বা সমাজ থেকেই। যেখানে সে হয়তো সৎ মা বা সৎ বাবার দ্বারা নির্যাতিত, আত্মীয়ের যৌন নিপীড়নের শিকার, বাল্য-বিয়ে বা স্বামীর অত্যাচার ও বহু-বিবাহের শিকার। এই অত্যাচার, বঞ্চনা থেকে বাঁচার জন্যে পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে সে সম্মুখীন হয় আরো বড় নির্যাতনের বা প্রতারণার। শহরে এসে বাসা-বাড়িতে বা গার্মেন্টসে কাজ করতে গিয়ে অথবা বস্তিতে, রাস্তাঘাটে প্রতি পদে পদে শিকার হয় বঞ্চনা, নির্যাতন আর যৌন হয়রানির–হয়তো পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যায় বা পাচার হয়ে যায়।

এ তো গেল নির্যাতনের একটি দিক, যা আমাদের কাছ পর্যন্ত আসে–কারণ তখন ভিকটিমের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আর ধামাচাপা দেয়ার উপায় নেই। কিন্তু নির্যাতনের একটা বড় অংশই থেকে যাচ্ছে পর্দার অন্তরালে। ভিকটিম তার নিজের ও পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে বা তার সন্তান ও সংসারের কথা ভেবে দিনের পর দিন নীরবে সয়ে যায় এ অত্যাচার। পারিবারিক সহিংসতার ক্রমবর্ধমান হারের কথা বিবেচনা করে এখন অবশ্য আমরা দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে একটি ডমেস্টিক ভায়োলেন্স ল'র কথা ভাবছি, সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কথা মাথায় রেখে যা প্রণীত হবে।

কিন্তু অনেক শক্ত আইন দিয়েও কোনো লাভ নেই যদি ভিকটিম বিচার প্রার্থনায় আগ্রহী না হন বা সেই আনুকূল্য না পান। ইভ টিজিং-এর বহু ঘটনা, থার্টি ফার্স্ট নাইটে হয়রানি বা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলোর বিচার যে কারণে এগোয় নি তা হলো–সামাজিক হয়রানির কথা ভেবে মেয়েরা সাহস পায় নি। নিউজিল্যান্ডের একজন মানবাধিকার কর্মী বছর কয়েক আগে মন্তব্য করছিলেন–'ডিমের ফাঁপা খোসার মতোই অবস্থা তোমাদের মেয়েদের। বাইরে সাজ-গোজ, হাসিখুশি চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও ভেতরে গুমরে মরছে শুধু কান্না আর অসহায়ত্বের দীর্ঘশ্বাস।'

অথচ কিছুদিন আগে দুবাই থেকে ফেরার পথে দেখছিলাম স্থানীয় পত্রিকায় একটি ছবি ছাপা হয়েছে–একটি মেয়ে বীরদর্পে একটি ছেলেকে ধরে আছে, যে কিছুক্ষণ আগে তাকে উত্যক্ত করছিলো। সে সময় আশেপাশে লোক জমে গেল, পুলিশ চলে এলো এবং সবার সামনে অপমানিত হয়ে ছেলেটিকে পুলিশের হাতে আটক হতে হলো। অর্থাৎ ব্যাপারটি হলো দৃষ্টিভঙ্গির–সামাজিকভাবে আমরা কাকে নিন্দনীয় মনে করছি, ধর্ষককে না ধর্ষিতাকে? এখন অবশ্য অধিকাংশ সংবাদপত্র নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের এ কোড অব কন্ডাক্টটি মেনে চলে–যৌন নির্যাতনের শিকার কোনো নারীর ছবি

বা নাম-ঠিকানা তারা ছাপে না। তারপরও যারা করছে তারা আসলে পত্রিকার কাটতি বাড়াবার উদ্দেশ্যে বা ক্ষুদ্র বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে অত্যন্ত অমানবিক এবং অনুচিত একটি কাজ করছে। যদি ছাপাতেই হয়, তাহলে ধর্ষকের ছবিই ছাপানো উচিত যাতে এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে পারে।

আমাদের সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়ার পেছনে নৈতিক অধঃপতন একটা কারণ, যার বড় উৎস হলো স্যাটেলাইট চ্যানেলের অবাধ জোয়ার। উচ্চবিত্ত তো বটেই মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরও নৈতিক-স্খলন এখন এমন পর্যায়ে যে, ২১ বছর আগে আমরা যখন কাজ শুরু করি সে সময়ের তুলনায় পরিস্থিতি এখন অনেক ভয়াবহ। এদিকেও আমাদের এখনই নজর দিতে হবে।

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে আমরা মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছি। আমাদের এ তৎপরতা আরো সফল হবে যদি মানবাধিকারের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা ও জনমত গড়ে ওঠে। আর এ কাজে একটি পরিপূরক ভূমিকা রাখতে পারে মেডিটেশন। কারণ নির্যাতিত হবার পর একজন মানুষ যে মানসিক বিপর্যয়, হতাশা এবং হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে, তখন মেডিটেশনই পারে তাকে সত্যিকারভাবে উজ্জীবিত করতে, আত্মবিশ্বাসী করতে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে।

আমার ধারণা ছিলো–নির্যাতনের শিকার কোনো মেয়ের অবস্থা হলো একটা দোমড়ানো সাদা কাগজের মতো, যাকে আর আগের মতো মসৃণ করা যায় না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমার সে ধারণা পাল্টে গেছে। এ কোর্স থেকে শেখা কৌশলগুলো কাজে লাগিয়ে বিপর্যস্ত নারীদেরকে মানসিকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। মেডিটেশনের মাধ্যমে একজন ভিকটিম পেতে পারেন বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার শক্তি ও সাহস। এক্ষেত্রে মেডিটেশনই হতে পারে খুব ভালো একটা কাউন্সেলিং।

নির্যাতিতা নারীদের মানসিক পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এ কোর্স থেকে উপকৃত হয়েছি। হাঁটু, কোমরের ব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে ঠিকমতো রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি। তাই আমাদের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত নারীদেরও কোয়ান্টাম মেথডের নানা প্রক্রিয়া শেখানো হবে, যাতে তারা সাদা একটা কাগজের মতো হয়ে সমাজ ও পরিবারে ফিরে যেতে পারে।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

আজিজ মেহের একাধারে লেখক, চলচ্চিত্রকার, প্রকাশক। বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তার 'নিষিদ্ধ কথকতা' ও 'আমি বিজয় দেখতে চাই' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। আজিজ মেহের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪র্থ ব্যাচে অংশ নেন।

আমি কেন?

আজিজ মেহের

আমি কেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম? এ প্রশ্নটা শুধু আমার পরিচিতদের নয়, বরং মনে মনে আমার নিজেকেও করি। এখনো। কেননা আমি কৈশোরকাল থেকেই বস্তুবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী। এই জীবনদর্শন আমি জেনে-বুঝেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছি। তবুও আমি কেন এখানে? জবাবটা যদিও খুবই কঠিন, তবু সরল আমার কাছে।

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনের রূপকার প্রবক্তা মহাজাতক আমার অনেক দিনের চেনা। যদিও খুব একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো না। কারণ, তাকে আমি ভিন্ন মেরুর বলে মনে করতাম।

একদিন এক বন্ধুর বাসায় দেখা তার সাথে–দীর্ঘ আলাপ হলো মেডিটেশন সম্পর্কে। প্রাঞ্জলভাবে উনি বুঝিয়ে দিলেন বিষয়টা কী এবং একদিন যোগ ফাউন্ডেশনে যেতে অনুরোধ করলেন। গেলাম। কয়েকজন সদস্য-সদস্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর তাদের মেডিটেশন কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং পায়োনিয়ার ব্যাচের সদস্যা নায়লাকে বললেন একটা কেস-স্টাডি করতে।

নায়লা যথারীতি মেডিটেশনে বসলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাকে আমার এক আত্মীয়ের নাম, ঠিকানা বললাম–

ধীরে ধীরে তিনি আমার সেই আত্মীয়ের বয়স, চেহারার বর্ণনা, কেমন কাপড় পরে আছেন, কি ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন–বলে চললেন। বিস্মিত হলাম! নায়লার বর্ণনার ৯০% মিলে গেল! কীভাবে এটা সম্ভব?

মহাজাতক তার চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বিষয়টা সম্পর্কে সংক্ষেপে আমাকে জানালেন। এটা কোনো আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক ব্যাপার নয়। বৈজ্ঞানিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা পদ্ধতি অনুসরণ করেই এটা সম্ভবপর বলে আমার বিশ্বাস হলো। এজন্যে অবশ্য পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত প্রাকটিস করতে হয়।

আমার আগ্রহ হলো পদ্ধতিটা শেখার। মহাজাতকের আমন্ত্রণক্রমে ১৯৯৩-এর এপ্রিলে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যোগ দিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই জানা-বোঝা হয়ে গেল এবং খুলে গেল এক নতুন জগতের স্বর্ণ-দুয়ার।

মানুষের দেহ এক জটিল ও বিচিত্র বস্তু। মস্তিষ্ক আরো জটিল এবং বিচিত্র আর প্রবল ক্ষমতার অধিকারী। সঠিক পদ্ধতিতে একে কাজে লাগাতে পারলে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করা যায়।

সেই সময়টাতে আমি শারীরিক, পারিবারিক ও আর্থিক কারণে খুবই হতাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলাম। প্রায়ই ভাবাবেগে আক্রান্ত হচ্ছিলাম এবং ভুল পথে চলছিলাম। কোর্স শেষ করার পর আমার সমস্ত হতাশা দূর হয়ে গেল। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। নতুন উদ্যমে যেন নতুন জীবন শুরু হলো। হারানো স্বাস্থ্যও ফিরে পেলাম। সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হলাম। এটা সম্ভব হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রশিক্ষণ নেয়ায়।

এরপর থেকে আমি নিয়মিত দিনে দু'বার মেডিটেশন করি এবং তার সুফল পাচ্ছি। এজন্যে আমি বিশেষভাবে মহাজাতকের কাছে কৃতজ্ঞ এবং নায়লা শামস-এর কাছেও, যিনি একজন সফল কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। ওর সাফল্যেই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

[শততম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

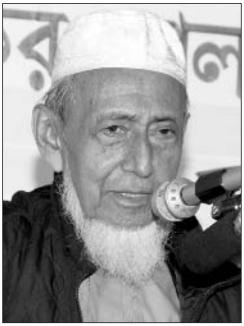

অধ্যাপক ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক একজন মৌলিক গবেষক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগটি মূলত তার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত এবং এ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তার লেখা 'দি হিস্ট্রি অফ ফরায়েজি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' বইটি ইতিহাস-পাঠকদের কাছে বহুল সমাদৃত। ড. মুঈনুদ্দীন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৩৫ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন।

তরুণদের মধ্যে নৈতিক পুনর্জাগরণ ঘটাবে কোয়ান্টাম

অধ্যাপক ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই শরীরচর্চা, প্রতিদিন ভোরে ৪ মাইল হাঁটা ও আধা মাইল দৌড়ানো আমার নিয়মিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কিছু শারীরিক সমস্যা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিলো।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমি এসব অসুস্থতার কথা সত্যিই ভুলে গেছি। আমার ৮০ ভাগ অসুস্থতা যেন ৪ দিনেই সেরে গেছে। আমার এ সুস্থতা কোয়ান্টামের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনন্য উপহার।

আমি দেখেছি, কোয়ান্টামের নীতি ও শিক্ষাগুলোর উৎস মূলত কোরআন ও হাদীস। কোয়ান্টাম কোর্সটি শুরুই হয়েছে বোখারী-শরীফের প্রথম হাদীস দিয়ে–'ইন্নামাল আমালা বিন নিয়তে।' অর্থাৎ নিয়ত অনুসারেই কর্মফল।

কোয়ান্টামে বলা হচ্ছে, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন–এটিও মূলত কোরআনেরই শিক্ষা। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে যোগ-সাধনার প্রায়োগিক বিষয়গুলো। ফলে এখানে এসে বিভিন্ন শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতাগুলো মানুষ খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারছে। এসব কারণে

কোয়ান্টাম আমার মধ্যে একটি নতুন চিন্তা ও ভাবধারার জন্ম দিয়েছে যা আমি আমার পরিচিতমণ্ডলেও বলেছি।

অলসতা পরিশ্রমহীনতা বিলাসিতা যান্ত্রিক জীবনযাপন–এসব নানা কারণে মানুষের শারীরিক-মানসিক দুর্ভোগ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বেড়েছে হতাশার পরিমাণ। পাশ্চাত্যে দেখা গেছে, শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি মানুষ বিষণ্ণতা ও হতাশাসহ বিভিন্নরকম মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত। দীর্ঘ গবেষণার পর তারা যেটিকে এর কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছে তা হলো 'ডিজায়ার' বা আসক্তি।

একসময় তারা বলেছিলো, আসক্তিকে চাপা দিলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে আর আসক্তি অনুসারে কাজ করলেই মানুষ সুস্থ থাকে। অথচ এই আসক্তিই কিন্তু মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে যদি এর মুখে লাগাম না থাকে। আর এই লাগামটাই হলো বিবেক।

পাশ্চাত্যে 'বিবেক'-এর কোনো ধারণাই নেই। 'বিবেক' শব্দটাই সেখানে নেই। গ্রিকদের মধ্যেও এটি ছিলো না। একসময় তাত্ত্বিকভাবে সেখানে এ শব্দটির প্রচলন ঘটলেও, পরবর্তীতে মডার্নিজম এসে এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। সেই থেকে পাশ্চাত্য সমাজ এখন পুরোপুরি আসক্তির মধ্যে ডুবে গেছে। ওখানে শুরু হয়েছে এক সর্বগ্রাসী নৈতিক অবক্ষয়ের যুগ। বেড়ে গেছে অনৈতিকতা আর প্রতারণা।

কোরআনে বলা হয়েছে, নফ্স মানুষকে মন্দের দিকে পরিচালিত করে। পাশ্চাত্য এখন সেই মন্দের পথেই চলছে। এ কারণে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি অপরাধ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে পাশ্চাত্যেই।

একটা সময় ছিলো যখন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান নির্বিশেষে প্রত্যেকের মধ্যেই ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতাবোধ প্রবল ছিলো। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই সর্বগ্রাসী অনৈতিকতার দরুণ আমরা আজ এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে চলছে স্বার্থপরতার রাজত্ব। নিজের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ আর জাতীয় স্বার্থকে আন্তর্জাতিক স্বার্থ প্রমাণের নেশায় সবাই আজ মরিয়া।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম–যারা আজ জীবনের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে–তাদেরকে নৈতিকতার পথে নিয়ে আসতে হবে।

সকল নৈতিকতাই মূলত ধর্মীয় চেতনা থেকে উৎসারিত। কোনো নৈতিকতাই আসলে ধর্ম ও ধর্মীয়বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আর মানব অস্তিত্বের সারবত্তা হলো বিবেক এবং যা বিবেকের নীতি অনুসরণ করে সেটাই

ধর্ম। অন্যদিকে যা বিবেকের নীতি অনুসরণ করে না তা আসলে ধর্ম নয়।

আর সব ধর্মের উৎস ও মূল শিক্ষা এক। শুধু কালের আবর্তনে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। একটু সূক্ষ্মভাবে বোঝার চেষ্টা করলেই বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ।

মানুষকে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার দিকে ফিরিয়ে আনার কাজটি কোয়ান্টামের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে সম্ভব হবে বলে আমার ধারণা। কোয়ান্টাম হলো আধুনিক বিজ্ঞান, যোগশাস্ত্র ও ইসলামের তাসাউফ–এই তিনের এক অনন্য সমন্বয়, যেমনটি আগে কখনো দেখা যায় নি।

এ অভূতপূর্ব সমন্বয়ের কাজটি এমন সুনিপুণ দক্ষতার সাথে করা হয়েছে যে, কোনো জোড়াতালি তো নয়ই, বরং এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মৌলিক চেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এখন নিজের শক্তিতেই ক্রমশ বিস্তৃত ও বিকশিত হবে।

কোয়ান্টামের সম্ভাবনা অসীম এবং আমার বিশ্বাস–কোয়ান্টাম থেকে একটি নৈতিক পুনর্জাগরণের সূচনা ঘটবে। কারণ আত্মা জাগলে মানবিকতা জাগে। আর কোয়ান্টামের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এই বার্তাটিই পৌঁছে যাচ্ছে যে, আধুনিকতাকে বাধাগ্রস্ত না করেও তুমি ধর্মীয় অনুশাসন পালন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারো। মূলত এ কারণেই এটি আধুনিক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সত্যিকার অর্থেই আমরা এখন একটি যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। একটি পুনর্জাগরণ ও পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। কারণ এর পেছনের মূল চালিকাশক্তি হলো অস্ত্র। ইমপেরিয়ালিজম, কলোনিয়ালিজম-এর যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও মূলত সেই পথেই এগুচ্ছে।

পাশ্চাত্য এখন মনে করছে–অস্ত্র দিয়ে না পারলেও, ব্যবসা অর্থাৎ অর্থনীতি দিয়ে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখতে পারবে এবং এ কারণেই ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যে তারা কখনো ২০ জাতি, কখনো ৮ জাতি একত্রিত হচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও বিশ্বজুড়ে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। তাই এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একটা পরিবর্তন আসন্ন।

নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি যে, অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। ৮৫ বছরের এক দীর্ঘ জীবন আমি কাটিয়ে এসেছি। যদিও আমি বয়স নিয়ে মোটেও চিন্তা করি না, বরং কর্মতৎপর থাকার জন্যে পড়াশোনা আর

গবেষণার চিন্তাই বেশি করি এবং এসবে নিমগ্ন থাকি, কাজ করি। তাই এতটা সময় যে পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারি নি।

আর 'বয়স' ব্যাপারটা আসলে আপেক্ষিক। আমি যদি মনে করি যে, বয়স হয়ে গেছে তাহলে আমি আর এগুতে পারবো না, কাজ করতে পারবো না। তাই বয়স কত হলো–এ নিয়ে আমি ভাবি না। আজও আমাকে হিসেব করে আমার বয়স বলতে হয়। আসলে বয়স কিছু নয়, বরং কাজ আর কর্মস্পৃহাটাই জীবনের মূল শক্তি। কোয়ান্টামও তো মানুষকে এ শিক্ষাটাই দিচ্ছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, নভেম্বর ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

চাওয়া যখন
মাত্রা ছাড়িয়ে যায়
তখন সেটা আসক্তি।
দুঃখের প্রধান কারণ
এই আসক্তি।

কোনো চেতনা, ধর্ম বা
সংস্কৃতি জয়ী হয় তার
অন্তর্নিহিত কল্যাণকামিতা,
মমতা, উদারতা ও
আলোকময়তা দ্বারা;
অস্ত্র বা চাপের মুখে নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, সংস্কৃত ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রবীণ অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল একজন স্বনামধন্য গবেষক ও ধর্মবেত্তা। বিটিভির 'পবিত্র গীতাপাঠ' অনুষ্ঠানের সবচেয়ে সফল উপস্থাপক। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১০৭ ব্যাচে অংশ নেন।

কোয়ান্টাম মেথডের সার্বজনীনতা

আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

ছাত্রজীবন থেকেই সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ শ্রী গীতার প্রতি আকৃষ্ট হই। এ গ্রন্থের মহান বাণী তখন আমাকে আলোড়িত করেছে, কৌতূহল বাড়িয়েছে। শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ করে এ কৌতূহল আরো বাড়তে থাকে।

একসময় কোয়ান্টাম মেথডের নাম শুনে ভাবলাম, গিয়ে দেখি কী হয়। জানার আগ্রহে মুক্ত মন নিয়ে কোর্সে অংশগ্রহণ করলাম এবং খুঁজে পেলাম দীর্ঘদিনের কৌতূহল মেটানোর পন্থা। ভারতীয় দর্শনে 'যোগ' এর কথা বার বার এসেছে। সে তত্ত্বকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় আনার সুযোগ পেলাম এতে।

কোয়ান্টাম মেথড নামকরণের মধ্যেই এর বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন যুগের চিরায়ত যোগসাধনা ও বিজ্ঞানের এক চমৎকার সংমিশ্রণের ফলে কোয়ান্টাম এখন আধুনিক মানুষের জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে সনাতন ধর্মের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে যতটা জেনেছি সে আলোকে বলা যায়, ধর্মীয় বাণী ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পর সম্পূরক।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

"তপসিদ্ধের চেয়ে যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি জ্ঞানীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কর্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহা আমার অভিমত, অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও"।

সনাতন ধর্মের প্রেক্ষিতে যোগসাধনা একটি প্রাচীন সাধন পদ্ধতি, যা শ্লোক থেকেই বোঝা যায়। আজ ১৯ বছর ধরে কোয়ান্টাম মেথড মানুষকে যে শিক্ষা দিয়ে আসছে তা এ চিরায়ত যোগসাধনা ও আধুনিক বিজ্ঞানের সংমিশ্রণেরই এক চমৎকার ফসল।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৮টি অধ্যায়কে ১৮টি যোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে। শুরু বিষাদযোগ দিয়ে, শেষ হয়েছে মোক্ষযোগ দিয়ে। যোগের অর্থ হলো পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সংযোগ। কারণ, মানুষ যখন শুধু দেহকে নিয়ে ভাবে, এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, তখনই দেখা দেয় অস্থিরতা, অশান্তি।

অর্জুনের বিষাদযোগ শুরু হয়েছিলো কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে যখন সে দেখলো, তার আত্মীয়-পরিজন অস্ত্র হাতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, তখন দেহকে নিয়েই তার চিন্তা আবর্তিত হয়েছিলো। সে ভাবলো, অস্ত্রপাত হলে হয় সে মরবে, নয়তো তারা মরবে।

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, হে অর্জুন! তুমি দেহ নিয়ে ভাবছো কেন? দেহ তো নশ্বর। আজ হোক, কাল হোক–এর মৃত্যু হবেই। কিন্তু যার মৃত্যু নেই তা হলো আত্মা।

যোগসাধনা দেহের এ গণ্ডিবদ্ধ চিন্তার বাইরে নিয়ে এসে মানুষকে তার অন্তর্গত শক্তি খোঁজার প্রেরণা যোগায়। সেই প্রেরণায় মানুষ প্রশান্ত হয়, মুক্তি পায় অশান্তি থেকে। যুগে যুগে, কালে কালে মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষকে এই প্রশান্তির পথই দেখিয়েছেন।

যোগসাধনা মানবদেহের স্তরে স্তরে নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সাধনা। এ সাধনার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মনের স্থিরতা লাভের জন্যে দেহকে শিথিলায়নের আশ্রয় নিতে হয়।

দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রেখে মনকে স্থির করতে শিথিলায়নের এ প্রক্রিয়া অসাধারণ। ধীরে ধীরে যখন স্থিরতা ধরা দিতে থাকে মনও তখন ধাপগুলো অতিক্রমের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে; একপর্যায়ে অপার আনন্দের ভুবনে প্রবেশ করে।

বস্তুজগতের উপভোগের উপকরণ দিয়ে মানুষকে বেশি সময় ধরে রাখা সম্ভব হয় না; আর প্রশান্তি তো দূরের কথা। তাই তো একজন শারীরিক কিংবা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংসার-জ্বালায় অতিষ্ঠ ব্যক্তি একটু স্বস্তি,

একটু প্রশান্তির অন্বেষায় ঘুরে বেড়ায়।

বিজ্ঞানের উপকরণ আমরা গ্রহণ করছি, কিন্তু যোগশাস্ত্র এর সঙ্গে সঙ্গে মনের গতিবিধিকে আরো সুসংহত করার কথাই বলে। কোয়ান্টাম মেথড এই বিষয়টিই সমাজের সামনে তুলে ধরছে ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত পন্থায়, যা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে।

ছাত্র শিক্ষক সমাজসেবী বিজ্ঞানী ব্যবসায়ী চিকিৎসক অর্থনীতিবিদ কবি বা সাহিত্যিক–যিনিই হোন না কেন, মন নিয়েই তো তার যাবতীয় কারবার। তাই মনকে যদি প্রশান্ত রাখতে পারেন তাহলে তার নিজস্ব কাজেও সফলতা আসবে। ১৯ বছর ধরে বহুজনের সাফল্যের মধ্য দিয়ে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাচ্ছি।

যোগসাধনায় আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পরমতত্ত্বে উন্নীত হওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে–শুধু আত্মমুক্তির জন্যে সচেষ্ট হলেই হবে না; সমাজ-জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এর রূপ দিতে হবে। কোয়ান্টাম চেতনার সুরও একই। আত্মশুদ্ধি ও সৃষ্টির সেবা–এ দুই ধারায় সমানভাবে প্রবাহিত কোয়ান্টামের কর্ম-পরিকল্পনা।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে সৎ, চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা এবং জগতের কল্যাণে, অপরের হিতে কাজ করা–কোয়ান্টাম এ বাণীতেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

তবে সঙ্ঘবদ্ধতা ছাড়া একার সাধনায় সব হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একা মুক্তি পাওয়ার কথা ভাবেন নি। সিদ্ধিলাভের পর মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে তিনি মানুষদের ডেকেছেন, “ওরে তোরা কোথায় আছিস, আয় আয় ছুটে আয়। তোদের আমি কথাটা বলবো।”

যারা ভক্তিপথে আরাধনা করে তাদের প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন, আমার ভক্তরা একে অপরের সাথে মিলে ভগবতলীলা, বিশ্বাস, গুণাবলি আলোচনা করে আনন্দ অনুভব করে। কোয়ান্টামেও এই সমবেত প্রচেষ্টার কথা বলা হয়। যৌথ মেডিটেশন সমবেত সাধনা বা সমবেত প্রার্থনারই রূপ। সঙ্ঘবদ্ধ এই সাধনা পরম বলয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্যে এক শক্তিমান বলয়।

তাই কোয়ান্টাম মেথডের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের এক পরম পাওয়া। ছাত্রজীবন থেকেই গীতা-পাঠ আমার নিত্যদিনের অভ্যাস। সেখানে দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্বের বাণীগুলো আমি বার বার পড়েছি। শিক্ষকতা-জীবনে অষ্টাঙ্গ যোগের স্তরগুলো ছাত্রদের পড়িয়েছি। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতা বা চর্চার উপলব্ধিটি আমি পাই নি।

কোয়ান্টামে এসে চর্চার মাধ্যমে যোগের স্তরগুলো বিকাশের পথ আমার সামনে খুলে গেল। এখন আমার ছাত্রদের একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারছি যে, তুমি যদি এ পথে এভাবে অগ্রসর হও তবে পরমপথের সন্ধানে নিজেকে উজ্জীবিত রাখতে পারবে। ভালো লাগছে এই ভেবে যে, পুরাতন কথাকে নতুন করে জেনেছি যা এক অপূর্ব পাওয়া।

এ তো গেল ঈশ্বরপথে সাধনবাদীদের কথা। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়, নিরেট বস্তুবাদী তারাও শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের কার্যকারিতা স্বীকার করে। সৃষ্টিশীলতার জন্যে, মনোসংযোগের জন্যে কিংবা সুনিদ্রার জন্যে তারা শিথিলায়ন চর্চা করে। এটাই প্রমাণ করে এর গ্রহণযোগ্যতা। আর যিনি যে ধর্মের পথে আছেন, মেডিটেশনের মাধ্যমে তার সেই ধর্ম পালন আরো সুন্দর হবে, সহজ হবে।

আমি দেখেছি, রুগ্ণ অবস্থায় কাল কাটিয়েছেন, কোথাও আরোগ্য পান নি, কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে আরোগ্য লাভ করেছেন—এমন মানুষ ভুরি ভুরি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষ আসছেন আত্মিক প্রেরণার জন্যে কিংবা জৈবিক, বৈষয়িক লাঞ্ছনা, দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের প্রত্যাশায়।

যিনি যে উদ্দেশ্য নিয়েই আসুন না কেন কোয়ান্টাম তাকে সেভাবেই সাফল্যের পথ বাতলে দিচ্ছে। এতেই বোঝা যায়, কোয়ান্টাম সার্বজনীনতার রসে সিক্ত। আমি ভাগ্যবান এজন্যে যে, আমি সার্বজনীন এ প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞের শুধুমাত্র একজন দর্শক নই; প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীও বটে।

[২০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

জীবনকে আনন্দময় করার জন্যে
অনেক বস্তু নয়,
প্রয়োজন সঠিক জীবনদৃষ্টি।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পবিত্র গীতা কণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন।

ধ্যান ॥ সমাধির পথ

স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনটাকে আমরা বলতে পারি যে, ধর্মের একটা গবেষণাগার। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মমত অভ্যাস করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মসমূহের পথ ভিন্ন হলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ। তার ভাষায়–'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ ধর্মীয় মত ও পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক।

ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৩৬ সালে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পরিচিত ছিলেন গদাই নামে।

গদাধর তাঁর গ্রামবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অঙ্কন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণে তাঁর ছিলো সহজাত দক্ষতা। যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিলো না। সে যুগে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাকে তিনি "চালকলা–বাঁধা বিদ্যা" (অর্থাৎ পুরোহিতের জীবিকা উপার্জনী শিক্ষা) বলে উপহাস করেন এবং তা গ্রহণে অস্বীকার করেন।

তবে নতুন কিছু শিখতে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিলো না। গানবাজনা, কথকতা ও ধর্মীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যাত্রাভিনয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ও গ্রাম্য পুরাণ-কথকদের কথকতা শুনে

অতি অল্প বয়সেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন গদাধর।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ৬/৭ বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তা দেখা দিত। পিতৃবিয়োগের পর তাঁর অগ্রজ রামকুমার পরিবারের ভার গ্রহণ করেন এবং পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করেন। দাদাকে পৌরোহিত্যে সহায়তা করার মানসে গদাধর কলকাতায় পদার্পণ করেন।

১৮৫৫ সালে কলকাতার নিম্নবর্ণের কৈবর্ত্য সমাজের এক ধনী জমিদারপত্নী রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করলে রামকুমার সে মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ সালে রামকুমারের মৃত্যু হলে গদাধর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মন্দিরে উত্তর-পশ্চিম আঙিনায় তাঁকে একটি ছোট ঘর দেয়া হয়। এ ঘরেই তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর অবশিষ্ট জীবন।

রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা বৃদ্ধি পায়। তাঁর ১২ বছরের তপস্যা জীবনে তিনি দুজন গুরুর দীক্ষালাভ করেন। তারা হলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী। ভৈরবী তাকে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং তোতাপুরী শিক্ষা দেন বৈদান্তিক সাধনা সম্পর্কে। দীক্ষালাভের পর তাঁর নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। একইসঙ্গে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

তিনি প্রথাগত সন্ন্যাসীদের সাথে একমত ছিলেন না বা তাদের মতো পোশাকও পরতেন না। ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান দূর করার জন্যে তিনি নিম্নবর্ণীয়দের হাতে খাদ্যগ্রহণ, অন্ত্যজ পারিয়াদের (চাকর ও ঝাড়ুদার) সেবা করতে থাকেন।

লোকশিক্ষক হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। গ্রামবাংলায় ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে দেয়া তাঁর উপদেশাবলি জনমানসে বিস্তার করেছিলো ব্যাপক প্রভাব। ঈশ্বর-উপলব্ধিই তিনি মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে মনে করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, কাম ও অর্থই মানুষকে ঈশ্বরের পথ হতে বিচ্যুত করে; তাই ‘কাম-কাঞ্চন’ বা ‘কামিনী-কাঞ্চন’ ত্যাগের পথই তাঁর কাছে ছিলো ঈশ্বরের পথ। জগৎকে তিনি ‘মায়া’ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, জগতের অন্ধকার শক্তি ‘অবিদ্যা-মায়া’ (অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ) মানুষকে

বন্ধনে ফেলে আর বিদ্যা-মায়া (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক গুণাবলি, জ্ঞান, দয়া, শুদ্ধতা, প্রেম, ভক্তি) মানুষকে চৈতন্যের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যায়।

'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা'–তাঁর এ উপদেশ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের পাথেয় হয়েছিলো। রামকৃষ্ণ একদল অনুগামী শিষ্যকে সংগঠিত করেন, যারা ১৮৮৬ সালে তাঁর প্রয়াণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এঁদেরই নেতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যের সম্মুখে উপনীত করেন। বিবেকানন্দ যে বিশ্বমানবতাবাদের বার্তা প্রেরণ করেন তা সর্বত্র সমাদৃত হয় এবং তিনিও সকল সমাজের সমর্থন অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু দর্শনের সর্বজনীন সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এরপর প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত সোসাইটি এবং ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরভাবনা বা ধ্যানের মধ্য দিয়েই সমাধির স্তরে যাওয়ার কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি এ-ও বলেছেন–শুধু চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেই ধ্যান হয় না, যদি না যাবতীয় লোভ-কামনা-বাসনা ও শত্রুভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করা না যায়। পুনঃ পুনঃ চেষ্টার মধ্য দিয়ে এ অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে।

আবার তিনি বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিলো তিনি হিমালয়ে বসে ধ্যান করে করে তার শরীর ত্যাগ করবেন। শুনে ধমক দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ–তুই নিজের মুক্তি চাস শুধু, এ তো স্বার্থপরতা। আর্তের সেবা করলে তা ধ্যানেরই সহায়ক। আত্মমুক্তি ও জগতের কল্যাণসাধন–এ দু'ধারী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন।

এই ধ্যান ও অপরের কল্যাণের জন্যে আমাদের সমাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের অন্যতম। এর পাশাপাশি বিবিধ ধর্মের বাণী নিয়ে কণিকা ও প্রার্থনার সিডি প্রকাশের যে উদ্যোগ কোয়ান্টাম নিয়েছে তা আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক চমৎকার পদক্ষেপ।

এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, ধর্মবাণীর ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও ভাবগত পার্থক্য নেই। আমাদের সবারই লক্ষ্য দুঃখমুক্তির মধ্য দিয়ে পরমানন্দ লাভ। ফলে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজস্ব বিশ্বাস

আরো দৃঢ় হয়। এ কাজে কোয়ান্টাম আরো এগিয়ে যাক, শ্রীভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

গীতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এতে সব শাস্ত্রের সার রয়েছে। সুতরাং গীতা পড়লে আমরা সব ধর্মগ্রন্থের সার অনুধাবন করতে পারবো। আমরা প্রত্যাশা করি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এ ভগবদ্‌গীতা কণিকা মূল গীতা পড়ার প্রতি সবার উৎসাহ আরো বাড়াবে। এর আগে প্রকাশিত কণিকাগুলোতেও বিশেষ বিশেষ ধর্মগ্রন্থের খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। গীতারও সেরকম বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। তাতে আমাদের জীবন আরো আনন্দময় ও মধুময় হবে। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা বাড়বে।

আমরা যখন উপলব্ধি করবো যে, সব ধর্মের শাশ্বত বাণীর মধ্যে মিল রয়েছে, তখন আমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি বাড়বে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণী নিয়ে প্রকাশিত কণিকাগুলো আমাদের ধর্মজগতের একটি বিশেষ প্রাপ্তি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

একাগ্র প্রার্থনায় স্রষ্টাকে
আমরা কিছু বলি।
আর হিরন্ময় মৌনতায়
স্রষ্টা কী বলছেন
তা আমরা শুনি।

অন্যদের ভুলগুলোকে
ততবার ক্ষমা করুন
যতবার আপনি নিজে
স্রষ্টার কাছে
ক্ষমা প্রত্যাশা করেন।

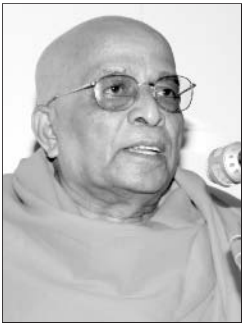

মহামান্য শুদ্ধানন্দ মহাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি ও ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের অধ্যক্ষ। তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পবিত্র ধম্মপদ কণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি মহামতি বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন।

ধ্যান প্রজ্ঞা নির্বাণ

শুদ্ধানন্দ মহাথের

মহামতি বুদ্ধ একদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। এমনসময় এক লোক এসে তাঁর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলো। থুতু মুছে বুদ্ধ বললেন, আর কিছু বলবে? লোকটি হতবাক। কারণ কারো মুখে থুতু দেয়ার পর আজ পর্যন্ত এরকম প্রশ্ন কেউ কাউকে করে নি। বুদ্ধের শিষ্যরা রেগে উঠলেন।

বুদ্ধের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দ বলে উঠলেন, এ ধৃষ্টতা সহ্য করা যায় না। এ পাপাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। বুদ্ধ বললেন, তোমরা থামো। সে নয়, তোমরাই আমার অবমাননা করছো। এত বছর আমার সাথে থেকেও তোমরা ক্রোধ সংবরণ করতে শিখলে না! এ লোকটির কোনো দোষ নেই। সে এখানে নতুন এসেছে। সম্ভবত সে আমার সম্পর্কে এমন কিছু শুনেছে যা তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। নিশ্চয়ই ওর আমাকে আরো কিছু বলার আছে। কারণ একজন মানুষ যখন কাউকে খুব বেশি ভালবাসে, বেশি ক্ষুব্ধ হয় বা বেশি ঘৃণা করে–সে তখন কিছু বলার আগে কোনো আচরণের আশ্রয় নেয়। বুদ্ধ লোকটিকে নিরাপদে চলে যেতে দিলেন।

এদিকে লোকটি বাড়ি গিয়ে সারারাত চিন্তা করলো। যতই চিন্তা করছিলো ততই বিস্মিত, হতভম্ব হচ্ছিলো। কে এই বুদ্ধ? কী করে একজন মানুষ এত শান্ত সৌম্য হতে পারেন, পারেন এত জাদুকরী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে?

সকাল হতে না হতেই সে আশ্রমে ছুটে এলো। লুটিয়ে পড়লো বুদ্ধের

পায়ে। এবারও বুদ্ধ জানতে চাইলেন, আর কিছু বলবে? আনন্দকে ডেকে বললেন–দেখো, মানুষ কীভাবে তার আবেগ প্রকাশ করে! অব্যক্ত কথা বলতে চায়! থুতু যেমন সে দিয়েছিলো কিছু বলার জন্যে, পায়ে লুটিয়েছেও কিছু বলার জন্যে।

লোকটি তখন বললো, প্রভু, আমার গতকালের ঘৃণ্য কাজের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। বুদ্ধ বললেন, আমি কিছুই মনে করি নি। কারণ তুমি তো আমাকে থুতু দাও নি। থুতু দিয়েছো আমার সম্পর্কে তোমার মনের ভ্রান্ত ধারণাকে। তাতে তো আমার কোনো ক্ষতি হয় নি।

এটাই বুদ্ধের শিক্ষা। ধ্যানের মধ্য দিয়ে যে পরম শাশ্বতবোধ বা জ্ঞানে তিনি উদ্ভাসিত হয়েছিলেন তা তাকে দিয়েছিলো এক অসাধারণ নির্লিপ্ততা। ঈর্ষাপরায়ণ চাচাত ভাই দেবদত্তের বারংবার চালানো হত্যাপ্রচেষ্টাও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। হত্যার জন্যে পাঠানো তীরন্দাজ বাহিনী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে দেয়া পাথর তাঁর পায়ের কাছে এসে থেমে গেছে, মদপান করিয়ে ছেড়ে দেয়া হাতি হাঁটু গেড়েছে বুদ্ধের উত্থিত অভয়মুদ্রার সামনে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যখন ভারতীয় সমাজ কঠোর জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে বন্দি, তখন মহামতি বুদ্ধই ঘোষণা করেন, জন্মে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্মে কেউ অচ্ছুৎ হয় না। কর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণ করে, কর্মই মানুষকে অচ্ছুৎ করে। নরসুন্দর উপালি জানতে চেয়েছিলেন, আমার মতো একজন অস্পৃশ্য কি অড়হৎ (বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু) হতে পারবে? বুদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই। শুধু তা-ই নয়, উপালিকে প্রধান দশ শিষ্যের একজন হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রতি অন্য শিষ্য রাজপুত্রদের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে বলেছিলেন মহামতি বুদ্ধ।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ সনে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে মা মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়। পরে তিনি মায়ের ছোটবোন মহাপ্রজাপতি কর্তৃক লালিত হন। জন্মের পঞ্চম দিনে রাজা ৮ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সদ্যোজাত শিশুর নামকরণ ও ভবিষ্যৎ বলার জন্যে ডাকেন। তাঁর নাম দেয়া হয় সিদ্ধার্থ–'যে সিদ্ধিলাভ করেছে বা যার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে'। তাদের মধ্যে একজন বলেন, রাজকুমার গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন।

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাথায় রেখে পিতা শুদ্ধোধন তাঁকে কখনো ধর্মচিন্তা বা জীবনের করুণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে দেন নি।

কথিত আছে, রাজকুমার সিদ্ধার্থ একদিন বেড়াতে বের হলে ৪ ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে একজন বৃদ্ধ মানুষ, অতঃপর একজন অসুস্থ মানুষ এবং শেষে একজন মৃত মানুষকে তিনি দেখতে পান। তিনি তাঁর সহিস চন্নকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে চন্ন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন–এটিই সকল মানুষের নিয়তি। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই রাত্রেই ঘুমন্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন।

দুঃখ ও দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জানতে সিদ্ধার্থ যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তিনি গ্রহণ করলেন সাধনার মধ্যপন্থা। দীর্ঘ ৬ বছর সাধনার পর এক পূর্ণিমা তিথিতে ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধ বোধিলাভ করলেন।

দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করার উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাসনা সব দুঃখের মূল। আর এর মূল অবিদ্যা। নির্বাণ লাভের মধ্যেই রয়েছে এই দুঃখের অবসান।

এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের চারটি উপদেশ যা চতুরার্য সত্য নামে পরিচিত–দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিরোধ আছে, দুঃখ নিরোধের পথ আছে। তিনি অষ্টবিধ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো–সম্যক ধারণা, সম্যক সংকল্প, সম্যক আচরণ, সম্যক জীবনধারণ, সম্যক মনন এবং সম্যক ধ্যান।

আর্যসত্য এবং অষ্টবিধ উপায় অবলম্বনের পূর্বে ত্রিশরণ মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। এই মন্ত্রের তাৎপর্য : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি–আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। বোধিলাভ জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধত্ব মানে পূর্ণ সত্য, পবিত্রতা, চরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান। ধম্মং শরণং গচ্ছামি–আমি ধর্মের শরণ নিলাম। যে সাধনা অভ্যাস দ্বারা সত্য লাভ হয়, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ হয় তা-ই ধর্ম। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি–আমি সঙ্ঘের শরণ নিলাম। যেখানে পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্যে ধর্মের সাধনা সম্যকভাবে করা যায় তা-ই সঙ্ঘ।

ধ্যান বৌদ্ধত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কারণ বৌদ্ধধর্মে মনের গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ বলেছেন, মন হলো সকল কর্মের চালক। আর এই মনের শুদ্ধি এবং ঋদ্ধির জন্যেই ধ্যান। ধ্যানের পথেই রাগ ক্রোধ দুঃশ্চিন্তা অস্থিরতা লোভ কামাসক্তি দূরীভূত হয়ে মন শান্ত হয়। তথাগত বুদ্ধ তাই বলেন, প্রজ্ঞা ছাড়া ধ্যান নাই। ধ্যান ছাড়া প্রজ্ঞা সৃষ্টি হয় না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় হয়েছে তিনিই নির্বাণ স্তরে পৌঁছেছেন।

কোয়ান্টাম মেথড আমাদের দেশে ধ্যানের ব্যাপকভিত্তিক চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। এটা খুবই ইতিবাচক লক্ষণ। কারণ একজন ধ্যানী মানুষ

কোনো অন্যায় করতে পারে না। তার মুখ থেকে কোনো খারাপ কথা নিঃসৃত হয় না। আমাদের দেশের মানুষ যত বেশি ধ্যানী হবে তত প্রশান্তি ও কল্যাণে ভরে উঠবে সবার জীবন।

আর স্বেচ্ছা রক্তদান ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে তা অসাধারণ। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর জীবনের ভ্রমণময় অবশিষ্ট ৪৫ বছর মহামতি বুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ এই সেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন।

ধর্মের বিভেদ প্রসঙ্গে বলি, জাত-পাতের বিচার করা উচিত নয়। আমার প্রথম পরিচয় হলো আমি মানুষ। মুসলিম হিন্দু খ্রিষ্টান বৌদ্ধ–এ মনোভাব নিয়ে আমরা যেন গড়ে না উঠি। আর কোয়ান্টামের মতো সার্বজনীনতার, উদারতার মনোভাব নিয়ে যদি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে তাহলে অশান্ত পৃথিবী শান্ত হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

আলস্য হচ্ছে
নরকে যাওয়ার
প্রধান রাজপথ।

গড্ডালিকা প্রবাহে
গা ভাসাবেন না।
ভ্রান্ত প্রথা অনুসরণকারী নয়,
শাশ্বত চেতনার আলোকে
প্রথা প্রবর্তনকারীরাই
মুক্তির পথ দেখান।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ঢাকার আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা। তিনি বাংলাদেশে মহামান্য পোপের প্রতিনিধি। তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল কণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি যিশুখ্রিষ্টের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন।

ধ্যানের পথেই আমাদের মুক্তি

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

প্রভু যিশু একবার এক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। নানা জায়গা থেকে অভ্যাগতদের দ্বারা ঘরটি এত পরিপূর্ণ ছিলো যে, দরজা দিয়ে আর একজনেরও প্রবেশের সুযোগ ছিলো না। এ অবস্থায় এক চলৎশক্তিহীন অবশ রোগীকে নিয়ে হাজির হলো তার বন্ধুরা। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, প্রভু যিশুর কাছে গেলেই এ নিরাময় হয়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশের কোনো সুযোগ না পেয়ে তারা হতাশ হচ্ছিলো।

অগত্যা এক উপায় অবলম্বন করলো তারা। ঘরের চালার একটা অংশ খুলে তার ভেতর দিয়ে নামিয়ে দিলো দড়িবাঁধা বিছানায় শোয়া সেই অবশ রোগীকে। যিশু তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে বললেন, বাছা! প্রভু তোমাকে ক্ষমা করেছেন। উঠে দাঁড়াও এবং বিছানা হাতে নিয়ে চলে যাও। সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে লোকটি তা-ই করলো।

আরেকবার সঙ্গীদের নিয়ে যিশু জেরুজালেম ত্যাগ করছেন। জেরিকোর কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, পথের ওপর এক অন্ধ ভিক্ষুক বসে আছে। বার্টিমোস নামের এই ভিক্ষুক চিৎকার করে বলতে লাগলো—হে যিশু, আমাকে দয়া করুন। তাঁর সঙ্গীরা তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে বার্টিমোস আরো জোরে জোরে যিশুকে ডাকতে লাগলো। যিশু থামলেন। অন্ধ ভিক্ষুকটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি বললেন, তুমি কী চাও? বার্টিমোস বললো, আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পেতে চাই। যিশু বললেন, তা-ই হবে। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে নিরাময় করবে। তৎক্ষণাৎ বার্টিমোস দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং পরিণত হলেন যিশুর অনুসারীতে।

বিশ্বাস ছিলো প্রভু যিশুর প্রথম শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করেছেন এবং বিশ্বাসী হতে বলেছেন। দীক্ষিত হওয়ার পর ৪০ দিন-রাতের উপবাস ব্রতের সময় শয়তানের নানা বিভ্রান্তি-চেষ্টাকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন বিশ্বাসের দৃঢ়তা দিয়ে।

প্রথমবার শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো তাঁর ক্ষুৎপিপাসা কাতরতার সুযোগে। তাঁকে বললো, হে যিশু, তুমি যদি সত্যিই প্রভুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে থাকো, তাহলে এ পাথরকে বল রুটি হয়ে যেতে। যিশু বলেছিলেন, শুধু দেহের খাবার নয়, ঈশ্বর নিঃসৃত বাণী মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

দ্বিতীয়বার শয়তান তাকে পৃথিবীর ভূ-ভাগের দৃশ্য দেখিয়ে বললো, আমার আনুগত্য করলে তোমাকে এ সমস্ত রাজ্যের অধিপতি করে দেবো। যিশু বলেছিলেন, আনুগত্য তো কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। উপাসনা তো তাঁরই একাধিপত্য। তৃতীয় এবং শেষবারের মতো শয়তানের ধোঁকাকেও তিনি জয় করেছেন বিশ্বাসের শক্তি দিয়ে।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো প্রত্যাশা। যিশু বলছেন, যারা ধৈর্যের সাথে সৎকর্ম করে ঈশ্বরের কাছে সুখ-সম্মান ও অনন্ত জীবন প্রত্যাশা করে, ঈশ্বর তাদের তা-ই দেবেন।

যিশুর তৃতীয় শিক্ষা মমতা। যিশু বলেন, বিশ্বাস প্রত্যাশা মমতা–এ তিনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। আর এর মধ্যে মমতাই সর্বাপেক্ষা মহৎ। এই মমতা এমনকি শত্রু বা বিরোধিতাকারীর জন্যেও। তিনি বলেন, যে তোমার শত্রুতা করে, তাকে ভালবাসো। যে তোমাকে ঘৃণা করে তার কল্যাণ কর। যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার জন্যে প্রার্থনা কর।

যিশু নিজেও সারাজীবন তা-ই করেছেন। এমনকি ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে যখন সাধারণ কয়েদীদের সাথে তাঁকেও বেঁধে আনা হচ্ছিলো তখনও তিনি ঈশ্বরের কাছে এ প্রার্থনাই করছিলেন যে, হে প্রভু! তুমি এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না, এরা কি করছে।

উদারতা আর সহিষ্ণুতার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন যিশু। একবার ব্যভিচারের দায়ে এক মহিলাকে শাস্তির জন্যে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। যিশু যখন উপলব্ধি করলেন মহিলাটি আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করছে, তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

আবার কিছু লোকের ব্যাপারে অভিযোগ এলো–তারা যিশুর নামে ভূত তাড়ায়, রোগমুক্ত করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন কি না জানতে চাইলে শিষ্যদের তিনি নিবৃত্ত করে বলেছিলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি মানুষের মুক্তির জন্যে, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যে; তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যে নয়।

অর্থাৎ একজন মানুষ একশ'টা ভুল করতে পারে, কিন্তু একটা ভালো কাজ তো সে করেছে। এই ভালোর ওপর ভিত্তি করেই আমরা চেষ্টা করি তাকে গড়ে তোলার জন্যে। যিশুর আদর্শে এটাই হলো আমাদের শিক্ষা এবং নীতি। যেখানে অনৈতিকতা দেখছি, আমরা তা দূর করার জন্যে চেষ্টা করছি।

আর যিশুর শক্তির উৎস ছিলো তাঁর ধ্যান, তাঁর প্রার্থনা। যে ধ্যানে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতেন। যে প্রার্থনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রার্থনায় যা কিছু তোমরা চাও বিশ্বাস করবে তা পেয়েছ, তাহলে তা-ই পাবে।

সারাদিন ধরে ভক্ত-শিষ্য-অভ্যাগতদের সাথে সময় কাটানোর পর সন্ধ্যাবেলা খানিকটা নির্জনে গিয়ে যিশু প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন, ভুলে যেতেন সমস্ত ক্ষুধা-ক্লান্তি-অবসাদ। অন্যদেরকেও তিনি বলতেন, অনেক কাজ করেছো, এখন ধ্যান কর। নিজেকে পর্যালোচনা কর, ভুলগুলো খুঁজে বের কর, মনের পর্দায় নিজেকে দাঁড় করাও, জীবন পরিবর্তন কর।

আমি মনে করি, ধ্যান, মেডিটেশন বা রিফ্লেকশন–যে নামেই বলি না কেন–ধ্যানের পথেই আমাদের মুক্তি। কারণ ধ্যান আধ্যাত্মিকতার দ্বার উন্মুক্ত করে। আর আধ্যাত্মিকতার ফসল হলো শান্তি-সম্প্রীতি, সমৃদ্ধি। কারণ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্ট–কোনো ধর্মই সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না, অনৈতিকতাকে সমর্থন করে না, অশান্তিকে সমর্থন করে না।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মিশনারীর উদ্যোগে প্রতিবছরই আমরা আয়োজন করি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের। সেখানে ২০০ জন অংশ নিলে ৫০ জন মুসলমান, ৫০ জন হিন্দু, ৫০ জন বৌদ্ধ এবং ৫০ জন খ্রিষ্টান সমবেত হন। অত্যন্ত খোলামেলা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব ঘোচাতে প্রয়াস পান।

সব ধর্মের নির্যাস এক, সব ধর্মের মনীষীরা এক কথাই বলেছেন। কেউ

যদি বলে আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ–এটা ঠিক নয়। ধর্মের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ভালবাসা। যিশু বলেন, পরমেশ্বরকে ভালবাসবে আর প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। আর্চবিশপ হিসেবে আমার প্রথম পরিকল্পনা হলো–সম্প্রীতি। কোয়ান্টাম এ সম্প্রীতি স্থাপনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এটা অন্তরের পবিত্রতার প্রকাশ, এটা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

সর্ব ধর্ম প্রতিনিধিত্বের সহাবস্থানের যে দৃষ্টান্ত কোয়ান্টামে স্থাপিত হয়েছে তা সত্যিই উৎসাহজনক। এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক–এটাই কামনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ডা. মনিরুজ্জামান

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

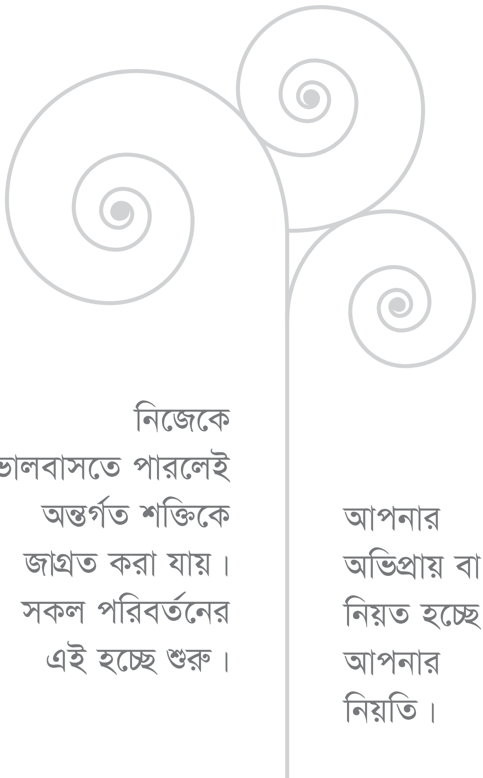

নিজেকে
ভালবাসতে পারলেই
অন্তর্গত শক্তিকে
জাগ্রত করা যায়।
সকল পরিবর্তনের
এই হচ্ছে শুরু।

আপনার
অভিপ্রায় বা
নিয়ত হচ্ছে
আপনার
নিয়তি।

বাংলা ভাষার বরেণ্য কবি ও কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক। কবিতা নাটক ছোটগল্প উপন্যাস–সাহিত্যের সব শাখায় স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণার জন্যে 'সব্যসাচী লেখক' হিসেবে তিনি সুপরিচিত। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই অক্লান্ত লিখে চলেছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ মাত্র ২৯ বছর বয়সে বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি কোয়ান্টাম মেথডের ইংরেজি মেডিটেশন সিডি'র মোড়ক উন্মোচন করেন।

আত্মশক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষকে জাগিয়ে তুলছে কোয়ান্টাম

কবি সৈয়দ শামসুল হক

ধ্যান–ব্যাপক অর্থবহ একটি শব্দ। কোনো একটি বিষয়ের ওপর গভীর মনোনিবেশ কিংবা নিজের উৎস ও পরিণতি নিয়ে ভাবনা ধ্যানের একেকটি বিশেষ রূপ। আমি মনে করি, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করাই ধ্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। একেকজনের কাছে ধ্যান একেকরকম। আমি যখন লিখি তখন সেটাই হয়ে ওঠে আমার ধ্যান।

সম্প্রতি একটি বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আমি নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। সে অনুষ্ঠানে সাধক পুরুষ শ্রী চিন্ময়ের আশ্রমের মেয়েরা গান গাইতে এসেছিলো। পরবর্তীতে তাদের আমন্ত্রণে আমি সেই আশ্রমে যাই।

ওখানে গিয়ে মনে হলো, মাটির ধুলার এ পৃথিবীতে যেন স্বর্গের একটা ছোঁয়া, স্বর্গের একটা আবহ। দেখেছি, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষ

সেখানে এসে ধ্যান করছেন। সেদেশের অসংখ্য মানুষ শ্রী চিন্ময়ের আত্মিক জীবনদর্শনের মাঝে আশ্রয় খুঁজছে। শ্রী চিন্ময় বাংলাদেশের মানুষ হয়েও আমেরিকায় গিয়ে এ বিপুল কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন দেখে একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত গৌরব বোধ করলাম। আসলে প্রাচ্যই কিন্তু এই ধ্যানের দিকে পাশ্চাত্যের মনোযোগ ফিরিয়েছে।

'ধ্যান' শব্দটি শুনলেই অনেকে মনে করেন জগৎবিস্মৃত হয়ে অন্য কোনো ভুবনে চলে যাওয়া। কিন্তু কোয়ান্টামে আত্ম উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের কল্যাণভাবনার দিকটি আমার খুব ভালো লেগেছে। কোয়ান্টামের রক্তদান কার্যক্রম, বান্দরবানের লামায় বঞ্চিত শিশুদের সুন্দর জীবনের পথে নিয়ে যাওয়া ও অন্যান্য সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি ফুটে ওঠে।

আসলে আমাদের মাটির বিশেষত্ব এটিই যে, উন্নত চিন্তা ও আধ্যাত্মচিন্তায় নিবিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ইহজাগতিক মানবকল্যাণের প্রয়োজনীয়তাটাও আমরা অনুভব করি। এটি এই বাংলার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। লালন যেমন বলেছেন, এমন মানবজনম আর হবে না, যা করার কররে মন এই জীবনে।

অর্থাৎ এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি যে বেঁচে আছি কাজের মাধ্যমে একে আমি কীভাবে আরো অর্থবহ করে তুলতে পারি। যে স্বর্গ আমার কল্পনায় রয়েছে তার একটা আবহ কীভাবে সুন্দর চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে আমি এখানে সৃষ্টি করতে পারি।

একজন সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে ধ্যানের পাশাপাশি আমাদের পড়তে হবে, সচেতন হতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। জানতে হবে সমসাময়িক পৃথিবীর বিষয়গুলো সম্বন্ধে। তাহলে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারবো। চিনতে পারবো নিজেকে, বুঝতে পারবো কোথায় আমার অবস্থান।

নিজেকে বোঝার এ চেষ্টা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর আগে সক্রেটিস বলে গেছেন–'নো দাইসেলফ' অর্থাৎ নিজেকে জানো। আত্মনিমগ্নতার মাধ্যমে এ বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

কোয়ান্টামের কোর্স করে নিজের জীবন পরিবর্তন করেছেন এমন অনেক মানুষের কথা আমি জানি এবং শুনেছি। বিশেষত যারা মাদকাসক্ত ছিলেন তারা মেডিটেশন করে সুস্থ ও সুন্দর জীবনে ফিরে গেছেন। যারা এ কোর্সটি

করছেন তাদের জীবন যে বদলে যাচ্ছে এটি কম কথা নয়।

আর এর প্রাণপুরুষ মহাজাতকের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সত্যিকারের একজন ভালো মানুষ হিসেবে তাকে জানি বলেই তার প্রতি আমার এক ধরনের স্নেহান্ধ দুর্বলতা রয়েছে। তাই দীর্ঘদিন ধরে আমি তার কাজ লক্ষ করে দেখেছি। আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে তিনি মানুষকে একটি উন্নততর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যাপৃত আছেন। এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভালো একটি উদ্যোগ।

কারণ সবাইকে সন্ন্যাসী মহাপুরুষ হতে হবে তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ তো ধ্যানচর্চার মাধ্যমে একটি সুন্দর জীবন গঠন করতে পারেন। এ লক্ষ্যে কোয়ান্টাম যে কাজ করে যাচ্ছে তার সুফল ও ইতিবাচকতা সম্বন্ধে আমি বহুজনের কাছে শুনেছি।

আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছে যারা নিজের কাজে কোনো তৃপ্তি বা আনন্দ খুঁজে পায় না। যে কাজটি সে করতে পারছে না তার জন্যেই যেন তার সমস্ত আকুতি। এজন্যেই আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনে এত অসহিষ্ণুতা, এত ধৈর্যহীনতা। কিন্তু কাজ করতে হবে আনন্দ নিয়ে, তুষ্টি নিয়ে।

৭৬ বছর বয়সেও আমি দারুণ কর্মক্ষম আছি, ২৫ বছর বয়সে যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি। তখন দিনে ১০/১২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি লেখা ও পড়ার কাজে, আজও তা-ই করি। ত্রিশ বছর বয়স থেকে নিরন্তর ভ্রমণ করেছি দেশে-বিদেশে। ছোটবেলা থেকে নিজের সব কাজ নিজের হাতে করে এসেছি, এখনও করছি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাজের আনন্দ চাই, শিক্ষার আনন্দ চাই, জীবন যাপনের আনন্দ চাই। আর সফল হতে হলে এ আনন্দের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করার আগে নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে হয়। কোয়ান্টামের কাজের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়াটি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

মানুষের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ইতিবাচকতা বা পজিটিভিটি। ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে জীবনের গভীরতার সন্ধান করতে হবে আমাদের। নিজেদের দেশ সংস্কৃতি ঐতিহ্য অতীত–সবকিছুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সকল কর্মকাণ্ড।

তাই এ সবকিছু নিয়েই আমাদের ইতিবাচকতার দিকে যেতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার ৫ হাজার বছরের ইতিহাসে আমরাই একমাত্র জাতি যারা রক্তের দামে স্বাধীনতা কিনেছি, কারো দয়ার দানে নয়। যে আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সেই শক্তিটাকে উপলব্ধি করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। তাহলেই আমরা অর্জন করবো আমাদের স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রাবিয়া নাজরীন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জানুয়ারি ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

নিজের প্রতি
পরিপূর্ণ মনোযোগ
আপনাকে
অনন্য করে তোলে।
নিজের প্রতি
পরিপূর্ণ মনোযোগ
দেয়ার উপায় হচ্ছে
মেডিটেশন।

আমরা সবাই কিছু
দৃশ্য বা ছবি কল্পনা করি।
আমাদের সৃষ্ট কল্পনা
বা মনছবিতেই
আমাদের প্রতিটি কোষ
ক্রমান্বয়ে আস্থা স্থাপন করে।

কবি ও সাংবাদিক বেলাল চৌধুরী। ছোটগল্প, উপন্যাস এবং অনুবাদেও তিনি সমান সপ্রতিভ। অনুবাদ করেছেন ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও জাপানিজ ভাষায়। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্যে তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। কবি বেলাল চৌধুরী কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় এ ভাষণ দেন।

একটি জাতির উত্থানের জন্যে চাই সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা

কবি বেলাল চৌধুরী

পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা একসময় বাংলাদেশ পেয়েছিলাম। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ লড়েছি তা কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে—এর অন্যতম প্রধান কারণ নেতৃত্বের সংকট।

অথচ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধুর মতো নেতারা ছিলেন এদেশেরই সন্তান। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে তাদের জন্ম; কিন্তু সৎ ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আর ধীশক্তির জোরে তারা আজও জাতির হৃদয়ে আসীন হয়ে আছেন। ভাসানী যখন 'খামোশ' বলে ডেকে উঠতেন—সারাদেশ কেঁপে উঠতো।

কিন্তু আজকে সেরকম নেতৃত্ব আমরা কোথাও দেখি না। নেতা আছেন হাজারে হাজারে কিন্তু হাফ-হার্টেড। জোর গলার কথা আছে ঠিক, কিন্তু কথার পেছনে না আছে বিশ্বাস, না আছে অনুসরণ। কেননা অনুসরণের জন্যে যে ধ্যান-জ্ঞান ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা আজ বড় দুর্লভ। রাজনীতি এখন রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে চালনার চেয়ে ব্যক্তিগত ভান্ডার পূরণেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাতিগত দিক বিবেচনা করলে আমরা কোনোভাবেই দরিদ্র নই। আমাদের দেশ বহু সম্পদে সম্পদশালী। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানবসম্পদ। কিন্তু নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন নই বলে

আমাদের হীনম্মন্যতা দূর হয় না, জড়তাও কাটে না।

আসলে যুগে যুগে কালে কালে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও সাহসই শত বিপর্যয়ের মুখে মানুষকে টিকিয়ে রেখেছে, বাঁচিয়ে তুলেছে। আর এ সাহসের উৎস স্রষ্টায় বিশ্বাস। বিশ্বাস সাহস সৃষ্টি করে, আর সাহস কর্মপ্রেরণা যোগায়।

কোনো প্রগতি, কোনো বিপ্লব, কোনো পরিবর্তন একক প্রচেষ্টায় হয় না। এজন্যে চাই সম্মিলিত প্রয়াস। সঙ্ঘবদ্ধ আশাবাদ মনে যে সাহস সঞ্চার করে তা কখনো কাউকে অবদমিত করে রাখতে পারে না।

তাই যেকোনো পর্যায় থেকে একটি জাতির উত্থানের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধতা আশাবাদ ও কর্মপ্রচেষ্টা এবং সেই সাথে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ যে জাতি নারীকে অবহেলা করেছে, ঘরকুনো করে রেখেছে সে জাতি কখনো এগুতে পারে নি। একজন নারী একই সাথে কখনো মা, কখনো বোন, কখনো স্ত্রী, কখনো মেয়ে। একজন সুশিক্ষিত মা-ই পারেন সুশিক্ষিত সন্তান গড়ে তুলতে।

একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার মানসিক প্রশান্তি। প্রশান্তি এলে রোগ শোক জরা ব্যাধি বালা মুসিবত সব ভেসে যায়। আমাদের জীবনের অশান্তির কারণগুলো যদি খুঁজতে যাই তাহলে দেখবো–এর মূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও শাশ্বত পথ থেকে বিচ্যুতি।

আমরা আজ হন্যে হয়ে ছুটছি, অন্ধের মতো চলছি শুধু বৈষয়িক সুখের জন্যে। তাই এত পাওয়ার পরও আমাদের না পাওয়ার হাহাকার, এত অতৃপ্তি, এত বিপর্যয়। বিশৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব আমাদের দিকহারা পথিকের অবস্থানে নিয়ে গেছে। কোনদিকে যাবো, কী করবো আর কী করবো না, আজ কেমন আছি, কাল কেমন থাকবো–আমরা তা জানি না। প্রতিনিয়ত এক অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনকে যাপন করছি আমরা।

আজকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তরুণ সমাজকে সংগঠিত করে ধীরে ধীরে সারাদেশে আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আত্মিক মুক্তি ও মানবসেবার লক্ষ্যে এই যে উৎসর্গ, নিজেদের বিলিয়ে দেয়া এর মধ্য দিয়ে শতগুণে ফিরে পাওয়া যায় অনেক বেশি কিছু।

আর সে বিশেষ কিছু যখন হয় হৃদয়ের প্রশান্তি, মানসিক দৃঢ়তা, আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতা তখন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আর কোনো দ্বিধা থাকে না, দ্বন্দ্ব থাকে না।

অনুলিখন : শাফিয়া নাজরীন

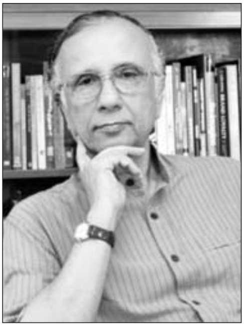

বাংলাদেশে সংস্কৃতি অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। গত দুই মেয়াদে তিনি ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যা বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের জন্যে অত্যন্ত গৌরবের। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও আইটিআই-এর বাংলাদেশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় তার রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি এ ভাষণ দেন।

সততা আর আন্তরিকতাই বিজয়ের মূলমন্ত্র

রামেন্দু মজুমদার

আমার দাদু প্রচণ্ড দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরবর্তীতে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হিসেবে বাড়ি-ঘর এমনকি একটা জমিদারি পর্যন্ত কিনে রেখে গিয়েছিলেন বংশধরদের জন্যে। আমার বাবা এবং কাকাও খুব সফল আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু আমাদের কখনো বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে দেন নি।

আমার মা কোলকাতার মেয়ে ছিলেন। গান করতেন, বেহালা বাজাতেন। কিন্তু বিয়ের পর নোয়াখালির এক গণ্ডগ্রামের সংসার জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। এসব কারণে শৈশবেই আমি হয়ে উঠেছিলাম কষ্টসহিষ্ণু এবং যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার মানসিকতা সম্পন্ন।

আমার বাবা সব কাজ আগেভাগে গুছিয়ে রাখতেন। এসএসসি'র রেজাল্ট হওয়া-মাত্র একটা টেস্টিমোনিয়াল দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। ফলে রোল নাম্বার হলো ১। কী যে বিড়ম্বনা! সবার কাছেই চেনা, প্রক্সি দিয়ে যে ক্লাস ফাঁকি দেবো সে সুযোগ নেই।

কলেজ শেষ করে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জগন্নাথ হলে অনন্য

সাধারণ কিছু মানুষকে অভিভাবক হিসেবে পেয়েছিলাম। আমাদের প্রভোস্ট ড. জি সি দেব এবং হাউজ টিউটর ছিলেন ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ও সন্তোষ ভট্টাচার্য।

ড. দেবকে ঋষিতুল্য মানুষ হিসেবে দেখতাম আমরা। জাগতিক বিষয়ে তার উদাসীনতা নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত ছিলো। একবার হলো–সামান্য এক মারামারির ঘটনার বিচারে বসেছেন ড. দেব। আমরা একপক্ষের লোকজন ঘরে ঢুকে দেখি তিনি আলো নিভিয়ে বসে আছেন। আমরা কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, এত আলো আমার এখানে আসবে যে তাদের আলোতেই ঘর আলোকিত হয়ে যাবে।

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে পেয়েছি আমার ইংরেজি বিভাগেও। চমৎকার পড়াতেন। নাটকের সূত্রে মুনীর চৌধুরীর কাছে তিনিই আমাকে পাঠান। ছিলেন ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রাজিয়া খান, খান সারওয়ার মুরশিদ। দুঃখজনক হলো এখন আর সে মানের শিক্ষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই।

শিক্ষার পর পেশাজীবনেও এলো সহজ সুযোগ। ফল বেরোবার আগেই চৌমুহনী কলেজে যোগ দিলাম ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। তখন বেসরকারি কলেজে প্রভাষকের পদ ছিলো না, সবাই অধ্যাপক। সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ টি হোসেইনের স্নেহানুকূল্যে এক ভোরে রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার চাকরি হয়ে গেল।

ভীষণ আনন্দময় ছিলো সে দিনগুলো। নকল বা ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরোধ–সবকিছুর বিরুদ্ধেই সেসময় যে আত্মবিশ্বাস আর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দাঁড়াতাম–এখন সেটা প্রায় ভাবাই যায় না।

কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সে সুখের দিনগুলো ছেড়ে চলে যেতে হলো করাচিতে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার চাকরি নিয়ে। মজার ব্যাপার হলো–এর ১ বছরের মাথায় আমি যেমন আবার ফিরে এসেছিলাম চৌমুহনীতে, তেমনি করাচির সেই বিজ্ঞাপনী সংস্থায়ও ফিরে গিয়েছিলাম তারও বছর দু'এক পরে।

দ্বিতীয় দফায় করাচি থেকে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় যেদিন ফিরলাম, তারিখটা ছিলো ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ। দেশের পরিস্থিতি তখন উত্তাল। শুধু একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাঙালি জাতি কোনোদিন এত ঐক্যবদ্ধ হয় নি, আর সে উদ্দেশ্যটি ছিলো আমাদের স্বাধীনতা–ক্ষুধা থেকে,

দারিদ্র থেকে, সামাজিক বৈষম্য থেকে।

স্বাধীনতার পর পর আমরা সবাই রাজি হয়েছিলাম যে, ১ হাজার টাকার বেশি কারো বেতন হবে না। সবাই সবার দুঃখকে ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সে চেতনাটিকে আর ধরে রাখা যায় নি।

কে কত দ্রুত বড়লোক হতে পারে, সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো একদল লোক। অন্যরা তখন ভাবলো—আমার পাশের লোকটা এত অযোগ্য হয়েও লাখ লাখ টাকা কামাই করছে, তাহলে আমি কী করলাম! সে-ও তখন এতে শামিল হয়ে গেল।

এভাবে আমরা একা একা ভালো থাকার চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু একা যে ভালো থাকা যায় না, সেটা বুঝলাম না। আমি সবসময় বিশ্বাস করি, একা ভালো থাকার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই।

স্বাধীনতার পর আমরা নতুনভাবে নাট্যচর্চা শুরু করলাম। টিকিটের বিনিময়ে নিয়মিত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাটক। সমাজের অসঙ্গতির কথাগুলো নাটকের মাধ্যমে উঠে আসতে লাগলো, চিন্তার খোরাক যোগাতে লাগলো।

টিভি চ্যানেল আর প্যাকেজের এই যুগেও মঞ্চে এসে এসব নাটক এখন অনেকেই দেখছেন। যদিও পেশা হিসেবে মঞ্চ নাটককে নেয়ার সুযোগ এখনো আসে নি।

ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাট্যকর্মীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এ পর্যন্ত আমরা ৯টি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও নাট্যোৎসব করেছি এর ব্যানারে। প্রতি দু'বছরে বের করেছি ওয়ার্ল্ড অফ থিয়েটার নামে একটি বড় প্রকাশনা—যাতে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটকের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অর্জনের বিবরণ।

বিদেশিরা অবাক হয়েছে যে, বাংলাদেশের মতো একটা গরিব দেশে কী করে এটা সম্ভব। আমরা তখন বলেছি, তোমরা আগে বাজেট যোগাড় কর, তারপর কাজে হাত দাও। আর আমরা কাজ শুরু করে দিই, বাজেটের যোগাড় হয় তারপর। কারণ, কাজটি ভালো—এ প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হলে আমরা তা আন্তরিকভাবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে করতে পারি।

সততার চর্চাটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার। শুধু

নেতা-নেত্রীর জন্যে নয়, সবার জন্যেই। কারণ কথায় আছে–যে জাতি যেমন, সে তেমন নেতৃত্বই পায়। এখন দরকার এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে সৎ, আদর্শবান নেতা নির্বাচনে আসতে পারেন।

পাশের দেশ ভারতেও দুর্নীতি আছে, কিন্তু তার একটা মাত্রাও আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তার দু'রুমের ফ্ল্যাটেই থাকেন, তার স্ত্রী অফিসে যান ট্যাক্সি-ক্যাবে চড়ে।

আমার স্ত্রী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। তখন আমি সাথে এসেছিলাম। দেখেছি সত্যিকার অর্থেই এখানে আত্মার শুদ্ধি সম্ভব, সম্ভব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বড় কাজ করা। মানুষের কল্যাণব্রতী এই ফাউন্ডেশনের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

নিয়মিত সকালের
আধঘণ্টা মেডিটেশন
আপনার চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও
নিজেকে প্রকাশ করার
ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে।

বাস্তবতা আমাদের
অন্তর্গত ধারণারই প্রতিফলন।
অন্তর্গত ধারণা বদলে গেলে
বাস্তবতাও বদলে যায়।

প্রয়াত কবি, প্রাবন্ধিক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ। নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী-পরিচালক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বলেন।

জাতীয় কবি নজরুল ॥ সাহস, স্বাধীনতা আর সাম্যের উচ্চকণ্ঠ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা লেখায় আছে—একবার নজরুলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে তিনি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটা বাড়িতে নজরুল থামলেন। বাড়ির অধিবাসীকে কিছু টাকা-পয়সা খাবার-দাবার দিয়ে এসে আবার গাড়িতে বসলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছেন, বাড়িটি ছিলো নজরুলের এক পরলোকগত বন্ধুর। স্বামীহারা এ অসহায় বিধবাকে এভাবেই সাহায্য করতেন নজরুল।

আরেকবার একটি মেয়ে এলো নজরুলের কাছে, খুব অভাবে পড়ে। মেয়েটিকে অপেক্ষা করতে বলে নজরুল কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়লেন, লিখে ফেললেন একটি গান। তারপর কাগজটি মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, ‘এটা গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে গেলে তোমাকে দু টাকা দেবে। টাকাটা তোমার।’ অর্থাৎ তার গানের রয়্যালটি মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন।

এমনই ছিলো মানুষের প্রতি নজরুলের ভালবাসা। অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান আর অনুজদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে নজরুল কখনো কার্পণ্য করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছেন। তার শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন ‘সঞ্চিতা’ উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথের নামে, শরৎচন্দ্রকে নিয়ে লিখেছেন। ঢাকার বুদ্ধদেব বসু কিংবা অজিত দত্তের মতো

তরুণ কবিদের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে দেখিয়েছেন বিরল পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টান্ত। এসব কারণেই হয়তো তিনি হতে পেরেছিলেন মানুষের প্রাণের কবি, প্রাণের সাহিত্যিক। ১৯৯৮ সালে একবার কলকাতায় নজরুলের জন্মজয়ন্তীর সময় দেখেছিলাম–পাড়ায় পাড়ায় নজরুলকে নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, দেয়ালে সব কাঁচা হাতে আঁকা নজরুলের ছবি।

নজরুল ছিলেন সাহসের প্রতীক। যে সময় তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তখন বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিলো একেবারেই পিছিয়ে পড়া একটা গোষ্ঠী। সে সমাজেরই হতদরিদ্র একটা পরিবার থেকে উঠে এলেও তার মধ্যে ছিলো না কোনো হীনম্মন্যতা। বরং নিঃসংকোচে তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তার সাহিত্যে। অকপটে মুসলমানদের কথা লিখেছেন। আবার সমানতালে লিখেছেন হিন্দু সমাজের কথাও। সে সময়ের আর কোনো সাহিত্যিকের রচনায় এ ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মহাত্মা গান্ধী যখন 'স্বরাজ' অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন নিয়ে অহিংস আন্দোলন করছেন সে সময় নজরুল তার ধূমকেতু পত্রিকায় লিখলেন, 'স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীন থাকবে না'। যা বুঝেছি তা সাহস করে বলা–এই দৃঢ়তার কারণেই হয়তো সমসাময়িক খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ছাপিয়ে মাত্র বছর কয়েকের মধ্যেই নজরুল হয়ে উঠলেন সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯১৯ সালে তার প্রথম প্রকাশনা বেরুলো। ১৯২২ সালে কবিতা ও গল্পগ্রন্থের সঙ্গে বেরুলো তার প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী'। আর সে বছরই বইটি বাজেয়াপ্ত হলো। তার মোট ৭টি বই বাজেয়াপ্ত করা হয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যার আর কোনো নজির নেই। ১৯২৩ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সী নজরুল যখন জেলে, রবীন্দ্রনাথ তাকে উৎসর্গ করলেন তার 'বসন্ত' নাটকটি, জেলে টেলিগ্রাম পাঠালেন–'Give up hunger strike, our literature claims you.' নজরুলকে আমরা বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' আখ্যা দিয়েছি। কিন্তু প্রথম ১৯২৯ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সেই তাকে 'জাতীয় কবি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৭৭ বছরের জীবনকাল হলেও নজরুলের কর্মমুখর জীবনের বয়স মাত্র ২৪ বছর। এই ২৪ বছরে যে অবস্থানে এ মানুষটি পৌঁছেছিলেন তা-ই প্রমাণ করে কী অসম্ভব কর্মনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তাই বাংলা গান, কবিতা, সাহিত্য যতদিন থাকবে, ততদিন বাঙালির হৃদয়ে নজরুলও থাকবেন চিরভাস্বর হয়ে।

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জুন ২০০৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বাংলাদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের পথিকৃৎ কাজী আনোয়ার হোসেন। 'বিদ্যুৎ মিত্র' ছদ্মনামে তিনিই বাংলা ভাষায় আত্ম উন্নয়ন ও মননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন। কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ৩য় ব্যাচে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজী আনোয়ার হোসেন ৪ দিন নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মহাজাতক একজন সাধক আর কোয়ান্টাম মেথড আমাদের দেশের মানুষের উপযোগী এক চমৎকার মেডিটেশন ও মননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

আমার বিশ্বাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

চাইলে পাওয়া যায়।

তবে চট করে হবে না। লক্ষ্য অর্জনের আগে প্রস্তুতি দরকার। নিজেকে তৈরি করা চাই, প্রয়োজনীয় সময় দেয়া চাই। ধৈর্য চাই।

মেডিটেশনের পুরো সুফল পেতে হলে সময় দিতে হবে। প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে। ধীরে ধীরে আসবে আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং তারপর সাফল্য। সঠিক নিয়মে চর্চা করলে সাফল্য আসবেই–আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই তাতে। লক্ষ্যবস্তু চলে আসবে হাতের মুঠোয়।

কেন আসবে তার ব্যাখ্যা একেকজনের কাছে একেক রকম। বিশ্বাসী সেটাকে পরমেশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করবেন, আর যারা মনে করেন প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্তা, তারা অনুভব করবেন–একান্তভাবে কিছু চাইলে সেটা পাওয়া যায়–এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী, সেটা কোনো ব্যাপার নয়–যে যেভাবেই করুন, মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে অন্যায় স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর সবই পাওয়া সম্ভব, তা আপনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যা-ই হোন কিংবা না হোন। এটা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য।

একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় বের করে নেয়া

কঠিনই। তবু কেন মেডিটেশনের জন্যে একটি করে ঘণ্টা ব্যয় করছি? কী লাভ হচ্ছে এতে?

রোজ সকালে ভয় রাগ ঘৃণা দুশ্চিন্তার কবল থেকে মুক্ত করছি মনটাকে, সবার মঙ্গল প্রার্থনা করছি, নিজ বা অপরের জন্যে যা চাই সেটা অটোসাজেশনের মতো করে উচ্চারণ করছি, মনছবি দেখছি সাফল্যের, আলফা লেভেলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমাধান খুঁজছি সমস্যার, চাহিদা পূরণ হলে সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি—ব্যস, এই তো। সুখী হওয়ার জন্যে এর বেশি আর কী দরকার? আর এর বিনিময়ে রোজ এক ঘণ্টা সময় দেয়া কি খুব বেশি কিছু?

শুধু একটি বিষয় খেয়ালে রাখা দরকার : চাইতে হলে কোনো জিনিস অর্জন ও নিজের দখলে রাখার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কোনো মন-পছন্দ বিষয়ে পারদর্শিতা, কিছু গড়ে তোলা বা মানুষের মঙ্গলের জন্যে কিছু করার ওপর। বস্তু দুদিনেই তার আকর্ষণ হারায়, কিন্তু এসব চলমান আনন্দের কোনো শেষ নেই, লক্ষ্যের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই মজা।

একটাই তো জীবন; এর অনেক সময় নষ্ট করেছি; বাকি সময়টুকু কিছুটা বিচক্ষণতার সঙ্গে কাটাতে যদি সত্যিই মেডিটেশনের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে সে-সাহায্য নেবো না কেন?

আর মানবতার কল্যাণে দীর্ঘদিন ধরে শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী, কন্যা এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী এক ব্যাটেলিয়ান ভক্ত বিভিন্ন সেক্টরে যে অসাধ্য সাধন করেছেন, সেজন্যে আমি আমার ক্ষুদ্র অন্তর থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মানুষ যা ভাবতে পারে,
যা বিশ্বাস করতে পারে,
তা অর্জন করতে পারে।

সাফল্যগাথা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হামিদা আলী ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে সাফল্যের সাথে দীর্ঘ ২১ বছর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির আজকের অবস্থান মূলত তার হাতেই গড়া। দীর্ঘ ৪৭ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বেশ কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার ছিলো সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা। অধ্যক্ষ হামিদা আলী কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩০০ উচ্ছ্বাস-৯ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন।

তরুণ প্রজন্ম সঠিক পথ খুঁজে পাবে কোয়ান্টামে

অধ্যক্ষ হামিদা আলী

২০০২ সালের ঘটনা। আমি তখন ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল। সে বছর আমার ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অবসর নেয়ার সময় হলো। কিন্তু আমার ছাত্রীরা, সহকর্মী শিক্ষিকা আর স্কুলের পরিচালনা-পর্ষদ কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না। সবার অনুরোধে আমি আরো কিছুদিন দায়িত্ব পালনে রাজি হলাম।

অধ্যক্ষ হিসেবে আমার মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে স্কুলের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত গেল। কিন্তু অনুমোদন পাওয়া গেল না। এদিকে আমার ছাত্রীরাও আমাকে কোনোভাবেই পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে দেবে না। একসময় তারা পথে নামলো, আন্দোলন শুরু করলো।

একদিন ছাত্রীরা স্কুলের সামনের পুরো রাস্তা অবরোধ করে বসে আছে। সে পথ দিয়ে সচিবালয়ে যাচ্ছিলেন চট্টগ্রামের ২ জন ব্যবসায়ী। রাস্তা বন্ধ দেখে তারা কৌতূহলবশত গাড়ি থেকে নেমে মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা রাস্তায় বসে আছো কেন? তোমরা কাঁদছো কেন? তখন ক্লাস ওয়ানের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমরা কাঁদবো না? মা-কে ছাড়া কি কখনো সন্তান বাঁচে? আমাদের মা-কে নাকি এখানে আর থাকতে দেবে না। আমরা

সেটা কিছুতেই হতে দেবো না।’ পরে সে দুজন ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে এলে তাদের কাছেই শুনি ঘটনাটা।

মেট্রিক পাশের আগেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু পড়াশোনা থেমে থাকে নি। বিদ্যোৎসাহী স্বামী আর শাশুড়ির সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় ’৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স সম্পন্ন করি।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করার পর খুব ইচ্ছে হতো–যদি স্কুলে বাচ্চাদের পড়াতে পারতাম! কিন্তু সেটা খুব সহজ ছিলো না। কারণ চাকরির ব্যাপারে চাচাশ্বশুরের বেশ আপত্তি ছিলো। যাই হোক, নেকাব পরে স্কুলে যেতে হবে–এই শর্তে শিক্ষকতা করার অনুমতি মিললো। স্বামীর চাকরিসূত্রে তখন আমরা নারায়ণগঞ্জে থাকি। সে বছরই অর্থাৎ ’৬৩ সালে নারায়ণগঞ্জের ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলে যোগ দিলাম।

স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন একজন ব্রিটিশ মহিলা। আমি স্কুলে যোগ দেয়ার কিছুদিন পর তিনি ৩ মাসের ছুটিতে ইংল্যান্ড যাবেন। যাওয়ার আগে প্রধান-শিক্ষিকা হিসেবে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে চান। কেন জানি তিনি আমাকেই বেছে নিলেন। ৩ মাস ভালোভাবেই স্কুল পরিচালনা করলাম।

এর মধ্যে একদিন নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি খুশি হয়ে প্রস্তাব দিলেন তার প্রতিষ্ঠানের মহিলা কলেজ শাখায় শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিতে।

পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে তোলারাম কলেজ থেকে একটি জায়গা পেলাম। কলেজের জন্যে নতুন ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। কোথায় টাকা পাবো, ইট-কাঠ পাবো–এ আশায় বসে না থেকে নিজেই ইটের ভাটায় চলে গেছি। বলেছি–ভাই, আমি মেয়েদের জন্যে একটি কলেজ করতে চাই, আপনারা কিছু ইট দেবেন? এভাবে বিভিন্নজনের সহযোগিতায় কলেজটি গড়ে ওঠে। দেড় যুগ এই কলেজে শিক্ষকতা করেছি।

’৮১ সালে কলেজটি সরকারি হয়ে গেলে আমি ওখান থেকে ইস্তফা দেই। তৎকালীন ডিপিআইসহ অনেকেই বোঝালেন সরকারি চাকরি না ছাড়তে। কিন্তু বদলির চাকরি ভালো লাগলো না।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে তখন অধ্যক্ষের পদটি শূন্য ছিলো। আমি ছিলাম এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য। পর পর দু’বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো, অনেকের ইন্টারভিউ নেয়া হলো। কিন্তু পরিচালনা-পর্ষদ কাউকেই মনোনীত করতে পারলেন না। সবাই মিলে আমাকে বললেন,

আপনার তো কলেজ পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে, দায়িত্বটা আপনিই নিন। ১৯৮১ সালের জুনে ভিকারুননিসাতে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিলাম।

কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখলাম, স্কুলের বিশাল জায়গা, ভালো কিছু করার অফুরন্ত সুযোগ। সেই থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পরবর্তী ২১ বছর এই প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নয়নের প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগাতে চেয়েছি। এ সময়ে ছাত্রীসংখ্যা ১৩শ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১ হাজার। স্কুলে নিয়মানুবর্তিতা ও পড়াশোনার মান বাড়াতে সবসময় সচেষ্ট থেকেছি। প্রতিদিন সকালে এসেম্বলিতে নিজে উপস্থিত থেকেছি এবং ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো ভালো কথা বলতাম যাতে তাদের নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হয়।

বলা হয়, শিক্ষকরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। এই মানুষ গড়ার আনন্দ পেতেই শিক্ষকতা পেশায় এসেছিলাম। আমার ৪৭ বছরের শিক্ষকতা জীবন এ আনন্দ ও সার্থকতায় পরিপূর্ণ। আমার ছাত্রীদের অফুরন্ত ভালবাসাই আমাকে এ দীর্ঘ সময় কর্মোদ্দীপ্ত রেখেছে।

ভিকারুননিসা থেকে ভালো রেজাল্ট করে যাওয়া আমাদের ছাত্রীরা এখন কোথায় না আছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ-আফ্রিকা বেড়াতে গিয়েছি। এক আত্মীয়ের বাসায় ছিলাম। এম্বেসি থেকে খবর পেয়ে বিকেলেই আমার এক প্রাক্তন ছাত্রী এসে উপস্থিত–তার বাসায় থাকতে হবে। এরপর আমাকে কী খাওয়াবে, কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে–এ নিয়ে তার সে কী উচ্ছ্বাস! তখন ভাবছিলাম, দক্ষিণ-আফ্রিকার মতো এত দূরদেশে এসেও আমার ছাত্রী পেলাম, জীবনে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে।

আসলে মানুষ যখন কাজে আনন্দ পায়, সফলতা আপনিই আসে। আর সফলতা কাজের স্পৃহাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছি বলেই এই ৭৩ বছর বয়সেও আমি পরম করুণাময়ের রহমতে সবদিক থেকে সুস্থ আছি, ভালো আছি। শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশায় থাকতে পারার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রতি মুহূর্তে শুকরিয়া আদায় করি।

এখনকার অধিকাংশ মা-বাবা সন্তানকে মোবাইল, কম্পিউটার সবই দিচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ নৈতিকতা শেখাচ্ছেন না। অথচ এটাই তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শিক্ষকদের অধিকাংশই এখন ব্যস্ত বাড়তি আয়ের উৎস খুঁজতে। আর কোচিং সেন্টারগুলো তো বাচ্চাদের মেধাকে চিবিয়ে খাচ্ছে।

আমি সবসময় বলি, মা-ই সন্তানের জীবনে প্রথম শিক্ষক। মানুষের জীবনের প্রথম স্কুল তার পরিবার। পরিবার থেকেই তার নৈতিক শিক্ষার ভিত তৈরি হয়। অভিভাবকদের বলি, সন্তানের জন্যে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে ব্যস্ত না থেকে তার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিন। একদিন এই সন্তানই আপনার সম্পদে রূপান্তরিত হবে। তখন আপনি কী রেখে গেলেন সেদিকে না তাকিয়ে সে নিজে অর্জন করতে সচেষ্ট হবে।

প্রতিটি পরিবার যদি সন্তানদের সদাচরণ ও সততার শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলে তাহলে সমাজ ও দেশ এমনিতেই সুন্দর হয়ে উঠবে। সবখানে শান্তি ফিরে আসবে। এই কাজটিই একটি চমৎকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করছে কোয়ান্টাম। তরুণ প্রজন্ম এখানে এসে সঠিক পথ খুঁজে পাবে।

এ কোর্সটি করলে তরুণদের মধ্যে 'ভালো'কে গ্রহণ ও 'মন্দ'কে বর্জন করার মানসিকতা জন্ম নেবে। আমি নিজেও কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে নতুন জীবনের সন্ধান পেলাম। কোর্সে এসে আমার ধৈর্য, প্রশান্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বেড়েছে। প্রতিদিন দুইবেলা মেডিটেশন না করলে মনে হয় কী যেন হলো না। মেডিটেশনকে আসলে প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করা উচিত।

জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত গৌরবের। আমাদের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে আমরা গর্ব করি। তাই এ দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্বও আমাদের। মানুষকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জাগিয়ে দিয়ে এই কাজটি চমৎকারভাবে করছে কোয়ান্টাম। আমি প্রত্যাশা করি, কোয়ান্টামের এ আলোকিত জীবনের বাণীকে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে পারলে প্রতিটি প্রাণ উজ্জীবিত হবে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে গড়ে উঠবে একটি শোষণমুক্ত নির্লোভ উদার সুশৃঙ্খল দেশ ও জাতি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রাবিয়া নাজরীন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, মে ২০১০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলমুক্তির পথ।

অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ। মূলত তার হাত ধরেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবা কার্যক্রম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ ধারাটি নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করে থাকে। অধ্যাপক নিজামউদ্দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর প্রকল্প-সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্বরত। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২২৭ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার মূলত জীবনেরই জয়গান

অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ

মুখের ক্যান্সার নিয়ে একজন মহিলা ভর্তি হয়েছিলেন আমাদের ওয়ার্ডে। তার মুখের একপাশ জুড়ে দগদগে ঘা, ক্রমাগত পুঁজ ঝরছে। সেই সাথে তীব্র যন্ত্রণা। আমরা চিকিৎসা শুরু করলাম। পরিচর্যা আর যত্নে একসময় পুঁজ পড়া বন্ধ হলো, ব্যথাও কমলো কিছুটা। কিন্তু তিনি তখন ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

একদিন জানতে চাইলাম তার কাছে–'আমরা কি আসলেই আপনার কোনো উপকার করতে পেরেছি?' তিনি তখন তার ক্ষতবিক্ষত মুখটি নিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনারা নিজেরাও জানেন না আমার কত বড় উপকার আপনারা করেছেন। আমার ৫ বছরের ছোট মেয়েটা ঘায়ের দুর্গন্ধ আর ব্যথার যন্ত্রণা দেখে আগে আমার কাছেই আসতো না। আর এখন সে প্রতিদিন আমার সাথে ঘুমায়। অন্তত জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমি ওকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারছি।' আসলে প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে কাজ করার সার্থকতা আর তৃপ্তিটুকু এখানেই।

২০০৩ সালে আমার এক ব্রিটিশ বন্ধু আমাকে একটি বই দেন–'ইন্ট্রোডিউসিং প্যালিয়েটিভ কেয়ার'। আমি তখন বিএসএমএমইউ-তে

এনেস্থেশিয়া বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। বইটি পড়ে আমার উপলব্ধি হলো—এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

গত শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির পরও এখনও বহু রোগ আছে যা নিরাময়-অযোগ্য। এসব রোগে আক্রান্ত মানুষের রোগ-যন্ত্রণা সাধ্যমতো প্রশমনের ব্যবস্থাটাই হলো প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবা। আমার মনে হলো প্যালিয়েটিভ কেয়ার ছাড়া পুরো চিকিৎসাব্যবস্থাটাই আসলে অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার যে পর্যায়ে রোগীর স্বজনকে বলা হয় যে, আমাদের আর কিছুই করার নেই, রোগীকে বাড়ি নিয়ে যান; ঠিক সেখান থেকেই কাজ শুরু করে প্যালিয়েটিভ কেয়ার।

খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, দক্ষিণ ভারতে এই বিষয়টি বেশ এগিয়ে গেছে। কেরালার কালিকূটে অবস্থিত 'ইনস্টিটিউট অফ প্যালিয়েটিভ মেডিসিন'-এর পরিচালক ডা. সুরেশ কুমারের সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ হলে তিনি আমাকে ওখানে ৬ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে আমার ধারণাটা আরো একটু স্পষ্ট হলো।

আমাদের মতো দেশগুলোতে অনেক নিরাময়-যোগ্য রোগ এমনিতেই পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক নানা কারণে নিরাময়-অযোগ্য রোগে পরিণত হয়, সেই সাথে নিরাময়-অযোগ্য রোগের বোঝা তো আছেই। তখন আমার মনে হলো—আমাদের দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের কাজ শুরু হওয়াটা ভীষণভাবে প্রয়োজন।

২০০৭ সালে কাকতালীয়ভাবে সেই সুযোগটিই যেন মিলে গেল। সে বছরের প্রথমদিকে ক্যান্সার-বিষয়ক একটি সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছিলেন বিএসএমএমইউ-এর তৎকালীন উপাচার্য। তার বক্তব্যের শেষ কথাটা ছিলো—আমি মনে করি, বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের ধারণাটা গড়ে ওঠা উচিত। মুহূর্তেই যেন একটি দিক-নির্দেশনা পেয়ে গেলাম। বুঝলাম—বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত।

২/৩ দিন পর তার সাথে দেখা করে এ বিষয়ে আমার আগ্রহ ও প্রশিক্ষণের কথা তাকে জানালাম। সব শুনে বিএসএমএমইউ-তে প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে তিনি আমাকে একটি প্রকল্প-প্রস্তাব জমা দিতে বললেন। কয়েকদিনের খাটাখাটনি শেষে একটি প্রকল্প-প্রস্তাব তৈরি করে জমা দিলাম।

কিছুদিন পর একটি বিজ্ঞপ্তি-আদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের

বহির্বিভাগে এ কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয়া হলো। এটি ছিলো আমার জন্যে এক বিশাল প্রাপ্তি। কারণ এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে স্বীকৃতি দিলো। এভাবেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাংলাদেশে তার যাত্রা শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল কম্পাউন্ডের এক কোণায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট্ট একটি কক্ষ আমাদের বরাদ্দ দেয়া হলো। আমরা সেখানেই কাজ শুরু করলাম। সেই থেকে ধাপে ধাপে বিএসএমএমইউ-এর সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ারের আওতায় এখন ২০টি বেড নিয়ে ইনডোর চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে এ বিভাগে ১২ জন চিকিৎসক ও ৮ জন নার্স কর্মরত আছেন। চিকিৎসাসেবা দেয়ার পাশাপাশি আমরা এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

আশার কথা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত একটি ভবনে ৩২শ বর্গফুটের একটি ফ্লোর আমাদের বরাদ্দ দিয়েছেন। ২০১১-এর জানুয়ারিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার' নামে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রশমন সেবা আসলে অত্যন্ত জীবনধর্মী একটি কাজ। কারণ মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি রোগের যে ইতিহাস আমাদের বলেন, তা মূলত তার পুরো জীবন কাহিনীই বলা চলে, যাতে তার শারীরিক মানসিক আত্মিক ও সামাজিক-জীবনের চতুর্মাত্রিক রূপটি প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা বলি–মৃত্যুর সাথে নয়, আপনি যদি জীবনের সাথে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন, তবেই আপনি এখান থেকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারবেন। কারণ মানুষটি তো এখনও বেঁচে আছে। তাই প্যালিয়েটিভ কেয়ার আসলে জীবনেরই একটি অংশ। এটি মূলত জীবনেরই জয়গান।

আর এসব রোগীকে পরিপূর্ণ সেবা দিতে চাইলে তার সাথে চিকিৎসক ও নার্সদের একটি মমতাপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে মাদার তেরেসার একটি কথা আমাদের প্রেরণা যোগায়–We cannot always do the great things, but we can do small things with great love.

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে এরকম একটি কাজ করতে গিয়ে পদে পদে বাধা আসে, হয়তো বাস্তব কারণেই তা কিছুটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু আমি মনে করি, মানুষের সবচাইতে বড় বাধাটা থাকে তার নিজের মধ্যেই। নিজের ভেতরের সংশয় সংস্কার দ্বিধা এগুলো যতদিন থাকে

ততদিন মানুষ বাধা উপলব্ধি করে। হয়তো আমার মধ্যেও এগুলো কিছুটা ছিলো বলেই প্রথমদিকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু একসময় যখন এ কাজটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছি, তখন বাধাগুলোও যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলো।

তবে আমাদের সামনে এখনও অনেক কাজ বাকি। বাংলাদেশের প্রান্তিক এলাকার কিংবা চরাঞ্চলের নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষটিকেও যেদিন আমরা প্রশমন সেবার আওতায় আনতে পারবো সেদিন কিছুটা কাজ হয়েছে বলে ভাবতে পারবো। এটি খুবই সম্ভব, কারণ এ দেশের মানুষের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো–কোনো একটি কাজকে তারা যখন ভালো কাজ মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, এটি আমারও কাজ, তখন তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কিছুদিন আগে লামায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। তা ছিলো আমার জন্যে এক বিশাল অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা। আমাদের ২/১ সন্তানের পরিবারকেই ছন্দোবদ্ধ রাখতে আমরা হিমশিম খাই, আর সেখানে ৫শ শিশুর একটি পরিবার অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্য হিসেবে আমিও নিজেকে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশ ভেবে গর্ববোধ করি। আসলে গুরুজীর সার্থকতাটুকু এখানেই–তিনি সবাইকে নিয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যা আমি আমার নিজের বলেও ভাবতে পারি এবং বলতে পারি–কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আমারও প্রতিষ্ঠান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, মে ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মস্তিষ্ক মানুষকে মানুষ বানায় নি,
হৃদয় মানুষকে মানুষ বানিয়েছে।
বিশ্বজনীন মমতার নিবাস হচ্ছে হৃদয়।

বাংলাদেশের মঞ্চ ও টিভি নাটকের এক নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী ফেরদৌসী মজুমদার। অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত ও খ্যাতনামা এই নাট্যব্যক্তিত্ব কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৫৬ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন কোর্সে অংশগ্রহণের অনুভূতি। বলেছেন নিজেকে নিয়ে; ছেলেবেলা আর পরিবার নিয়েও নানা স্মৃতিচারণ উঠে এসেছে এ সাক্ষাৎকারে।

পারিবারিক একাত্মতায় উদ্বুদ্ধ করে কোয়ান্টাম

ফেরদৌসী মজুমদার

যে মেয়েটিকে মায়ের হাতে মার খেতে হয়েছিলো বাবাকে নকল করে দেখানোর অপরাধে; আর বাবার পিটুনি খেতে হয়েছিলো টেলিভিশন দেখতে যাবার অপরাধে, সে মেয়েটি ৩১ বছর ধরে টেলিভিশনের পর্দা আলোকিত করে রেখেছেন, মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তার অনন্য অভিনয় প্রতিভায়।

হ্যাঁ, আমরা অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের কথাই বলছি। বড় ভাই শহীদ মুনীর চৌধুরীর হাত ধরে নাট্যযাত্রার শুরু, তা আজো চলছে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ের মুগ্ধতা আর ভালবাসা নিয়ে, যা তিনি অর্জন করেছেন নিজ যোগ্যতায়। সাফল্য আর স্বীকৃতিতে তার প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ।

প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা আর ধর্মপরায়ণতার সাথে আধুনিকতার একটি চমৎকার মিশেল ছিলো পারিবারিক আবহে। ১৪ জন ভাই-বোন আর বাবা-মা নিয়ে বিশাল সংসারে পরহেজগার বাবা ডিস্ট্রিক্ট-জজ খান বাহাদুর আব্দুল হালিম চৌধুরী হাতে ধরে ধরে তাদের নামাজ পড়তে শিখিয়েছেন, লেখাপড়া করিয়েছেন। সেই সাথে এটাও বুঝিয়েছেন–যার যার কাজের জবাব তাকেই দিতে হবে। এভাবে দায়বদ্ধতার একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে গিয়েছিলো মনের মাঝে সেই ছোট বেলাতেই। যা আজও, এ পরিণত বয়সে, সমানভাবে

তাড়িত করে। ভোরবেলা উঠে নামাজ পড়া, পড়তে বসা–এই ছিলো তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য।

মিথ্যা বলাকে গণ্য করা হতো ভয়ংকর অপরাধ হিসেবে। অনেক বড় অপরাধের ক্ষমা পেয়ে যেতেন শুধু সত্য বলার কারণে। বাবার এই শিক্ষা আজো তার হৃদয়ে গেঁথে আছে। সেই আলোতে তিনি নিজের পরিবার গড়েছেন। নিজের মেয়েকে মানুষ করেছেন সত্য বলার আদর্শে। বাসার গৃহকর্মীদেরও কাজের প্রথম শর্ত মিথ্যা না বলা।

জীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি এসেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে শোকরগোজার থাকার শিক্ষা পেয়েছিলেন পিতার কাছে। তাই কখনো হাল ছাড়েন নি। সুখে-দুঃখে সবসময় বিধাতাকে স্মরণ করেছেন। যে সুপ্রিম পাওয়ার চন্দ্র-সূর্যসহ সমগ্র বিশ্ব জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। আর মৃত্যু হলো অমোঘ সত্য, কেউ তাকে এড়াতে পারে নি–এই বোধগুলো বাবা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন মনের ভেতর। আজ এতকাল পরেও এসবই বিপদে শক্তি যোগায়, আস্থা দেয়–বললেন ফেরদৌসী মজুমদার।

অনেক বড় বয়সেও বাবার তীব্র শাসনে যেমন ছিলেন তেমনি মায়ের মমতাও তাকে ভরিয়ে রাখতো সবসময়। বাবা মারতেন পড়া না পারলে, আর মা উম্মে কবীর আফিরা বেগম চোখের জল ফেলতেন। আজ বোঝেন, বাবার শাসন যদি না থাকতো, মায়ের সেই স্নেহ যদি না থাকতো তবে মানুষ হওয়া হতো না।

তার কাছে পারিবারিক ঐতিহ্য তাই বিরাট ব্যাপার। তিনি মনে করেন ব্রোকেন ফ্যামিলিগুলোর জন্যে বাবা-মা সমানভাবে দায়ী। কেননা তারা বাচ্চার চাহিদা হয়তো মেটাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের জন্যে যে স্যাক্রিফাইসটুকু করা প্রয়োজন, সেটা করছেন না। পরিবারে ভালো ভালো কথা বলার রেওয়াজটাও বিরাট ব্যাপার।

এমনই বাবার শাসন, মায়ের আদরে-ভরা সংসারে বড় হতে হতে মুসলিম গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি এবং ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলেন। ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন বড় ভাই মুনীর চৌধুরীর উৎসাহে শওকত ওসমানের লেখা নাটক 'ডা. আবদুল্লাহর কারখানা'য় যন্ত্রমানবের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বাবার চোখ এড়ানোর কী ভয়-আতংক তখন!

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় ভর্তি হলেন। অভিনয়ও চলছিলো ছাত্র-শিক্ষকদের যে নাট্য সংগঠন ছিলো সেটা থেকে। তারপর ১৯৬৪-তে টেলিভিশন এলো। প্রথম নাটক করলেন 'একতলা-দোতলা'। চতুর্দিকে জয়-

জয়কার। বাঘের মতো রাগী বাবার চোখেও মুগ্ধতা, মেয়ের সাফল্যে আনন্দিত। কিন্তু শাসন তখনো রয়েছে। পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি আর। বাংলায় অনার্স-মাস্টার্স এবং তারপর আরবিতে মাস্টার্স করলেন। পাশাপাশি অভিনয় করেছেন পুরো দমে।

টেলিভিশনের পাশাপাশি মঞ্চেরও নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী তিনি। কী সেই অনুপ্রেরণা শক্তি, যা তাকে এতদূর এনেছে–এ প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, কাজের প্রতি ভালবাসাই তার শক্তি। তিনি কখনো ভাবেন নি যে বিখ্যাত হবেন। পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে ছবি যাবে। শুধু অভিনয়কে ভালবেসে গেছেন। কেননা কাজ যত ছোট হোক না কেন তাকে ভালবাসা উচিত; যেন তা নিজেকে তৃপ্ত করে, অন্যকে মুগ্ধ করে।

আর সেই সঙ্গে রয়েছে আশাবাদী চিন্তা, আত্মবিশ্বাসী থাকা। নিজেকে আশাবাদী বলে মনে করেন তিনি–যা এসেছে পরিবার থেকে। কখনো হতাশ না হবার শিক্ষা, আফসোস না করার শিক্ষা বাবা-মা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সেই শৈশবেই।

এই বোধটিই নতুন করে আবার জাগ্রত হয়েছে কোয়ান্টামে এসে–তিনি জানালেন। ২০০১ সালে যখন তার বাঁ পা ভাঙলো, তিনি চোখের জলে ভেসে না গিয়ে বিধাতার কাছে সহনশীলতার দয়া ভিক্ষা করেছেন আর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন যে, কোমরে তো চোট লাগে নি।

শরীর যখন খুব খারাপ তখন তিনি সহকর্মী মিসেস তহুরা কালামের পরামর্শে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেন ১৫৬ ব্যাচে। কোর্স করে তার উপলব্ধি–খুব উপকার পেয়েছি। সুস্থ হওয়ার সাহস এবং আশা জেগেছে। প্রথম থেকে তিনি যে পারিবারিক শিক্ষার কথা বলে আসছিলেন, তার সাথে কোয়ান্টামের শিক্ষা মিলে তাকে নতুন দিশা যোগালো। আবার তিনি নতুন করে পজিটিভ চিন্তা করতে শুরু করলেন। একজন মুগ্ধ শ্রোতা হয়েই তিনি আত্মস্থ করেছেন গুরুজীর প্রতিটি কথা।

কোর্সের প্রতিটি মেসেজ ঈশপের গল্পের মতো তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার সেই পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা। যেখানে মা শিখিয়েছিলেন–মানুষের জন্যেই মানুষ, কারো নিন্দা না করা, ভালো কথা বলা, ভালো চিন্তা করা, দেশকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে হৃদয়ে শান্তি লাভের শিক্ষা, যা পেয়েছেন বাবা-মার কাছে; আবার তা সাজিয়ে নিয়েছেন গুরুজীর অসাধারণ বয়ানে। কেননা ভাঙা বাঁ পায়ে অপারেশনের পর যখন সব ঠিক হওয়ার পথে তখন ডান পায়ে আর্থ্রারাইটিস দেখা দিলো। শরীরের যন্ত্রণার

সাথে সাথে যখন মনও অস্থির তখন মেডিটেশন তাকে সাহস যুগিয়েছে। তার ভাষায়, সে আশাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বাসায় নিয়মিত মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি। মেয়ে, স্বামীও আমার আরোগ্য কামনা করে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখেন।

প্রতি মুহূর্তে কৃতজ্ঞ থাকাই ফেরদৌসী মজুমদারকে দিয়েছে সুখী সংসার। স্বামী বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মেয়ে সু-অভিনেত্রী ত্রপা মজুমদারকে নিয়ে সুখের জীবন তার। বাবার বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করছে জার্নালিজমে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ত্রপা। সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের বন্ধুত্বের সম্পর্কের এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই নাট্য পরিবার। ফেরদৌসী মজুমদার তাই বলছিলেন, বাবা-মা ও সন্তানের মাঝে নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও বন্ধুত্বের পারিবারিক এই ব্যাপারটি তিনি কোয়ান্টামে এসেও অনুভব করেছেন এবং এই প্রজন্মের বাবা-মা-সন্তান সবারই উচিত এর সাথে একাত্ম হওয়া।

ব্যক্তিজীবনে অভিনয়ের পাশাপাশি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন এই সুবক্তা ও আত্মবিশ্বাসী মানুষটি। এখানেও তিনি বলেছেন, একজন ছাত্রের পারিবারিক শিক্ষার সাথে সাথে জীবন সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনার কথা। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি মনে করেন, কোয়ান্টাম এই দিক-নির্দেশনাটা সুন্দরভাবে দিতে পারে। চরিত্র গঠনেও এই নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে সর্বদা জয়ী থাকার মন্ত্র 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' সবারই গ্রহণ করা উচিত।

ইতিবাচকতা, আত্মবিশ্বাস আর ভালবাসার ঝর্নাধারায় প্রবাহিত এই সফল মানুষটির জীবনে কোনো বাধা পাঁচিল হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, এমনকি গুরুতর শারীরিক অসুস্থতাও না। যেখানে চলৎশক্তিহীন হয়ে যাবার কথা সেখানে তিনি চলেছেন। আবার স্বপ্ন দেখেছেন গতিময় জীবন ফিরে পাবার। যার প্রেরণা তিনি নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন কোয়ান্টাম মেথডে। তিনি মনে করেন এই উজ্জীবনী সুধার স্বাদ সবারই গ্রহণ করা উচিত।

প্রতিবেদক : শম্পা রায় ও সুমন ধর

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জুলাই ২০০৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রশান্ত মনই শক্তির আসল ফল্গুধারা।

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আবদুল হাই শিকদার বিশিষ্ট সাংবাদিক, টিভি-ব্যক্তিত্ব ও নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২২ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন।

ভালো না বেসে উপায় কী?

কবি আবদুল হাই শিকদার

উনিশ শ' উনআশির কথা। বহুমুখী হতাশায় আমি চৌচির। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মন হু হু করে। কোথাও কাউকে দেখি না। শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়াই আর আত্মহত্যার জন্যে সহজ মাধ্যম খুঁজি।

আরামবাগের মেসে শুয়ে শুয়ে রাতে নির্ঘুম চিন্তা করি, কমলাপুরের রেলওয়ে ওভারব্রিজ থেকে চলন্ত ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? শরীর শিউরে ওঠে। পদ্ধতিটাকে বীভৎস মনে হয়। সিলিং ফ্যানের সাথে দড়ি আটকে গলায় বেঁধে ঝুলে পড়লেই তো হয়। ভাবতেই গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি রাত-দিন তখন হাতড়ে বেড়াচ্ছি আত্মহত্যার নানা পথ। অবস্থা তখন এমন—যদি এ কাজে ফেল মারি তাহলে আত্মহত্যা করবো ঘুমের বড়ি খেয়ে। কতটা ঘুমের বড়ি খেলে একজন মানুষের আর ফেরার সম্ভাবনা থাকে না? এ নিয়ে একদিন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথাও বললাম।

মাঝে মাঝে বিজয় সরকারের গান গাই পার্কে বসে—'এই দুনিয়া যেমন আছে তেমনই রবে, সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে।' এক দুপুরে একা একা আজিমপুরে গিয়ে লাশ-দাফন পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম।

মনে মনে ভাবি, আমার দিন-ক্ষণ ঠিক। তখন চোখ ছাপিয়ে নেমে আসে অবিরল পানির ধারা। যেখানে যা কিছু দেখি তা-ই সুন্দর লাগে। পুরো অস্তিত্ব

যখন এমনই মুহ্যমান, সেই সময় ঘটলো ঘটনাটি।

চামেলিবাগের ভেতর দিয়ে শান্তিনগরের দিকে আসছিলাম। তখন সন্ধ্যা। দিন তারিখ মনে নেই। হঠাৎ দেখি সুন্দর, মাঝারি গোছের চেহারা, ম্যাক্সিম গোর্কির মতো গোঁফ। কালো চুল। দীর্ঘ কিন্তু বাহুল্য-বর্জিত কালো আলখেল্লা পরিহিত একজন সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষ রাস্তা-লাগোয়া একটি বাড়িতে ঢুকে গেলেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন কি দেখেন নি জানি না। কিন্তু আমি সত্যিকার অর্থেই আপাদমস্তক চমকে উঠলাম। এক ধরনের সংকেতে যেন জেগে উঠলাম আমি। কে এই মানুষ? গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি লেখা–'মহাজাতক'।

আমি ঢুকে পড়লাম সে বাড়িতে। বাইরের কক্ষ থেকে স্লিপ গেল ভেতরে। ডাক পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই। সেই আমার প্রথম 'মহাজাতক' দর্শন। প্রথম এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমার বেলায়।

না, মহাজাতক আমাকে সেদিন কিছুই বলেন নি। কথা বেশিরভাগ আমিই বলেছি। তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ শ্রোতা। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, কারণ এর মধ্যে এমন গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা কেউ শুনেছে বলে স্মরণ করতে পারছিলাম না।

অথচ আমি তখন কে? কেউ না। একজন প্রায় ভবঘুরে, যে নাকি আত্মহত্যা করার স্বপ্ন দেখে। পত্রিকার পাতায় কবিতা ছাপাতে পারছি না বলে জীবনটাকেই একটা যাচ্ছেতাই ভাবছি আর যেসব জাপানী লেখক হারিকিরি করেছে তাদের জীবনী পড়ছি।

মহাজাতক আমাকে সেদিন কী বলেছিলেন, আমার মনে নেই। মনে না থাকারই কথা। আসলে আমি তখন আমাকে নিয়েই ব্যাকুল। বিদায়ের সময় হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মহাজাতক। স্নিগ্ধ হাসিতে উপচে পড়ছে তার আন্তরিকতা। গভীর কালো তার চোখ-দুটো আর তার ঠোঁটই যে সেই দুঃখ-ভোলানো হাসিতে অংশ নিয়েছিলো তা নয়; আমার এখনো মনে হয়, তার সমস্ত শরীর যেন সে হাসির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হয়ে ভরে ছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যখনই ইচ্ছে করে তার কাছে যেতে।

ফিরে এলাম অদ্ভুত এক প্রশান্তি নিয়ে। সে রাতে আমার গভীর গাঢ় ঘুম হলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এর পরের বেশ কয়েকদিন আত্মহত্যা প্রসঙ্গটাই আমার মনে ছিলো না। যখন মনে হলো, তখন নিজেই খুব আশ্চর্য হলাম। মহাজাতকের সেই হাসিমাখা মুখ আর আমার আশ্চর্য হওয়ার ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারি নি।

আত্মহত্যা করার জন্যে যে ধরনের সাহস আর যোগ্যতা দরকার তা আমার আছে কি না জানি না। তবে আমি যখন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র তখন একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলাম দীর্ঘদিন। বিষয়টির প্রতি আমার মমতা বা আকর্ষণ তখন থেকে আজ অবধি যায় নি। মানুষকে খুব নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখলে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

আমার নিজের অর্থনৈতিক-অসচ্ছলতা আমাকে পীড়া দেয়। শিশুদের কষ্ট আমি সইতে পারি না। কান্না তো নয়ই। আমাদের সামাজিক জীবনের বৈষম্যগুলো আমাকে ভাবায়। মানুষ মানুষকে শোষণ করে কীভাবে! প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধ আর কতদিন? কেন নজরুল ইসলামের মতো মানুষকে ভালবাসার কবিতা লিখতে পারি না। কেন আমিও হতে পারি না 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মনসুর বয়াতী কিংবা 'রূপসী বাংলা'র জীবনানন্দ দাশ?

পদ্মা নদীর দিকে এখন আর আমি তাকাতে পারি না। বসনিয়া কিংবা কাশ্মীরের কথা ভাবলে মনে হয় 'মানুষ' শব্দটি লিখে লাথি দিই। আমার ক্রোধ ঘৃণা ভালবাসা মমতা–আমার কাছের-দূরের সব মানুষের কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে উপেক্ষিত অথবা ভুলভাবে উপস্থাপিত। সর্বোপরি আছে জ্যোৎস্না-রাতে সমুদ্র দেখতে দেখতে শরীর জুড়িয়ে যাওয়া মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার লোভ। কিন্তু তারপরও আমি যে আজও আত্মহত্যা করতে পারি নি, তার প্রমাণ তো এই লেখাটিই।

আমার আব্বা, আমার মেজো ভাই আর বড় দুলাভাই চেয়েছিলেন, আমি যেন ডাক্তার হই। আমি চেয়েছিলাম চে গুয়েভারা হতে। এই হতে চাওয়াটিও আমার আব্বার কারণে। তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানীর সরাসরি ছাত্র (মওলানা ভাসানী আসামে প্রথম জীবনে যে স্কুল খুলেছিলেন তার প্রথম ব্যাচের ছাত্র)। আর মা ছিলেন মওলানার মুরিদ। বংশানুক্রমিকভাবে মওলানা ভাসানী ও তার পরিবারবর্গের সাথে আমাদের সম্পর্ক।

এ সম্পর্কের কারণে শৈশব থেকে মেহনতি-মজলুম মানুষের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমি সজাগ হয়ে উঠি। একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়ি বাম রাজনীতিতে। কিন্তু সকল অবস্থায় সবকিছুর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে আমার কবিতা। কবিতা-জ্বরে আক্রান্ত আমি অবাধ্য হয়েছি প্রতিটি ক্ষেত্রেই। শেষ জীবনে আব্বা চেয়েছিলেন আমি অন্তত স্থির এবং সচ্ছল হই। মৃত্যুর সময় তা-ও তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

বার বার প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য আছে। কৈশোরে আমাদের গ্রামের দুধকুমার নদীর তীরে একজন আমাকে ধিক্কার দিয়েছিলো আমার সিদ্ধান্তহীনতার জন্যে। রংপুর আর ঢাকা শহরের অনেক অলিগলি, অনেক ঘরবাড়ি জানে আমার উড়নচণ্ডী জীবন ও সিদ্ধান্তহীনতার কথা, লক্ষ্যহীন জীবন যাপনের কথা, স্বপ্নহীন যাত্রার কথা। জানেন মহাজাতকও। তিনি জানেন বলেই বার বার বুকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছেন।

উনিশ শ' চুরানব্বই সালের ১০ ডিসেম্বরের গভীর রাতে যখন এ লেখাটি লিখছি তখন অকপটে স্বীকার করছি–সত্যি, মহাজাতক পারেন। পারেন বলেই আমার জীবনে এখন অস্থিরতার দাহ প্রায় অনুপস্থিত। পুরানা-পল্টনের সেই ইচ্ছা-অন্ধ মহিলাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি। লক্ষ্যহীন স্বপ্নহীন সিদ্ধান্তহীন–এ শব্দগুলো আমার জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে দ্রুত। আমি এখন সফলতার আনন্দে ভোরের শিশিরের মতো চিক্‌চিক্ করে উঠতে পারি। আবার ভালবাসার আসক্তি আমার হৃদয়ে।

এ হলো এমন এক পুলক, এমন এক জোছনা–যার প্রতিটি কণা মমতার রেণু দিয়ে বোনা। এই রেণুর মায়ায় আমার দিন যায়, রাত যায়। আর আমি ক্রমাগত সুন্দরের দিকে এগিয়ে যাই। সাফল্য আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি একের পর এক উপত্যকা পার হয়ে যাই, আর আত্মশক্তির অভূতপূর্ব জাগরণের ঢেউয়ে দুলে উঠি। ফলে উঠি।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন আমাকে বদলাতে শুরু করেছে। এখন সবসময় ভাবতে পারছি, আমি একজন প্রো-একটিভ মানুষ। শুধু আফসোস, ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, সে সময় যদি মেডিটেশন জানতাম, হয়তো দেশের জন্যে আরো কিছু করার সৌভাগ্য হতো।

মহাজাতক আমাকে অনন্য অসাধারণ অনাস্বাদিত অবর্ণনীয় অনির্বচনীয় সবুজ শ্যামল সজল শান্ত স্নিগ্ধ প্রাণপঙ্কময় প্রাণবন্ত এক অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মেডিটেশনের মাধ্যমে। তার কাছে আমার অশেষ ঋণ।

আর একটি কথা, আমার কখনোই শুধুমাত্র নিজের জন্যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে নি। এখনও করে না। মহাজাতকও তার জ্ঞান উৎসর্গ করেছেন মানুষের জন্যে। তাকে ভালো না বেসে উপায় কী?

[শততম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রফেসর ড. নুরুন্নবী লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন লন্ডন গিল্ডহল ইউনিভার্সিটিতে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বর্তমানে লন্ডন আইকন কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজির ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল।

নিয়মিত মেডিটেশন জীবনে আনে ইতিবাচক পরিবর্তন

প্রফেসর ড. নুরুন্নবী

তখন আমি লন্ডন গিল্ডহল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করি। দেখলাম লন্ডনে ব্যাঙের ছাতার মতো ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে দেখেছি, উন্নয়নশীল দেশের ছেলে-মেয়েরা লন্ডনে পড়াশোনার জন্যে আসে। কিন্তু তাদের দুর্দশার কোনো শেষ থাকে না।

আমি এবং আজিজুর রহমান সাহেব, এখন যিনি আইকন কলেজের ডাইরেক্টর, একসাথে মিলে চাইলাম সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির জন্যে কিছু করতে। পরিকল্পনা ছিলো ভোকেশনাল স্কিলভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার। কারণ আমরা দেখেছি, উন্নয়নশীল দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভোকেশনাল স্কিলের ঘাটতিটাই প্রকট থাকে।

২০০৪ সালে আমরা লন্ডনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। কলেজ শুরু করার অনুমতি নিতে সময় লেগেছিলো তিন মাস। এরপর বিজ্ঞাপন পর্ব এবং ১/২/৩ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়া। পূর্ব লন্ডনের এডলার স্ট্রিটে শুরু হলো আইকন কলেজ অফ টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্টের যাত্রা।

প্রথমে ছাত্রসংখ্যা ছিলো মাত্র ২০ জন। এদের মধ্যে ১২ জনই পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পায় এবং লন্ডন সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটি থেকে তারা সাফল্যের সাথে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে।

২০০৬ সালে গুরুজী কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করানোর জন্যে দ্বিতীয়বারের মতো লন্ডন আসেন। সেই কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয় আইকন কলেজ মিলনায়তনে। সে সময়ে তিনি একটি কথা বলেছিলেন–আইকন কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে। আজ সত্যিই তা-ই হয়েছে। আইকন কলেজের ছাত্রসংখ্যা এখন হাজারেরও বেশি। কলেজের জন্যে এখন আরও বেশি ক্লাসরুম এবং জায়গার প্রয়োজন।

এ সাফল্যের মূল কারণ হলো শিক্ষার গুণগত মানের ব্যাপারে আমরা সবসময় আন্তরিক ও সৎ সেবা দেয়ার চেষ্টা করেছি। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে যেমন মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, ফ্যাকাল্টি বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও আমরা সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি ভালো ও যোগ্য শিক্ষকদের।

কলেজ শুরু করার পর আমরা প্রথমে হায়ার ন্যাশনাল ডিপ্লোমা (HND) কোর্স চালু করলাম এবং তা ছিলো শুধুমাত্র ব্যবসায় শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে। এখন এ কোর্স আমরা ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজমসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শুরু করেছি।

শুধু তাই নয়, আমাদের কলেজে এখন আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGDNS) কোর্সও চালু করেছি। দুটো মাত্র কোর্স দিয়ে যে আইকন কলেজ যাত্রা শুরু করেছিলো সেখানে এখন কোর্সের সংখ্যা ৭টি।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে আইকন কলেজ একটি ভালো কলেজ হিসেবে স্বীকৃত। প্রচুর বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী আমাদের এখানে পড়ছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত পাকিস্তান মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড মায়ানমার নেপাল শ্রীলঙ্কা ঘানা ও নাইজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী এখন আমাদের কলেজে পড়াশোনা করছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বোর্ড (EdExcel) আইকন কলেজকে ডিএমএস এবং এইচএন্ডডি ডিগ্রি প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। EdExcel আমাদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্ট।

বাংলাদেশসহ ভারত পাকিস্তান শ্রীলংকা ও নেপালে আইকন কলেজের আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে আইকন কলেজ থেকে বাংলাদেশি

ছাত্রদের জন্যে স্কলারশিপও দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা কোর্স ফি-ও অনেক কম রাখি। HND কোর্স সম্পন্ন করতে টিউশন ফি প্রয়োজন হয় মাত্র ৩৫০০ পাউন্ড।

আমাদের ফুলটাইম কোর্স যেমন আছে তেমনি কর্মজীবী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা বিবেচনায় ইভিনিং এবং উইকএন্ড কোর্স আছে, আছে ফ্লেক্সিবল ক্লাস আওয়ারের সুযোগ। আইকন কলেজের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশের ছেলেমেয়েদেরকে লন্ডনে পড়াশোনা করতে সাহায্য করা।

সম্প্রতি বাংলাদেশে আইকন কলেজের নতুন আঞ্চলিক কার্যালয় চালু করা হয়েছে। লন্ডন সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির সাথে আইকন কলেজের যৌথ শিক্ষা-কার্যক্রম রয়েছে। দু'বছর আইকন কলেজে পড়ার পর শেষ বছর তারা সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারে। সেখান থেকে বিআইটি ম্যানেজমেন্ট এবং মোবাইল কমার্স বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রিও নিতে পারবেন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা।

আইকন কলেজ বর্তমানে নর্থাম্ব্রিয়া ইউনিভার্সিটির এলএলবি অনার্সের ওপেন লার্নিং প্রোগ্রামের একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র। আইকন কলেজের একজন ছাত্র ২০০৭ সালে সেরা মেডিকেল ল' স্টুডেন্ট হিসেবে লাভ করে 'নর্থ অব ইংল্যান্ড মেডিকো লিগেল সোসাইটি স্পেশাল প্রাইজ।'

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপনসহ সবকিছুতেই এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আগে আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপজনিত কিছু সমস্যা ছিলো আমার। ২০০৬ সালে কোর্স করার পর থেকে এসব এখন আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

প্রায় ৬০ বছর বয়সেও সপ্তাহের সাতদিনই আমি ১২ ঘণ্টা করে কাজ করি। মেডিটেশনই আমার মধ্যে এই প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে। আমি এখন পর্যন্ত ৪৮টি দেশ ভ্রমণ করেছি। প্লেনে ভ্রমণের সময়ও আমি মেডিটেশন করি। মেডিটেশন আমার মনের শক্তি, একাগ্রতা ও উদ্যম সবসময়ই বাড়িয়ে দেয়।

আসলে প্রত্যেকেরই প্রতিদিন মেডিটেশন করা উচিত। যে মানুষ নিয়মিত মেডিটেশন করে তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গুরুজীর কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে, তিনি কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনকে

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আইকন কলেজ কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির কার্যক্রমের জন্যে সবসময় উন্মুক্ত। গুরুজীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর পাশাপাশি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের জন্যে আন্তরিক শুভকামনা করি, যাতে মানুষের কল্যাণার্থে তিনি আজীবন কাজ করে যেতে পারেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সারাহ বিনতে সালেহ

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

হাজার মাইলের অভিযাত্রাও
শুরু হয় একটি ছোট
পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে।
তাই আপনার যা আছে
তা নিয়েই, যেখানে আছেন
সেখান থেকেই শুরু করুন।

সফল মানুষ
বিশ্বাসকে
গুরুত্ব দেন
আর ব্যর্থরা
বাস্তবতার
দোহাই দেয়।

ড. রওশন আরা ফিরোজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা। যুব উন্নয়ন গবেষক ও প্রশিক্ষক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবেও তিনি খ্যাতির অধিকারী। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩য় ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

নেতৃত্বের গুণাবলি ও কোয়ান্টাম

অধ্যাপিকা ড. রওশন আরা ফিরোজ

দর্শনের শিক্ষক হিসেবে গত ৩৩ বছর ছাত্রছাত্রীদের আমি ভারতীয় দর্শন পড়াই। ভারতীয় দর্শনের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে ধ্যান। কাজেই ধ্যান সম্পর্কে আমার জানা দীর্ঘদিনের হলেও এতদিন তা ছিল তাত্ত্বিক।

প্রথমবারের মতো বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো যখন ১৯৯৩ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথডের তৃতীয় ব্যাচে অংশগ্রহণ করলাম। সে অভিজ্ঞতা ছিলো খুবই আনন্দদায়ক। এত গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রশিক্ষককে এসে আমাকে ডেকে তুলতে হয়েছিলো।

গত ১২ বছর তাই যখনই কিছুক্ষণের জন্যে ফুরসত পেয়েছি, মেডিটেশন করে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নিয়েছি, হতাশাকে বিদায় করে ফিরিয়ে এনেছি প্রাণবন্ত মন। শুধু তাই নয়, আমার জীবনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি কোয়ান্টামের ইতিবাচক চেতনার আলোকে।

১৯৯৩ সালে এলো আরেক সংকট। আমার ব্রেস্ট-ক্যান্সার ধরা পড়লো। অপারেশন হলো। রেডিওথেরাপি, ওষুধ চলতে লাগলো। সে অবস্থায়ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কনসালট্যান্ট হিসেবে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দেশের আড়াইশটি উপজেলায়, কাজ করেছি প্রায় পাঁচশ যুব সংগঠনের সাথে। আর এর পেছনে কাজ করেছে আমার আশাবাদ আর লড়াকু মনোভাব।

কোয়ান্টামে এসে সে শক্তি যেন আরও শক্ত ভিত্তি পেলো। আর এর

সাম্প্রতিক সংযোজন হলো, প্রফেসর হয়ে যাওয়ার পরও ৫৯ বছর বয়সে পিএইচডি সম্পন্ন করা। দার্শনিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি এমন কিছু ধারণা লাভ করেছি–যা আমাকে এই ফাউন্ডেশন এবং এর নেতৃত্ব সম্পর্কে আবারও নতুন করে ভাবিয়েছে।

আমার থিসিসে আমি নেতৃত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছি। প্রথমত, কমিটমেন্ট অর্থাৎ চেতনার প্রতি বিশ্বাস, দ্বিতীয়ত, ক্যাপাসিটি অর্থাৎ চেতনাকে বিকশিত করার সামর্থ্য এবং তৃতীয়ত, কমিউনিকেশন অর্থাৎ চেতনার বিস্তৃতির জন্যে কার্যকর জনসংযোগ।

এই তিনটি ক্ষেত্রেই ফাউন্ডেশন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ১২ ব্যাচের এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে একজন বলছিলেন, "গত ১২ বছরে আমি সেভাবে যোগাযোগ রাখতে না পারলেও প্রতি জন্মদিনে ফাউন্ডেশন থেকে ঠিকই আমার ঠিকানায় চিঠি যায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে।" সত্যিই এটি সাংগঠনিক দক্ষতার প্রমাণ।

আমার থিসিসে শেষ দুটো লাইনে আমি বলেছি, A Philosophical, social and moral leader can use effective model for contributing character building among youths and set a paradigm of leadership for the future generation with the light of leadership qualities, a philosophical social and moral leader will lit thousands of candles of leadership.

ভাইভাতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে লিডারের কথা আপনি আপনার থিসিসে বলেছেন সেই সোশাল, ফিলসফিকাল এন্ড মোরাল লিডার কি সত্যিই আছে? আমি বলেছিলাম, 'প্রচলিত অর্থে যাদের আমরা নেতা হিসেবে চিনি তারা আসলে তথাকথিত নেতা। নেতৃত্বের নামে যুব সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র, মাদক আর হিংসার মন্ত্র। আর যে নেতার কথা আমি বলেছি তারা আছে। কিন্তু তাদের প্রচার নেই।'

কথাটা আমি হয়তো কোয়ান্টামের কথা ভেবেই বলেছিলাম। কারণ আমি জানি যে, প্রচলিত নেতৃত্ব যখন ঐ কাজগুলো করছে তখন ফাউন্ডেশন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে রক্তদান, নিরক্ষরতা দূর, সেবা, দান ইত্যাদি মহতী কাজে। তাই আমার থিসিসে বিবৃত সেই নেতাকে আমি খুঁজে পেয়েছি এই কোয়ান্টামেই।

সাক্ষাতকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

[২০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

এনটিভির প্রধান বার্তা-সম্পাদক খায়রুল আনোয়ার মুকুল। কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ২য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট। ২০০৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার কারওয়ান বাজারের বিএসইসি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় তিনি এনটিভির অফিসেই ছিলেন। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা ভবনের ১১ তলার ছাদে অবরুদ্ধ থাকার সময় কাছ থেকে দেখেছেন ভয়াবহ বিপদের মুখে মানুষের আতঙ্ক, উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তাকে। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন সেই রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার কথা।

কোয়ান্টামের সাথে একাত্মতা আমাকে অন্যের প্রতি সমব্যথী হতে শিখিয়েছে

খায়রুল আনোয়ার মুকুল

ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকার একটি ১১ তলা ভবনের ছাদ। রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক আর সীমাহীন অনিশ্চয়তা নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে দেড় শতাধিক নারী-পুরুষ। আতঙ্কের কারণ–কেউ জানে না পরের মুহূর্তে কী ঘটবে। উদ্ধার পেয়ে ফিরে যেতে পারবেন নিরাপদ জীবনের কোলে, না কি এ দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত সহকর্মীদের তালিকায় তার নামটিও যুক্ত হবে। কেউ অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন আর কেউ বা নির্বাক হয়ে গেছেন ঘটনার আকস্মিকতায়।

২০০৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার কারওয়ান বাজারের বিএসইসি ভবনে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে তারই বর্ণনা দিচ্ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এনটিভির প্রধান বার্তা-সম্পাদক খায়রুল আনোয়ার মুকুল। বেলা ১১টার দিকে সহকর্মীদের নিয়ে যখন তিনি দুপুরের বুলেটিন প্রচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, হঠাৎ শুনতে পান ভবনে আগুন লেগেছে। এনটিভির সাড়ে তিনশ কর্মীর মধ্যে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন একশ'র বেশি কর্মী। অবস্থা বেগতিক দেখে

এনটিভির নির্বাহী-পরিচালক হাসনাইন খুরশীদকে নিয়ে তারা সবাই উঠে যান ১১ তলা ভবনের ছাদে।

বেলা সাড়ে ১০টার দিকে ভবনটির দোতলায় এক রান্নাঘর থেকে সম্ভবত আগুন লাগে। পরবর্তী দু'ঘণ্টায় তা ছড়িয়ে পড়ে ভবনের ৯, ১০ এবং ১১ তলাতেও। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ফলে যে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর দম বন্ধ করা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সিঁড়ি বা লিফট ব্যবহার করে কোনোমতেই নেমে আসা সম্ভব নয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মানুষ তাই ছুটছিলো ১১ তলার ছাদে।

এদিকে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার জন্যে ইতোমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছে ফায়ার-সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পাশাপাশি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও রেড ক্রিসেন্ট। চলে এসেছে বিমান বাহিনীর দুটি হেলিকপ্টারও। কিন্তু হেলিকপ্টারের বাতাসে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ছে দেখে তা একসময় সরিয়ে নেয়া হয়।

সরকারি এ ভবনটিতে ছিলো এনটিভি, আরটিভি, ইসলামিক টিভি, দৈনিক আমার দেশ, ড্যান্ডি ডাইংসহ অর্ধশত বাণিজ্যিক অফিস। আর ঘটনার সময় ভবনটিতে ছিলেন সেখানকার কর্মী ও বহিরাগত মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক মানুষ। আগুন থেকে বাঁচতে বিভিন্ন তলা থেকে দড়ি বেয়ে যারা নিচে নামছিলেন তাদের অনেকেই আতঙ্কে ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়েন মাটিতে। দুজন মারা যান এভাবেই। এদিকে ভবনের কয়েকটি ফ্লোরে এসির গ্যাস বিস্ফোরণের ফলে আগুনের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। জানালার কাঁচ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে নিচে পড়তে থাকে।

বেলা বারোটার দিকে দমকল কর্মীরা একটি হাইড্রলিক মই লাগিয়ে ভেতরে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করা শুরু করেন। ক্রেনের খাঁচায় ৪/৫ জন করে নামানো শুরু হয়। একপর্যায়ে ছাদ পর্যন্ত লাগানো হয় লম্বা সিঁড়ি। সেখানে লাগানো মই দিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে একে একে আটকে পড়া লোকদের নামানো হয়। সবার শেষে নেমে আসেন খায়রুল আনোয়ার মুকুল।

সেদিনের শ্বাসরুদ্ধকর সেই ৪টি ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত তার কেটেছে নতুন নতুন উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কখনো সহকর্মীদের সাহস যোগাচ্ছেন, কখনো মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন, কখনো উদ্ধারের আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়া জনতাকে সামলানোর চেষ্টা করছেন, কখনো বা

চোখের সামনেই দেখছেন দড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করা কাউকে হাত ফস্‌কে পড়ে যেতে। দেখেছেন একটু মুক্ত বাতাসের জন্যে মানুষের সে কী প্রচণ্ড আকুতি—জীবনের আর সব কিছু তখন তুচ্ছ এ প্রয়োজনের কাছে।

প্রচণ্ড রোদ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তৃষ্ণার্ত মানুষ ছাদের একটি টয়লেটের ট্যাপের পানি থেকেই গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। এতকিছুর মাঝে যে চেহারাটা বার বার তার চোখে ভেসে উঠছিলো তা হলো তার একমাত্র মেয়ে মাশিয়াত আনোয়ার অর্পিতার মুখখানি। সেদিন ছিলো অর্পিতার ৮ম জন্মদিন। জন্মদিনে তার প্ল্যান ছিলো সকালে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে কেক কাটবে আর বিকেলটা মা-বাবাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খায়রুল আনোয়ার মুকুলের হঠাৎ সেকথাই মনে পড়লো। আজ যদি বেরুতে না পারেন, যদি আরো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে, তাহলে মেয়েকে দেয়া কথা রাখতে পারবেন না ভেবে বুকটা ব্যথায় মুচড়ে উঠলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। এনটিভির একজন সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে অন্তত তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দায়িত্ব তার কাঁধে। তিনি হয়তো শারীরিকভাবে তাদের উদ্ধারে সহযোগিতা করতে পারছেন না। কিন্তু তাদেরকে এভাবে রেখে স্বার্থপরের মতো একা একা নেমে যাবেন না কিছুতেই। তিনি এবং তার পেছনে এয়ার ফোর্সের দুজন উদ্ধারকর্মী—এই ছিলো সেদিনের ১১ তলা থেকে মই বেয়ে নেমে আসা সর্বশেষ ৩ জন।

কেন এই কর্তব্যপরায়ণতা? উত্তরে খায়রুল আনোয়ার মুকুল বললেন, আমার জীবনটাও এক লড়াকু জীবন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড ইয়ারের ছাত্র, তখনই বাবা মারা যান। ১২ ভাইবোনের মধ্যে আমি তৃতীয় এবং আমার পরে আরো ৯টি ভাইবোন। প্রত্যেকেই তখনো লেখাপড়া করছে। কেউ স্কুলে, কেউ কলেজে, কেউ মেডিকেলে। নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের লেখাপড়ার দায়িত্বও নিতে হয়েছিলো। ওরাও অবশ্য একে অন্যকে সহযোগিতা করেছে।

অর্থাৎ পারিবারিকভাবেই আমি বেড়ে উঠেছি পারস্পরিক সহযোগিতার একটা পরিবেশে। এরপর সাংবাদিকতা পেশার সুবাদে অনেক মহৎ মানুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। সুযোগ হয়েছে মহাজাতক এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম হওয়ার। এ অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে অন্যের দুঃখে-বিপদে সমব্যথী, সহযোগী হতে শিখিয়েছে।

খায়রুল আনোয়ার মুকুল অবশ্য মনে করেন না যে, তিনি খুব বড় কিছু করেছেন। তার ভাষায়, তিনি যা করেছেন তা কেবল দায়িত্ব পালন মাত্র। কিন্তু চারপাশের বেশিরভাগ মানুষই যখন ছুটছে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার মোহে অন্ধ হয়ে, তখন এ মানবিকতার, এ সাহসের মূল্য নিঃসন্দেহে দায়িত্ব পালনের চেয়ে আরো বেশি কিছু। এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে তিনি সবার সামনে এক অনুসরণীয় নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেছেন। জাতীয় জীবনে এখন এমন বীরেরই প্রয়োজন।

সাক্ষাতকার গ্রহণ : রাবিয়া নাজরীন

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, এপ্রিল ২০০৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

যত সামান্য উপকার
হোক না কেন
আজ থেকেই তা
শুরু করুন।
অন্যের কল্যাণে
কাজ না করলে
নিজের কল্যাণও
করা যায় না।

বুদ্ধিমান
প্রতিকারের
চেষ্টা করে।
আর নির্বোধ
প্রতিবাদ ও
হৈচৈ করে
সময় নষ্ট করে।

হাসি চক্রবর্তী। খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ও চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। ৪৫ বছরের সুদীর্ঘ শিল্পীজীবনে তিনি এঁকেছেন বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি আর ষড়ঋতুর ছবি। বাংলাদেশসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তার একক ও যৌথ প্রদর্শনীর সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। শিল্পী হাসি চক্রবর্তী কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

কোয়ান্টাম আমার চিন্তাজগৎকে বদলে দিয়েছে

শিল্পী হাসি চক্রবর্তী

১৯৮২ সালের কথা। শিল্পীগুরু রশীদ চৌধুরী স্যার একদিন বললেন, 'হাসি, চলো তোমাকে আজ একজন মজার মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। তিনি নিজে যেমন সবসময় হাসেন তেমনি অন্যদেরও হাসান।' স্যারের কথা শুনে মানুষটাকে দেখার খুব আগ্রহ হলো।

স্যার আমাকে নিয়ে গেলেন অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার অফিসে। বিচিত্রার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রয়াত শাহাদাৎ চৌধুরীর রুমে ঢুকে দেখি, তার সাথে কথা বলছেন কালো আলখাল্লা পরা হাস্যময় প্রাণবন্ত একজন মানুষ। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই মহাজাতককে আমার খুব ভালো লেগে গেল।

এ ঘটনার প্রায় ৩০ বছর পর কোয়ান্টামের কোর্সে এসে আমার মনে হয়েছে, আরো আগে কেন এলাম না। গুরুজীর কথা আর বাচনভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। প্রতিটি বিষয় বোঝানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দটি ব্যবহার করে কত সহজেই না তিনি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

কোর্সে প্রথমদিন থেকেই আমার খুব ভালো লেগেছে। আর মেডিটেশন আসলে আলৌকিক কোনো ব্যাপার নয়। মেডিটেশন খুব সহজেই অস্থির

মনকে প্রশান্ত ও স্থির করে তোলে। আমরা যে গভীর মনোযোগে ছবি আঁকি সেখানেও মেডিটেশনের একটি বড় ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি। তাই একজন শিল্পী হিসেবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এটি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

শিল্পী হতে চেয়েছিলাম কি না জানি না, তবে ছোটবেলা থেকেই আমি ছবি আঁকতাম। ছবি হতো কি না তা-ও জানি না, শুধু মনের আনন্দে একের পর এক এঁকে যেতাম। স্কুলে স্যার হয়তো অংক করাচ্ছেন–৫ মন দুধের সাথে ১ মন পানি মিশিয়ে ৬ মন করা হলো। তারপর সেই ৬ মন দুধ বাজারে নিয়ে এক হাজার টাকায় বিক্রি করা হলো। সবাই যখন অংক করতো আমি তখন খাতার পৃষ্ঠা জুড়ে অংকে বর্ণিত পুরো ঘটনাটির ছবি আঁকতাম।

ছবি আঁকায় আমার প্রথম স্বীকৃতি মেলে যখন আমি বরিশাল বি এম স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। বরিশাল জেলায় কৃষি ও শিল্পপণ্য প্রর্দর্শনীতে সে বছর আমি চারুকলা বিভাগে অংশগ্রহণ করলাম। আমার আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় পুরস্কার পেল। ৫০ টাকা পুরস্কার পেলাম। আনন্দে একদৌড়ে বাড়ি ফিরে মাকে দিলাম খবরটা। আমার খুশি দেখে মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মেট্রিকটা পাশ কর, তোকে ঢাকার আর্ট কলেজে ভর্তি করে দেবো।

মেট্রিক পরীক্ষার পর ’৬৭ সালে ঢাকা আর্ট কলেজে ভর্তি হলাম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন তখন আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। ফার্স্ট ইয়ারে তিনি একদিন আমাদের ক্লাসে এসে সবাইকে ব্লাকবোর্ডে বৃত্ত আঁকতে বললেন। আমরা একজন একজন করে ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে বৃত্ত আঁকছি। কিন্তু কারোটাই হচ্ছে না। কেউ আঁকছে ডিমের মতো, কেউবা লম্বাটে। আবেদীন স্যার তখন বললেন, তোমরা সবাই পারবে। আগে মনটাকে স্থির করো, মনের পটে আঁকো, তারপর বাস্তবে আঁকো। জয়নুল আবেদীন স্যারের কাছ থেকে জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় এমন অনেক কিছুই শিখেছি। স্যারের সেই কথাগুলো আজো একইরকমভাবে আমার কানে বাজে।

অসাধারণ জীবনবোধ আর শিল্পচেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষদের আমরা সেই সময় ঢাকা আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে জয়নুল আবেদীন স্যারের ওপর একটি গবেষণামূলক কাজের সূত্রে তার সাথে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি, ঘুরে বেড়িয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। স্যারের সাথে একবার ময়মনসিংহ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো আমার। স্যার তখন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে গাছের ছায়ায় বসে বহমান নদীর স্রোত দেখতেন, মাঝি-মাল্লার গান শুনতেন। আর বলতেন–‘দেশকে ভালবাসো হাসি, দেশের

মানুষকে ভালবাসো।' এ কারণেই কি না জানি না, দেশ ছেড়ে যাবার কথা কখনো ভাবি নি।

সবসময় মনে হতো, আমার দেশই আমার জন্যে ভালো। আমার দেশের মানুষ ও প্রকৃতির ছবি যদি আমি আঁকতে পারি তবে মনে করবো, দেশের জন্যে আমি কিছু করতে পেরেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন কোলকাতায় ছিলাম তখন বাংলাদেশি শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হবে জেনে শত অনটনের মধ্যেও ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলাম। কোলকাতা, দিল্লী ও বোম্বেতে প্রদর্শিত এ ছবিগুলো আমি এঁকেছিলাম পেন্সিল আর চারকোল দিয়ে–দেখেই বোঝা যেত এগুলো কোনো দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পীর আঁকা ছবি।

সদ্যপ্রয়াত শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া স্যার ছিলেন আমার আরেকজন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। তিনি বলতেন, ছবি আঁকার ব্যাপারে সবসময় সৎ থাকতে হয়। ছবি আঁকা ও রং লাগানোর সময় কখনোই ফাঁকি দেয়া চলবে না, গোঁজামিল দেয়া যাবে না। তার এ কথাটা আমি প্রথম থেকেই মেনে চলার চেষ্টা করেছি। আমার আজকের শিল্পচেতনা, শিল্পভাবনা ও ভালো ছবি আঁকার পেছনে এঁদের প্রত্যেকেরই অবদান রয়েছে।

আমার শিল্পীজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব যার তিনি হলেন শিল্পীগুরু রশীদ চৌধুরী স্যার। তার সাথে যখন আমার পরিচয় তখন আমি আর্ট কলেজে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ঢাকায় একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করি আর পত্রিকায় কার্টুন আঁকি। এমন সময় একদিন বিকেলে আর্ট কলেজ চত্বরে স্যারের সাথে পরিচয়। তিনি তখন সদ্য ফ্রান্স থেকে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় মাস্টার্স চালু করেছেন। দেশে তখন এ বিষয়ে মাস্টার্স করার কোনো সুযোগ ছিলো না, এজন্যে বিদেশে যেতে হতো।

১৯৭৩ সালে ঢাকায় তরুণ শিল্পীদের চিত্রকর্ম নিয়ে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে রশীদ চৌধুরী স্যার আমাদের তিন বন্ধুর আঁকা ছবি দেখে বললেন, এখানে থেকে কী করবে? আমার সাথে চট্টগ্রাম চলো, চারুকলায় মাস্টার্স করবে।

স্যারের আহ্বানে একসময় ঢাকার পাততাড়ি গুটিয়ে আমরা তিন বন্ধু চট্টগ্রামের পথে যাত্রা করলাম। স্যার চট্টগ্রামে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন প্রথমে আঁলিয়স ফ্রঁসেজ ও পরে শিল্পকলা একাডেমির কলাভবনে। এ কলাভবনটি তখন উদ্বোধন করেছিলেন ফরাসী মনীষী আঁদ্রে মালরো। তিনি রশীদ চৌধুরী স্যারকে খুব পছন্দ করতেন এবং মূলত স্যারের আমন্ত্রণেই তিনি চট্টগ্রাম এসেছিলেন।

রশীদ চৌধুরী স্যার ছিলেন অদম্য একজন মানুষ, কোনো কিছুতেই দমে যেতেন না। স্যারের এই উদ্যম জীবনভর আমাকেও প্রাণিত করেছে। তার কাছ থেকে জীবনে আমি শিক্ষা এবং দীক্ষা দুটোই পেয়েছি। কোয়ান্টামের যাত্রাশুরুর সময়টিতেও গুরুজী এবং তার কাজের সাথে স্যার নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

কোয়ান্টাম কোর্সে আমি এসেছিলাম নিতান্তই কৌতূহলবশত। কিন্তু এখানে এসে পেলাম অনেক কিছুই। এখন আমার চিন্তাজগতে একটি পরিবর্তন অনুভব করছি। সবচেয়ে বড় কথা, আগে খুব অল্পতেই রেগে যেতাম, উত্তেজিত হয়ে পড়তাম; সেটা এখন আর হয় না। আর লামার শিশুদের ভিডিওটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে, গুরুজী যেভাবে এই শিশুদের মানুষ করছেন, বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন–এ থেকেই তো অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, জুলাই ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মনোযোগ ও নিমগ্নতাই
প্রতিটি কাজের
একঘেয়েমি দূর করে।
কাজই হয়ে ওঠে তখন
আনন্দের উৎস।

প্রতিটি বিষয়কে
পুরোপুরি গ্রহণ করুন।
তাহলেই আপনি এ থেকে
পরিপূর্ণ শিক্ষা
নিতে পারবেন।

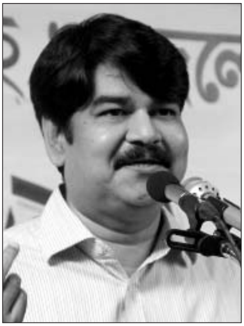

সুজিত মোস্তফা। বিশিষ্ট নজরুলসংগীত শিল্পী ও নজরুলসংগীতের একজন সংগঠক। নজরুলসংগীত শিল্পী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেশব্যাপী নজরুলের গানের প্রচার ও প্রসারে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। নজরুলসংগীতের পাশাপাশি সুজিত মোস্তফা গেয়েছেন রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গান। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

কাউকে না কাউকে তো সত্য বলতে হবে

সুজিত মোস্তফা

পণ্ডিত রবিশঙ্করের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকের ঘটনা সেটা। দিল্লীর শিরিফোর্ট অডিটরিয়ামে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানের একটি পর্বে পণ্ডিত বিরজু মহারাজের কত্থক নাচের সঙ্গে আমি ৬টি গান গেয়েছিলাম। ঠুমরি, ভজন আর গুরুবন্দনা ধাঁচের সেই গানগুলোর সাথে তবলা বাজাচ্ছিলেন ওস্তাদ জাকির হুসেন।

ভারতের তাবৎ গুণী শিল্পীরা সেদিন সমবেত হয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। মঞ্চের ঠিক সামনেই দর্শক সারিতে বসেছিলেন ওস্তাদ আল্লারাখা, ওস্তাদ বেলায়েত হোসেন খাঁ এবং খ্যাতনামা আরও অনেকে।

আমার গানের পর পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার সন্তুর-বাদন চলছিলো, আর আমি মঞ্চের পেছনে গ্রিনরুমে ঘোরাফেরা করছিলাম। তখন কে একজন এসে খবর দিলো, ওস্তাদ আল্লারাখা আমার খোঁজ করছেন। শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম, গান গাইতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি কোনো ভুল করে ফেলেছি, তাই হয়তো আমাকে ডেকে নিয়ে তিনি বকাবকি করবেন যে, এত বড় একটা অনুষ্ঠানে এত গুণী মানুষের সামনে কী গেয়েছো তুমি, তা-ও

আবার ওস্তাদ জাকির হুসেন আর পণ্ডিত বিরজু মহারাজের সঙ্গে।

এসব ভেবে আমি আর তার সামনে পড়তে চাইছিলাম না। আল্লারাখা যেদিকে যান আমি অন্যদিকে যাই। এই পালানো চলছিলো অনেকক্ষণ ধরেই। হঠাৎ একসময় টের পেলাম আমার পিঠে কারো হাত, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি ওস্তাদ আল্লারাখা দাঁড়িয়ে। ভড়কে গিয়ে আমি তার পায়ে পড়তে গেলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন–'বেটা, কিত্না বড়ি আওয়াজ, কিত্না আচ্ছা গাতে হো...'

এটি আমার শিল্পীজীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হলেও, স্রষ্টা যে আমাকে গান গাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি যে গাইতে পারি–এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। গান গাওয়ার সময় আমি একটি সুন্দরের জগতে থাকি এবং প্রতিদিন আমার সেই জগৎ পরিভ্রমণের সুযোগ হচ্ছে যা আমার সবচাইতে বড় আনন্দ।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমি অনেক কিছুর সাথেই ছিলাম, কিন্তু গানের সাথে ছিলাম সবসময়ই। আমি যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি তখন আমরা থাকতাম পাবনায়। আমাদের বাড়ির অদূরেই ছিলো 'বাণী সিনেমা হল'। প্রতিদিন ওখান থেকে সিনেমার গান ভেসে আসতো। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। গানের প্রতি আমার অনুরাগের শুরুটা বুঝি তখন থেকেই।

শৈশবে রাজশাহীতে অনুপ কুমার দাসের কাছে হাতেখড়ির পর থেকে দেশে ও বিদেশে বেশ কজন গুণী সংগীতজ্ঞের কাছ থেকে আমি সংগীতে দীক্ষা নিয়েছি–চট্টগ্রামে মিহির লালা, ঢাকায় মিথুন দে, ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ, আখতার সাদমানী, শান্তিনিকেতনে সিতাংশু রায়, মোহন সিং, দিল্লীতে পণ্ডিত অমরনাথ, শ্রীমতি শান্তি হীরানন্দ, পণ্ডিত বিনোদ কুমার, ওস্তাদ হাফিজ আহমেদ খান প্রমুখ।

একেকজনকে একেকটা ধারা টানে, তেমনি নজরুলের গানের সুরবৈচিত্র আমাকে আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশি। কারণ নজরুলের গান অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং, সুরের ওপর বেশ দখল লাগে। আর বাস্তব পৃথিবীর একজন মানুষ হয়েও কাল্পনিক যেকোনো চরিত্রের চাইতে নজরুল ছিলেন অনেক বেশি বৈচিত্রময় ও বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত। নজরুল একদিকে যেমন ছিলেন তীব্র আবেগময়, তেমনি অসম্ভব ক্ষমতাশালী আর যুগ পরিবর্তনকারী একটি চরিত্র। এসব কারণে সেই ছোটবেলাতেই নজরুল আমার আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। আমার মনে হতো, তার গান যদি একটু গাইতে পারি তবে হয়তো তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যাবে।

আমার শিল্পীসত্তা আর সামগ্রিক জীবনবোধে আমার বাবার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আমার বাবা খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিক ও গীতিকার প্রয়াত আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। তিনি ছিলেন নীতিবান ও স্পষ্টবাদী। সত্য কথাটা তিনি সবসময় অকপটভাবে সৎ সাহসের সাথে উচ্চারণ করতেন। বাবার এ আদর্শটা আমি নিজের মধ্যেও অনুভব করি, অনুসরণ করি। কাউকে না কাউকে তো সত্য কথাটা বলতে হবে। আমার মেডিটেশন কোর্সে আসার এটাও একটি কারণ; আমি বুঝতে চাই যে, আমি কি এভাবে বলেই যাবো, নাকি আগে মেডিটেশন করে ধৈর্য ও আত্মশক্তিতে সংহত করে তুলবো নিজেকে।

মেডিটেশন কোর্সে এসে ৪টি দিন আমি মুগ্ধ হয়ে গুরুজীর কথা শুনেছি। আমার মনের কথাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে কত সুন্দরভাবেই না তিনি বললেন। তাই মেডিটেশনের পাশাপাশি গুরুজী ও কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও আমি একাত্মবোধ করেছি। আর মেডিটেশন করে তাৎক্ষণিক যে উপকারটা আমি পাচ্ছি তা হলো প্রাণশক্তি। ইদানীং একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম, মেডিটেশন সেই ক্লান্তিটা ঘুচিয়ে আমাকে প্রাণবন্ত করে তুলছে।

সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো–মেডিটেশন এখন আমাকে টানছে। সকাল হলেই মেডিটেশনের ব্যাপারে ভেতর থেকে যেন একটা আকুতি অনুভব করছি। প্রাণবন্ততার এই আনন্দটুকু নিয়েই আমি প্রতিদিন সকাল-বিকেল দু'বেলা মেডিটেশন করছি।

মেডিটেশন আমাদের মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে একটি জায়গায় নিয়ে আসে। মন তখন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মনে একটি বিশ্বাস জন্ম নেয়। আর এ বিশ্বাসটা থাকলে কোনো বাধাই তখন আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসে উজ্জীবিত হওয়ার পদ্ধতিগুলোর সাথে সাধারণভাবে আমরা পরিচিত নই, মেডিটেশন সেই পদ্ধতিগুলোই আমাদের শেখায়।

আমি যখন গান গাই তখন আমার মনের পটে সুরের একটি চিত্রকল্প রচিত হয়। আমি সেই সুরের ধ্যানে নিমগ্ন হই, অবগাহন করি। সংগীতের এ নিমগ্নতায় একটি দায়বদ্ধতা থাকে–গানটা ভালো হতে হবে, সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে, হোক তা নিজের কিংবা অন্যের আনন্দের জন্যে। কিন্তু শিথিলায়নের আনন্দময় জগতে সে ভাবনাটুকু থাকে না। আমার মধ্যে তখন যে প্রশান্তিটা আসে, সৌন্দর্যের যে অনুভূতি ও আলোয় আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি তা আমার গানের ধ্যানকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তুলবে বলে

আমি মনে করি।

গান, ছবি আঁকা কিংবা খেলাধুলা–সব ধরনের কাজের জন্যেই চাই কিছু বিশেষ বিশেষ দক্ষতা কিংবা যোগ্যতা। কিন্তু মেডিটেশন কোর্সে আসার জন্যে কোনো বিশেষ যোগ্যতা বা ক্ষমতার দরকার নেই। কারণ প্রত্যেক মানুষেরই সুস্থির হওয়ার, শান্তি-সুখে উজ্জীবিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কোয়ান্টামে এসে আমিও তাই দেখলাম, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার হাজারো মানুষ এখানে এসেছেন, একসাথে মেডিটেশন করছেন।

কোয়ান্টাম অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে একজন মানুষের মধ্যে সৎ চিন্তাকে প্রোথিত করছে, আত্ম উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছে। আর আত্ম উন্নয়ন যার হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথাও চিন্তা করবেন।

তাই আমার বিশ্বাস, মেডিটেশনের মাধ্যমে মানুষকে শুধু শান্তির সন্ধান দেয়াই নয়, আমাদের সবাইকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে একটি বৃহত্তর কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়াই কোয়ান্টামের মূল উদ্দেশ্য।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, অক্টোবর ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

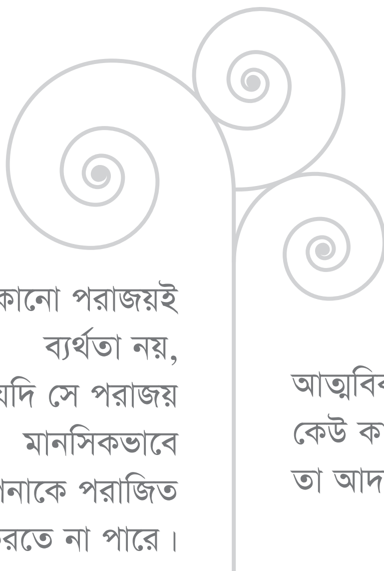

কোনো পরাজয়ই
ব্যর্থতা নয়,
যদি সে পরাজয়
মানসিকভাবে
আপনাকে পরাজিত
করতে না পারে।

আত্মবিকাশের অধিকার
কেউ কাউকে দেয় না।
তা আদায় করে নিতে হয়।

ইনামুল হক খান। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও বর্তমানে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে অনন্ত গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের আজকের প্রাচুর্যশীর্ষ অবস্থান মূলত তার মেধা, পরিশ্রম আর আন্তরিক প্রচেষ্টারই ফল। বর্তমানে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইনামুল হক খান কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

সাফল্য এসেছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়

ইনামুল হক খান

১৯৯৩ সালে ভগ্নিপতির আকস্মিক মৃত্যুর পর এক চরম দুঃসময়ে অনন্ত গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের হাল ধরতে হয় আমাকে। এর আগে ১৫ বছর জাহাজে চাকরি করেছি, চাকরিসূত্রে অধিকাংশ সময়ই কাটতো সমুদ্রে। তাই ব্যবসায় আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না।

আর আমি যখন ব্যবসা শুরু করি তখন স্টক-লট ও প্রচুর ঋণসহ অনন্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ব্যবসার অবস্থাও দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। দিনে ১৬/১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করে আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে কোনোমতে ব্যবসা চালিয়ে নিচ্ছিলাম।

এ সময় ব্যবসায়ী বন্ধু মরহুম সর্দার নুরুজ্জামান ও তার স্ত্রীসহ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ দিলেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করার। ১৯৯৬ সালে স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। ৪ দিনে কি হলো জানি না; শুধু এটুকু বুঝলাম—আমার চিন্তায়, আমার কাজে এসেছে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

আগে কিছুটা বদমেজাজী মানুষ ছিলাম। কোর্স করে শিখলাম কীভাবে

ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হয়। আগে কাজ করতাম ঠিক, কিন্তু সামনে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিলো না, কোর্স করার পর ভেবেচিন্তে লক্ষ্য স্থির করতে শিখলাম। সিদ্ধান্তগুলোও হচ্ছিলো আগের চেয়ে সঠিক ও সময়োপযোগী। সব মিলিয়ে আমার চারপাশে এক ইতিবাচক পরিবর্তন ও কর্মচাঞ্চল্য সূচিত হলো।

পরবর্তী ব্যাচেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের ৬ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে উদ্বুদ্ধ করে কোর্সে পাঠালাম। ফ্যাক্টরিতে একটি রুমে বসে আমরা সবাই একসাথে মেডিটেশন করতাম।

সেই থেকে শুরু। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। ২ বছরের মধ্যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল। তখন যে কাজে হাত দিচ্ছি তা-ই একটা ভালো ফলাফলের দিকে যাচ্ছিলো। অনন্ত ফ্যাশন, অনন্ত স্পোর্টস ওয়ার–একের পর এক যুক্ত হতে লাগলো নতুন নতুন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। কোয়ান্টাম কোর্স করার পর আমার চিন্তা ও কাজের ধারায় পরিবর্তন আসার সাথে সাথে ভাগ্যও সহায় হয়ে উঠেছিলো।

এলিফ্যান্ট রোডের সীমিত পরিসর ছেড়ে একসময় ফ্যাক্টরি স্থানান্তরিত হলো আশুলিয়ায়। যেখানে ৯ তলা ভবনের প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ৪০ হাজার বর্গফুট। আমি যখন দায়িত্ব নিই তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো ১২শ, যা এখন ১২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারার আনন্দ-অনুভূতিই আমাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত শক্তি যোগায়।

অনন্ত গ্রুপের আজকের এ সমৃদ্ধির পেছনে আরেকটি কারণ হলো–প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যকার গ্রুপ-ফিলিংস বা সঙ্ঘবদ্ধতার অনুভূতি। এখানে কেউই নিজেকে শুধু একজন কর্মী মনে করে না, বরং প্রত্যেকেই মনে করে, সে অনন্ত পরিবারেরই একজন সদস্য। কাজের পাশাপাশি এখানে কর্মীদের জন্যে রয়েছে সুস্থ বিনোদনচর্চা, গান ও খেলাধুলার ব্যবস্থা। কর্মীদের সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেও রয়েছে নানামুখী কার্যক্রম।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিবছর বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় এবং এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। অনন্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ৯ তলা ভবনের প্রতিটি ফ্লোরের নামকরণ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ এবং দুজন

মহিলা বীরপ্রতীক তারামন বিবি ও সিতারা বেগমের নামে। ফ্যাক্টরির ৪০টি প্রোডাকশন লাইনের নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশের ৪০টি নদীর নামে।

জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির জন্যেও কর্মীদের সবাইকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কোম্পানির লোগো সম্বলিত মগ উপহার দিয়ে। এছাড়াও আমাদের রয়েছে রক্তদান কর্মসূচি যার মাধ্যমে আমরা এ পর্যন্ত মুমূর্ষু রোগীদের জন্যে সাড়ে ৪শ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করেছি।

আশুলিয়ায় আমাদের ফ্যাক্টরির পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানীয় দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্যে অনন্ত গ্রুপের পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছে বিশেষ স্কুল–'আমরাও পারি'। এখানে দরিদ্র ও বঞ্চিত পরিবারের শিশুদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, জামা-কাপড় ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ দেয়া হয়। আমরা একে বলি 'স্কুলে যাবার স্কুল'। এখান থেকে শিশুদের স্কুলে যেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসব কাজ হয়তো আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আমরা এ কাজগুলো করি। ব্যবসার পাশাপাশি সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাধ্যমতো এ সেবা আমাদের সাফল্য ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

১৫ বছর আগে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার মধ্য দিয়ে আমি পরিণত হয়েছিলাম এক নতুন মানুষে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা ছিলো–রাতারাতিই যেন সবার প্রিয় এবং পছন্দনীয় একজন মানুষ হয়ে উঠলাম।

নিজের ব্যক্তিত্বে পরিবর্তনের পাশাপাশি কোম্পানির জন্যে স্বীকৃতি এবং সম্মানও এসেছে একের পর এক। ২০০২ সালে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে অনন্ত গ্রুপকে দেয়া হয় 'বেস্ট এক্সপোর্টার অফ দি ইয়ার' পুরস্কার। পোশাক বাণিজ্যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট বিশ্বজুড়ে তাদের অসংখ্য সাপ্লাইয়ারের মধ্য থেকে ২০০৪ সালে অনন্ত গ্রুপকে 'বেস্ট সাপ্লাইয়ার অফ দি ইয়ার' ঘোষণা করে।

২০০৮ সালে সারাদেশের মধ্যে অনন্ত গ্রুপ শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি চর্চাকারী কোম্পানি নির্বাচিত হয়। এ সাফল্যযাত্রার সূত্র ধরেই এ বছর আমরা রপ্তানি আয়ে ৪০ মিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারবো বলে আশাবাদী।

কোয়ান্টামের শিক্ষার অনুরণন পুরো প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দিতে কোম্পানির

খরচে যাদের কোর্স করিয়েছি পরবর্তীতে তারা সবাই কোম্পানির সম্পদে পরিণত হয়েছেন। 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' সহ কোয়ান্টামের আলোকিত জীবনের বাণীগুলো নিয়ে নানা ফেস্টুন রয়েছে ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ফ্লোরে। ডাইনিংয়ে রয়েছে কোয়ান্টামের খাবারের প্রার্থনা।

এখান থেকে প্রতিদিন প্রকাশিত 'টুডে' নামে একটি ই-বুলেটিনে থাকে কোয়ান্টাম কণিকার কোনো একটি বাণী, যা সকালে অফিসে এসে কম্পিউটার অন করে সবাই দেখে নেন। এভাবে কোয়ান্টামের শিক্ষার আলোকে একজন মানুষকে ভালো এবং সচেতন মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করি। যাতে সে শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্যেই নয়, দেশের জন্যেও সম্পদ হয়ে উঠতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, ডিসেম্বর ২০১০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

মেধার সঙ্গে যুক্ত হয়েই
শ্রম রূপান্তরিত হয় সেবায়।
সেবা ছাড়া যে অর্জন
তা কখনো সম্পদে
রূপান্তরিত হয় না।

ব্যর্থরা অবচেতনভাবে
ব্যর্থতার সঙ্গে
নিজেদের সংযুক্ত করে।
সচেতনভাবে সাফল্যের সঙ্গে
একাত্ম হলে সাফল্যই
আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে।

এবি ফ্যাশন মেকার-এর সত্ত্বাধিকারী ও চিফ ডিজাইনার সানাউল হক বাবুল। জীবন শুরু করেছিলেন শূন্য থেকে–সামান্য একজন দর্জি হিসেবে। অবিচল বিশ্বাস, সততা আর পরিশ্রমের পথ ধরে গড়ে তুলেছেন দেশের পোশাকশিল্পে নেতৃস্থানীয় এই ফ্যাশন হাউজ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

জেগেছে আমার ভেতরের শক্তি ও বিশ্বাস

সানাউল হক বাবুল

স্কুল শিক্ষক বাবার একার আয়ে সংসার চলছিলো না, অনটন লেগেই থাকতো। তাই ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ই জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ি। আর্থিক টানাপোড়েন তখন এতটাই যে, অর্থাভাবে মেট্রিক পরীক্ষাই দেয়া হলো না। এরপর কিশোরগঞ্জ থেকে '৮৪ সালে ঢাকা চলে এলাম। মা তার বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে আমাকে বেশকিছু টাকা দিলেন।

সেই টাকায় ব্যবসা শুরু করলাম। শুরুতেই লস্ হলো, পুঁজিও হারালাম। টাকা খুইয়ে পরিবারের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলো। যোগাযোগও বন্ধ হয়ে গেল একসময়।

এ অবস্থায় একদিন কাউকে না জানিয়ে চট্টগ্রাম চলে যাই। সেটা '৮৯ সালের কথা। থাকা-খাওয়ার জন্যে পকেটে কানাকড়িও নেই। একটা পরিবহন কোম্পানির অফিসের বারান্দায় কোনোমতে রাত্রিযাপন করতাম। মশার যন্ত্রণা আর লোকজনের হৈচৈ–সব মিলিয়ে রাতগুলো ছিলো বিভীষিকাময়। সারাদিন চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম। দিন কাটতো অর্ধাহারে, অনাহারে। একবার টানা ২ দিন উপোসও থাকতে হয়েছিলো।

কাজের সন্ধানে একদিন চট্টগ্রাম বন্দরে গেলাম। তখন দৈনিক ৭০ টাকা

মজুরিতে শ্রমিকের কাজ করতেও আমার কোনো দ্বিধা নেই। তাতে যদি অন্তত দুবেলা খাওয়ার পয়সা জোটে। কিন্তু বন্দরের শ্রমিক-সর্দার ১০০ টাকা ঘুষ ছাড়া কাজ দিতে চাইলো না। আমার শত কাকুতি-মিনতিতে সেদিন তার মন টলে নি। এমনই দুঃসহ ছিলো সময়টা। তবুও হতাশ হই নি। সাহসের সাথেই বিশ্বাস করতাম যে, কিছু একটা নিশ্চয়ই হবে।

এভাবে কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন চট্টগ্রামের খলিফাপট্টিতে এক দর্জির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মানুষ দোকানে কাজ করছিলেন। একটা কাজ চাইতেই আমার মলিন চেহারার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়া হয়েছে কিছু? আমার অবস্থা বুঝে তিনি রুটি-কলা কিনে খাওয়ালেন। তারপর ব্লাউজের কিছু কাপড় কাটতে দিলেন আমাকে। সেদিন কি হলো জানি না, আমার মধ্যে একটা জেদ চেপে গেল। দোকানের বাকি ৫ জন শ্রমিকের চেয়ে আমি ২ পিস্ কাপড় বেশি কাটলাম। তিনি সেদিনই আমাকে ১০০ টাকা অগ্রিম দিলেন। ঢাকায় যখন ছিলাম আমার বোনকে এসব কাজ করতে দেখেছি, কখনও বা তাকে হয়তো একটু সাহায্য করেছি। সেই অভিজ্ঞতাটাই সেদিন কাজে লাগলো।

দর্জি হিসেবে কাজ শুরু করলাম। তখন কাজই হয়ে উঠলো আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। নিজের খাওয়া-পরার খরচ বাঁচিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠাতাম। মায়ের দেয়া টাকাটাও শোধ করলাম একসময়। আর কাপড় সেলাই, ডিজাইন সবকিছু এত ভালোভাবে শিখে ফেললাম যে, যখন যেখানে কাজ করেছি সবখানেই ভালো বেতন আর সম্মান পেয়েছি। কখনো দিনে শুধু ২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেছি। চাকরি মনে করে নয়, নিজের প্রতিষ্ঠান ভেবে কাজ করেছি। আসলে সফল হতে হলে যে যে-ই প্রতিষ্ঠানে কাজ করুক না কেন, সেটিকে তার নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করতে হবে।

এভাবে একসময় টেইলারিংয়ের কাজটাকেই আমি শিরোধার্য করলাম। স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম—এ কাজ করেই বাংলাদেশে একদিন নিজের অবস্থান তৈরি করবো।

১৯৯৩ সালে আবার ঢাকায় এসে ২৫০ টাকা ভাড়ায় একটি দোকান ভাড়া নিলাম। পূর্ব পরিচিত একজন গার্মেন্টস মালিক কিছু কাজের অর্ডার দিলেন। তিনি অন্যান্য দোকানে যে পরিমাণ কাপড় দিতেন আমাকেও একই কাপড় দিতেন, কিন্তু আমি যেভাবে কাপড় কাটতাম তাতে প্রতি পিস্-এ প্রায় ১ গজের মতো কাপড় বেঁচে যেত। একদিন আমি কাপড় কাটার সময় তিনি নিজে বসে থেকে ব্যাপারটা দেখলেন। আমার এ সততা তাকে মুগ্ধ করলো।

আমার সততা ও কাজের প্রতি মনোযোগের কারণে তিনি এরপর সব কাজই আমাকে দিতে শুরু করলেন। তখন তাদের প্রায় সব পোশাকই ছিলো আমার ডিজাইন করা।

সে সময় একটা ঘটনা আমার আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়—'৯৯ সালে অন্যদিন ফ্যাশন ডিজাইনিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমি ৩টি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হই। সেটি ছিলো আমার জীবনের প্রথম স্বীকৃতি। আসলে জীবনে সততা আর পরিশ্রম থাকলে মেধা এমনিতেই বিকশিত হয়।

'৯৮ সালে বোনের স্বামীর চিকিৎসার জন্যে দেড় মাস আমাকে ভারতে থাকতে হলো। ফিরে এসে দেখি আমার প্রতিষ্ঠানই নেই। আমার এক কর্মচারী সেই গার্মেন্টস মালিককে ভুল বুঝিয়ে আমাকে মোটামুটি পথে বসিয়ে দিয়েছে। এদিকে বোনের স্বামীর চিকিৎসা করিয়ে আমিও প্রায় সর্বস্বান্ত। সব মিলিয়ে আমার তখন খুব খারাপ অবস্থা। মাত্র ৫টা মেশিন নিয়ে আবার একটি দোকান ভাড়া নিলাম। আমার রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ। এ প্রতিষ্ঠানকে আমার রক্ত ঘাম করা পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলবো—সে প্রতিজ্ঞা থেকেই নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম দিলাম 'এবি ফ্যাশন মেকার।' শুরু হলো নতুন উদ্যমে পথ চলা।

আমার সৃজনশীলতা আর মেধার সাধ্যমতো প্রয়োগ করে ব্যবসা বেশ ভালো পর্যায়ে নিয়ে গেলাম। প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বাড়তে লাগলো। কিন্তু আবার বাধা। ২০০৩ সালে ২৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ময়মনসিংহে আরেকটি শাখা খুলে আমার ২ ভাইকে দায়িত্ব দিই। এদিকের লভ্যাংশের প্রায় পুরোটাই ওখানে বিনিয়োগ করি। ওখানে ১৫ মাসে ৬০ লক্ষ টাকার পোশাক বিক্রি হলো। ভাইদের চেহারাও পাল্টে গেল। একসময় রীতিমতো অপদস্থ হয়ে ওখান থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হলো আমাকে।

এ ঘটনায় এতটাই ভেঙে পড়লাম যে, স্ট্রোক হলো আমার। আমি তখন চরম হতাশাচ্ছন্ন। কোনো কাজই করতে পারছিলাম না। শূন্য দৃষ্টিতে শুধু শুয়ে থাকতাম। বাসাভাড়া দিতে পারি না বলে স্ত্রী আর ২ সন্তান নিয়ে বিতাড়িত হওয়ার মতো অবস্থা। এক আত্মীয় পরামর্শ দিলেন—তুমি কোয়ান্টামে যাও, সমাধানের পথ খুঁজে পাবে।

অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করে কোর্সে অংশ নিলাম। আন্তরিকতার সাথে অনুশীলন শুরু করলাম। নিয়মিত মেডিটেশনে মনছবি দেখতে লাগলাম। উদ্যম ফিরে এলো। আবার শুরু করলাম। এক বছরের মধ্যেই ব্যবসায় এত প্রবৃদ্ধি হলো যা আগে কখনোই হয় নি। তখন যে কাজে হাত দিই তাতেই

সফলতা। আমার কাছে মাটির ব্যাংক হয়ে উঠলো রহমতের ব্যাংক। একবার ইংল্যান্ডের ভিসার জন্যে আবেদন করে ভিসা পেলাম না। বাসায় ফিরে 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলে মাটির ব্যাংকে দান করলাম। বিকেলেই এম্বেসি থেকে ফোন করে বললো ভিসা নিয়ে যেতে। মাটির ব্যাংক নিয়ে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে আমার জীবনে।

এখন প্রতিদিন ভোরে স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া জানিয়ে দিন শুরু করি, নিয়মিত মেডিটেশন করি এবং শত ব্যস্ততার মাঝেও ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। আগে একগাদা ওষুধ খেতে হতো। এখন কোনো ওষুধ ছাড়াই সুস্থ আছি।

স্ত্রী আর সন্তানকে কোর্স করানোর পর পারিবারিকভাবেও এখন আমি বেশ সুখী। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাচুর্য এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দেশের প্রতিটি জেলায় এখন আমাদের পোশাক বিক্রি হচ্ছে। দেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যসহ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া–যেখানেই বাঙালিদের অবস্থান সবখানেই আমাদের পোশাকের চাহিদা রয়েছে।

আসলে সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার ফলেই সবার আস্থা অর্জন সম্ভব হয়েছে। কোয়ান্টামে না এলে আমি হয়তো স্ট্রোকের পরই ফুরিয়ে যেতাম, এতদূর আসার শক্তি পেতাম না। কোয়ান্টাম আমার ভেতরের শক্তি আর বিশ্বাসকেই জাগিয়ে দিয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, নভেম্বর ২০১০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

সফল মানুষ বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেন আর
ব্যর্থরা বাস্তবতার দোহাই দেয়।

জীবন থেকে সত্যকে শিখুন।
বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া
কোনো সত্যই নিজস্ব হয় না।

মুশতাক আহমেদ। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে উদ্যম, বিশ্বাস আর সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টায় ২০০৪ সালে ময়মনসিংহের ভালুকায় গড়ে তুলেছেন দেশের প্রথম কুমির পালন ও প্রজনন কেন্দ্র রেপটাইলস্ ফার্ম লি.। শুধু বাংলাদেশেই নয়, এটি পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় কুমিরের প্রথম ও একমাত্র ফার্ম। বর্তমানে তিনি এ ফার্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তার স্ত্রী কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট মাশিহা আক্তারের অনুপ্রেরণায় তিনি কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ উচ্ছ্বাস-৯ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিটি বাধা আমাকে আরো আশাবাদী করে তুলেছে

মুশতাক আহমেদ

ট্যুরিজমের প্রতি বরাবরই খুব আগ্রহ আমার। তাই ২০০১ সালে ট্যুর-গাইড হিসেবে একটি ক্রুজ বোটে চাকরি নিলাম। ঢাকা থেকে ট্যুরিস্টদের সুন্দরবন নিয়ে যেতাম। প্রতিদিন অনেক নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হতো বলে কাজটি বেশ উপভোগ করছিলাম।

সে সময় পরিচিত একজনের কাছ থেকে শিথিলায়নের একটি ক্যাসেট পেয়েছিলাম। রাতে বোটের ছাদে বসে মেডিটেশন করতে খুব ভালো লাগতো। নিজের ভেতর একটা স্থিরতা ও প্রশান্তি অনুভব করতাম।

ব্যবসার প্রতি বরাবরই আমার আগ্রহ ছিলো দেখে স্কুল জীবনের এক বড় ভাই ভিন্ন রকম এক ব্যবসার কথা বললেন–তা হলো কুমিরের ফার্ম। আইডিয়াটা খুব পছন্দ হলো। ভাবলাম, বাংলাদেশে আমিই তো প্রথম এটা করতে পারি।

এর আগে গ্রাজুয়েশন শেষ করে প্রথম চাকরি শুরু করেছিলাম একটি চা বাগানে। সেই কোম্পানি থেকে দু'বছরের একটি কোর্সে ইংল্যান্ড যাওয়ার সুযোগ হলো। ফিরে এসে বুঝলাম–যা শিখেছি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তার তেমন কোনো গুরুত্বই নেই। ছেড়ে দিলাম চাকরিটা। তারপরের কয়েক

বছরে আরো কয়েকটি চাকরি করলাম। কয়েকবার ব্যবসার চেষ্টা করে তাতেও ব্যর্থ হলাম। অবশ্য প্রতিটি উদ্যোগ থেকেই আমি কিছু না কিছু শিখেছি। আসলে স্থিরতার অভাবে তখন কোথাও থিতু হতে পারছিলাম না।

ট্যুর-গাইডের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কুমিরের ফার্ম করতে হলে কীভাবে কী করা প্রয়োজন—সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। আসলে যেকোনো কাজে সফলতার জন্যে প্রস্তুতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কুমিরের ফার্ম করতে ৫ থেকে ৭ কোটি টাকার প্রয়োজন। সাথে লাগবে জায়গা আর সরকারের অনুমতি। এদিকে ঘরে বাইরে সবাই 'পাগল' ছাড়া কিছু বলছে না। আমি তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, কুমিরের ফার্ম আমি করবোই।

এর মধ্যে ২০০২ সালের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএসএইড একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করলো—'এগ্রো বিজনেস প্লান কম্পিটিশন'। প্রতিযোগিতায় জয়ী প্রথম ১০ জনকে সেই বিজনেস প্লান বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে। মনে হলো, আমার স্বপ্ন পূরণের এই তো সুযোগ।

২০০৩ সালের এপ্রিলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। অনেক খেটে তৈরি করা আমার প্লান উপস্থাপন করলাম। সবাই খুব প্রশংসা করলেন। প্রতিযোগিতায় আমি চতুর্থ হলাম। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পরিচয় হলো ইউএসএইড-এর একজন পরিচালকের সাথে। উৎসাহ দিয়ে তিনি নিজেই বললেন, খ্যাতিমান আমেরিকান কুমির-বিশেষজ্ঞ রমুলাস ওয়াইটেকারের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। অথচ এর আগে কুমির প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জানতে বহুবার তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পারি নি।

রমুলাস ওয়াইটেকারের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিও ঘটনাবহুল। হঠাৎ একদিন বিকেলে আমাকে জানানো হলো—আগামীকাল ওয়াইটেকার বাংলাদেশে আসছেন এবং সরাসরি সুন্দরবন চলে যাবেন। আমি চাইলে তার সাথে যেতে পারি। প্লেনে যেতে হবে। সব মিলিয়ে ১০ হাজার টাকার মতো প্রয়োজন।

অথচ আমার হাতে তখন কানাকড়িও নেই। সময়ও খুব অল্প, যেতে হলে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। টাকার জন্য বেশ কয়েক জায়গায় যোগাযোগ করে ব্যর্থ হলাম। বিকেল তখন সাড়ে ৪টা। আক্ষরিক অর্থেই নিরুপায় হয়ে শিথিলায়ন করতে বসলাম। ভাবলাম দেখি না কী হয়।

সৃষ্টিকর্তা সদয় হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমেরিকা থেকে বাবা ফোন

করলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। কারণ তিনি সবসময় রাতেই ফোন করতেন। বিষয়টি তাকে খুলে বললাম। তিনি একজনকে ফোন করে টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওয়াইটেকারের সাথে সুন্দরবন ভ্রমণ করে কুমির সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় জানা হলো।

টাকা জোগাড়, জমি কেনা, সরকারের অনুমতি–এ কাজগুলো করতে গিয়ে পদে পদে বাধা এসেছে। প্রতিটি বাধাই আমাকে নতুনভাবে উদ্যম যুগিয়েছে। কারণ, কোনো কাজ করতে গিয়ে বাধা এলে সে কাজে আমি আরো বেশি উৎসাহ পাই। তাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে 'ব্যর্থতার মাঝেই সুপ্ত আছে সাফল্যের বীজ'–এ কথাটি আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

এরপর ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার হাতীবেড় গ্রামে ১৩ একর জায়গা কিনলাম। প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশে কুমিরের প্রথম ফার্ম 'রেপটাইলস্ ফার্ম লিমিটেড'। ইউএসএইড আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় আড়াই কোটি টাকা অনুদান দেয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়া থেকে ৭৫টি প্রজননক্ষম কুমির আমদানির মাধ্যমে এ ফার্মের কার্যক্রম শুরু হলো। বর্তমানে এখানে কুমিরের সংখ্যা ১২ শতাধিক।

কুমিরের চামড়াসহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বেল্ট, ব্যাগ, পারফিউম, অলংকার ও ক্যান্সারসহ নানা রোগের প্রতিষেধক তৈরি হয় বলে বিদেশে কুমির রপ্তানির বিষয়টি অত্যন্ত লাভজনক। ২০১০ সালে আমরা জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭টি কুমির রপ্তানি করেছি। আরো ৬০০টি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির প্রক্রিয়া চলছে। সব মিলিয়ে আমাদের এ প্রকল্পের মূল্যমান এখন ৫০ কোটি টাকার অধিক।

আমাদের আজকের সাফল্যের পথটা মোটেই সহজ ছিলো না। ফার্ম শুরু করার সময় প্রকৃত অর্থেই আমি ছিলাম কপর্দকহীন। কখনো প্রখর রোদে মতিঝিল থেকে হেঁটে লালমাটিয়া গিয়েছি। গাড়িতে ওঠার পয়সা ছিলো না। কিন্তু বিশ্বাস ছিলো যে, এটা সম্ভব এবং আমি পারবো।

প্রথমদিকে ফার্মে রাত্রিযাপনের কোনো বন্দোবস্ত ছিলো না। চারদিকে চারটা খুঁটি গেড়ে ওপরে চালা দিয়ে মাটিতেই বিছানা করেছি, কোনো দেয়াল পর্যন্ত ছিলো না। এমনও হয়েছে–শীতের রাতে ঘুম ভাঙলে লেপ তুলে দেখি মাথার কাছে শিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়াও প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি কুমির মারা গিয়েছিলো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দমে যাই নি।

এ ফার্ম নিয়ে আমি বেশ আশাবাদী। কুমির রপ্তানির পাশাপাশি আমার

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো–এখানে আসা পর্যটকদের জন্যে একটি রিসর্ট প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা থেকে ফার্ম পর্যন্ত একটি ট্যুরিজম কোম্পানি পরিচালনা করা। এছাড়াও এখানে প্রজাপতি ও পাখির অভয়ারণ্য করারও পরিকল্পনা আছে।

আমাদের দেশ অসম্ভব সম্ভাবনাময় একটি দেশ। তরুণরা নতুনভাবে এদেশে অনেক কিছুই শুরু করতে পারে। শুধু সাহস ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করলেই হলো। গুরুজীর ভাষায়, শুরু করতে হবে যা আছে তা নিয়েই। আর শুরু করতে গিয়ে নিজের যেটুকু আছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে।

মেডিটেশন এখন আমার জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর সবকিছু এখন আগের চেয়ে অনেক গুছিয়ে করতে পারছি। আজ কুমিরের ফার্ম করার স্বপ্ন যে বাস্তবায়িত হয়েছে তা ২০০১ সালের মেডিটেশনেরই ফল।

সারাদিনে কখন কোন কাজটা কীভাবে করবো সে পরিকল্পনা করে এখন দিন শুরু করি। এভাবে কাজ করতে পারলে পরবর্তী পদক্ষেপগুলোও সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ সাফল্যের জন্যে একটি সুন্দর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাতে জীবনটাও অনেক সহজ হয়ে যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, এপ্রিল ২০১০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

কাজে উদ্যোগী না হলে
প্রতিটি কাজই অসম্ভব মনে হয়।

নিখুঁত ও বাস্তবানুগ পরিকল্পনা
যেকোনো কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক।

জীবন জয়ের এক অনবদ্য গল্প শুনিয়েছেন কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ উচ্ছাস-১৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট মো. সালাহ্ উদ্দিন মোস্তান মানিক। একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে ছাপাখানায় কাজ শুরু করেছিলেন। তিনিই এখন স্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেশে বিশ্বমানের প্রিন্টিং মেশিন তৈরির।

বাংলাদেশেই তৈরি করবো বিশ্বমানের প্রিন্টিং মেশিন

মো. সালাহ্ উদ্দিন মোস্তান মানিক

৩১ বছর আগে প্রিন্টিং মেশিনের সামান্য একজন কর্মচারী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন মো. সালাহ্ উদ্দিন মোস্তান মানিক। সে মানুষটিই এখন স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশে তৈরি হবে বিশ্বমানের আধুনিক প্রিন্টিং মেশিন। প্রিন্টিং মেশিনের জন্যে আর বিদেশ নির্ভর হয়ে থাকতে হবে না। তার ওয়ার্কশপ থেকেই তিনি উন্নতমানের প্রিন্টিং মেশিন সরবরাহ করতে পারবেন দেশের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাগুলোতে। মানিক ইতোমধ্যেই প্রিন্টিং মেশিনের ১৫ হাজারেরও বেশি খুচরো যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন তার ওয়ার্কশপে।

মানিকের আজকের এ সাফল্যের পথে এগুনোটা খুব একটা সহজ ছিলো না। ১৯৮১ সালের ঘটনা সেটা–৬ষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। আর বাড়ি ফিরে যাওয়া হয় নি। পড়াশোনায় আগ্রহ নেই বলে সাংবাদিক বড় ভাই সে বছরই তাকে হাটখোলার একটি প্রেসের কাজে ঢুকিয়ে দেন। মাইনের বালাই নেই, দুপুরের খাওয়াটা জুটতো শুধু।

মন দিয়ে প্রিন্টিংয়ের কাজ শিখতে শুরু করলেন মানিক। কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি। প্রিন্টিং মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নামগুলো ইংরেজিতে লেখা। মেশিন চালানোর খুটিনাটি শিখতে হলে তো এর প্রতিটি যন্ত্রাংশের নাম জানা

জরুরি। তাই আবার পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সাহিত্যিক আহমদ ছফার উৎসাহে সে বছরই ভর্তি হলেন আজিমপুর নাইট স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে। দিনে প্রেসের কাজ, সন্ধ্যায় স্কুল আর মধ্যরাত পর্যন্ত পড়াশোনা। এভাবেই '৮৭ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সেকেন্ড ডিভিশনে মেট্রিক পাশ করলেন। এরপর টিএন্ডটি নাইট কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হলেও আর পরীক্ষা দেয়া হয় নি। মানিক তখন পুরোদস্তুর প্রিন্টিং টেকনিশিয়ান।

মেট্রিক পরীক্ষার সময় কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছিলেন প্রেস থেকে। পরীক্ষার পর আবার কাজে গেলে প্রেস মালিক তাকে বলেছিলেন, লোক নেয়া হয়ে গেছে, তাকে আর প্রয়োজন নেই। প্রেস থেকে বেরিয়ে অন্য আর দশজনের মতো হতাশায় নুয়ে না পড়ে অকাশের দিকে তাকিয়ে মানিক সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, চাকরির জন্যে জীবনে আর কারো কাছে ধর্না দেবেন না, বরং নিজের দক্ষতাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যে, প্রিন্টিং মেশিনের স্বার্থেই মানুষ একদিন তাকে খুঁজবে।

সেই থেকে শুরু। প্রিন্টিং মেশিনই তার ধ্যান জ্ঞান। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে প্রিন্টিং মেশিনের পেছনেই ব্যয় করেছেন নিজের সমস্ত মেধা ও শ্রম। তার ভাষায়–'যখনই শুনেছি কোনো প্রেসে নতুন ধরনের প্রিন্টিং মেশিন এসেছে সেখানেই ছুটে গেছি। বিনা পারিশ্রমিকে সেই মেশিনের কাজে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার হয়তো তখনো মেশিন সেট করছেন–এর মধ্যেই সেখানে গিয়ে কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে কাজে সাহায্য করতাম। বিনা বেতনের সাহায্যকারী পেয়ে তারাও খুশিই হতো। আমার উদ্দেশ্য একটাই–সব ধরনের মেশিন চালানোর কাজে দক্ষতা অর্জন করা।

এভাবে প্রায় ২৫ ধরনের প্রিন্টিং মেশিনে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। শুধু তা-ই নয়, এসব কাজ করতে গিয়ে একেকজন মেশিন অপারেটরের ২৫ রকমের টেকনিকও আমি শিখে গেছি। মোটকথা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা প্রিন্টিং মেশিন নিয়েই থাকতাম। প্রিন্টিং মেশিন যেখানে চলে তার আশেপাশের লোকজন বিরক্তিতে পারলে পাথর ছুঁড়ে মারে, কিন্তু মেশিনের শব্দ ছাড়া আমি ঘুমাতে পারতাম না'।

এরপর মানিককে আর কোথাও চাকরি খুঁজতে তো যেতে হয়ই নি, বরং বিভিন্ন প্রেসে তার সাথে যারা কাজ করেছে তাদের কাউকেই আজ পর্যন্ত চাকরির জন্যে কোথাও গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয় নি। নিজের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি তার সহকর্মী ও অধীনস্থ মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার

মানুষকে তিনি এ কাজে দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন।

কাজ করতে গিয়ে মানিক দেখলেন, প্রিন্টিং মেশিনের খুচরো যন্ত্রাংশগুলোর কোনোটা বিকল হলে কাজের ক্ষেত্রে তা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রাংশগুলো সব বিদেশ থেকে আসে বলে কখনো বাজারে তার সরবরাহ না থাকলে মেশিন কখনো কখনো বন্ধ রাখতে হয় ৩ মাস পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে মানিকের উপলব্ধি–'এই দেশ আসলে গরিব নয়, কাজ না করে করে আমরাই এ দেশটাকে গরিব বানিয়ে রেখেছি। এভাবে কাজ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমার ধাতে নেই। তাই বিভিন্ন কারখানায় গিয়ে এসব যন্ত্রাংশের নকশা এঁকে অর্ডার দিয়ে সেগুলো বানিয়ে নিতে শুরু করলাম। স্থানীয়ভাবে দেশেই তৈরি বলে খরচও অনেক কম পড়লো। এছাড়াও প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন কিছু পরীক্ষামূলক কাজ করার চেষ্টা করলাম, যা বর্তমানে দেশের সব বড় বড় প্রেসগুলোতে অনুসরণ করা হচ্ছে।'

নিজস্ব আইডিয়ায় প্রিন্টিং মেশিনের বিভিন্ন খুচরো যন্ত্রাংশ তৈরির লক্ষ্যে স্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় মানিক ২০০৫ সালে ছোট্ট পরিসরে গড়ে তুললেন নিজের প্রতিষ্ঠান–মানিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। নতুন উদ্যমে শুরু হলো প্রিন্টিং মেশিনের খুচরো যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ।

এ পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৈরি করেছেন প্রিন্টিং মেশিনের ১৫ হাজারের বেশি খুচরো যন্ত্রাংশ। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যে যন্ত্রাংশটি আগে কিনতে খরচ হতো ৯০ হাজার টাকা, তার কাছ থেকে ক্রেতারা এখন সেটিই কিনছেন মাত্র ২৫ হাজার টাকায়। দেশেই তৈরি বলে ক্রেতারা একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসটি সহজেই পাচ্ছেন তেমনি তাদের ব্যয়ও কমে এসেছে প্রায় এক তৃতীয়াংশে।

এসব যন্ত্রাংশের কার্যকারিতাও বেশ মানসম্পন্ন। সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানিকৃত প্রিন্টিং মেশিনের পার্টসগুলোর কোনো গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি থাকে না, কিন্তু মানিকের তৈরি ১ বছরের গ্যারান্টি আছে এমন পার্টস চমৎকারভাবে ৫ বছর ধরে কাজ করছে জানিয়ে ক্রেতারাই তাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানান। গর্ব ভরে মানিক তখন বলে ওঠেন, মেড ইন বাংলাদেশ। এখন তার ওয়ার্কশপে তৈরি পার্টসের পাশে বিদেশি পার্টস থাকলেও অভিজ্ঞ ক্রেতারা তারটাই কিনছেন, তারা দেখেই বোঝেন কোনটা ভালো। অনেকেই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বিদেশে তৈরি বলে এসব যন্ত্রাংশ অনায়াসেই বেশি দামে বিক্রি করা যায়, কিন্তু 'মেড ইন বাংলাদেশ' বলার ক্ষেত্রে আপস করতে তিনি নারাজ।

কিছুদিন আগে ভারতে গিয়ে দেখলেন রাস্তায় চলাচল করা সব গাড়িই সেদেশে তৈরি। সেই থেকে মানিকের স্বপ্নপূরণের জেদ আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। পাশের দেশ যদি গাড়ির ক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে তবে আমরা কেন প্রিন্টিং মেশিন তৈরি করতে পারবো না? সে লক্ষ্যেই মানিক এগুচ্ছেন পা পা করে।

কোয়ান্টামের কথা অনেক আগে থেকে জানলেও ২০১০-এ অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ উচ্ছ্বাস-১৮ ব্যাচে স্ত্রী-পুত্রসহ অংশ নিয়েছেন মানিক। যদিও পরিবারের ৩ জন সদস্য একত্রে কোর্স করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ সে মুহূর্তে তার ছিলো না। কিন্তু কোর্সের আগের দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ক্রেতা নিজেই এসে পাওনা টাকা দিয়ে গেলেন।

কোর্স করার পর নিয়মিত মেডিটেশন মানিকের স্বপ্নকে তার সামনে করে তুলেছে আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তার নিজের ভাষায়, 'আসলে আল্লাহ মানুষকে অনেক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মেডিটেশন সে ক্ষমতাটাকে জাগিয়ে তোলে। কোর্সে শেখা মেডিটেশন ও গুরুজীর ইতিবাচক কথা আমার আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার ছেলেও এখন পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী হয়ে উঠেছে। মেডিটেশন করে আমার কাজের প্রতি মনোযোগ বেড়েছে। এখন আগের চেয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারি, কাজ করতে পারি। বিশ্বাসের সাথে স্বপ্ন দেখতে পারি–বছর দশেকের মধ্যে বাংলাদেশেই তৈরি করতে পারবো বিশ্বমানের প্রিন্টিং মেশিন।'

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রস্তুতি ছাড়া যাত্রা পথের কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়।
স্বপ্ন ও বিশ্বাস পথ চলার সে প্রস্তুতিরই সূচনা করে।

প্রতিটি কাজ শুরু হয় শূন্য থেকে।
ধাপে ধাপে তা পূর্ণতা পায়।

গত দুই দশকে কোয়ান্টাম জীবনদৃষ্টি ও সাফল্যসূত্র অনুসরণ করে লাখো মানুষ বদলে ফেলেছেন তাদের জীবন। রোগ-জরা দুঃখ অশান্তি ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে লাভ করেছেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। শূন্য থেকে জীবন শুরু করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন পূর্ণতার পথে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩২৭ ব্যাচের অংশগ্রহণকারী মো. জিল্লুর রহমান সেই লাখো মানুষেরই একজন।

আমার জীবন বদলে দিয়েছে কোয়ান্টাম

মো. জিল্লুর রহমান

সেই দিনটির কথা আমি জীবনে কখনোই ভুলবো না। ২০০৮ সালের ৮ আগস্ট অর্থাৎ ৮.৮.৮। সেদিন আমার ৩ দিন বয়সী একমাত্র সন্তানকে জন্ডিসের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা বললেন, জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ ও-নেগেটিভ। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সবখানে রক্তের খোঁজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু ও-নেগেটিভ রক্ত কোথাও পেলাম না।

সন্ধ্যার দিকে একটি ব্লাড ব্যাংকে গেলাম, সেখান থেকে বলা হলো, এক ব্যাগ ও-নেগেটিভ রক্ত যোগাড় করে দেয়া যাবে কিন্তু ৬ হাজার টাকা লাগবে। শুনে আমার স্ত্রী বললো, যত টাকাই লাগুক আমাদের সন্তানকে বাঁচাতে হবে। কারণ এর আগে আমাদের একটি মেয়ে হয়েছিলো, এরকম ঠিক ৩ দিন বয়সেই সে মারা যায়।

আমি একজন সামান্য হকার, রাস্তায় রাস্তায় ভ্যান চালিয়ে বাচ্চাদের কাপড় বিক্রি করি, কোথায় পাবো এত টাকা? গ্রামের বাড়িতে দুটো গরু ছিলো, তা-ই বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসতে খবর পাঠালাম। আর এদিকে বলে রেখেছিলাম সেই এক ব্যাগ রক্ত যেন অন্তত রাত পর্যন্ত রেখে দেয়া হয়।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে টাকা নিয়ে যখন রক্ত আনতে গেলাম তখন শুনি তারা আরেকজনের কাছে সে রক্ত বিক্রি করে দিয়েছে। আমি এর কারণ জানতে চাইলে উল্টো তারা আমাকে রীতিমতো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো আমার। কোথায় যাই, কী করি? কোনো উপায়ান্তর না দেখে সেই মধ্যরাতে রাস্তার পাশে বসে অঝোরে কাঁদছিলাম। এক রিকশাওয়ালা এসে কী ঘটনা জানতে চাইলে তাকে বললাম ব্যাপারটা। সব শুনে সে বললো, শান্তিনগরে একটা ব্লাড ব্যাংক আছে, সেখানে গিয়ে একবার দেখো। তারপর সে-ই আমাকে ওই মধ্যরাতে তার রিকশায় করে কোয়ান্টামে নিয়ে এলো।

রাত তখন ৩টা। কোয়ান্টামের ভাইয়েরা আমার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে আশ্বাস দিলেন–আপনি ধৈর্য ধরুন, শান্ত হয়ে বসুন। আমরা চেষ্টা করছি, রক্ত পাওয়া যাবে।

সারাদিনের ধকল শেষে তাদের কাছ থেকে যে সুন্দর ব্যবহার আর রক্ত পাওয়ার নিশ্চয়তা পেলাম, এতেই আমার মনে শান্তি আর সাহস ফিরে এলো। বেশ কয়েকটা ফোন করে একসময় তারা জানালেন, রক্তের ব্যবস্থা হয়েছে, একজন রক্তদাতা আসছেন। সারাদিন চেষ্টা করেও ৬ হাজার টাকা দিয়ে যে 'ও-নেগেটিভ' রক্ত আমি পাই নি, আল্লাহর রহমতে কোয়ান্টাম থেকে সেদিন তা-ই আমি পেয়েছিলাম মাত্র ৬শ টাকায়। পরদিন সকালেই আমার ছেলেকে রক্ত দেয়া হলো। সে এখন ৪ বছরের ছোট্ট সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু।

আমার এলাকার পরিচিত একজনকে একদিন এ ঘটনা বলছিলাম। ঘটনাচক্রে পাশে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিলেন সেই এলাকার অর্থাৎ মিরপুরের লালকুঠি সেলের একজন দায়িত্বশীল। সব শুনে তিনি আমাকে বললেন, লালকুঠি সেলে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়ন হয়, আমি যেন সেখানে যাই। সেই থেকে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে অংশ নিতে শুরু করলাম।

মেডিটেশন করে খুব ভালো লাগলো, মনে একটা শান্তি পেলাম। আগে কাপড় বিক্রির সময় দরদাম নিয়ে মাঝেমধ্যে ক্রেতাদের সাথে রেগে যেতাম। মেডিটেশন করার পর এ সমস্যা কেটে গেল, বেচা-বিক্রি হতে লাগলো কোনো ঝামেলা ছাড়াই। এছাড়াও আগে বুকে একটা ব্যথা হতো, বেশ কষ্ট পেতাম। কিন্তু শিথিলায়ন করে সেই ব্যথাটা একদম ভালো হয়ে গেল।

সাদাকায়নে অংশগ্রহণের পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কর্মকাণ্ড

বিশেষত খতনা সেবা কার্যক্রমে সাধ্যমতো কাজ করতে শুরু করলাম। যেসব দরিদ্র পরিবার পয়সার অভাবে সন্তানদের খতনা করাতে পারে না, বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে তাদেরকে এই সেবা দেয়ার কাজে অংশ নিলাম। আল্লাহর রহমতে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমি এ পর্যন্ত ৫ শতাধিক শিশুকে খতনা সেবা দিতে সহযোগিতা করতে পেরেছি।

ব্যাপারটা প্রথমদিকে কিন্তু মোটেই সহজ ছিলো না, কারণ এক পর্যায়ে স্থানীয় কিছু মানুষ আমার এ কাজে বিরোধিতা করে। এমনকি তাদের হাতে মার পর্যন্ত খেতে হয় আমাকে। কিন্তু তবুও থেমে যাই নি, আমি আমার কাজ চালিয়ে গেছি। পরে অবশ্য তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলো।

এভাবে ৬ মাসেরও বেশি সময় পার হওয়ার পর একসময় মনে হলো, এখন আমার কোয়ান্টাম কোর্সটি করা প্রয়োজন। কোর্স করতে পারলে আমি হয়তো আরো বেশি কাজ করতে পারবো। মিরপুর সেন্টারে ৫০০ টাকা দিয়ে একটি কোর্স একাউন্ট খুললাম। যখনই সুযোগ হতো তাতে ৫০০/১০০০ টাকা করে জমা করতাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, এক বছরের মধ্যেই কোর্সের পুরো টাকা জমা হয়ে গেল। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ঘটনা।

আমি কোর্স করতে পারবো—এই আনন্দে আর উত্তেজনায় কোর্সের আগের রাতে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারি নি। কোর্সের প্রথমদিন ভোরে সবার আগেই আমি আইডিইবি হলে চলে আসি। ৪র্থ দিন প্রত্যয়নে সবার সামনে আমার অনুভূতি বলার সুযোগ পাই। ৩২৭ তম ব্যাচে কোর্স করার মধ্য দিয়ে আমি যেন একটা নতুন ভুবনে, শান্তির জগতে প্রবেশ করলাম।

কোয়ান্টামে এসে নিয়মিত মেডিটেশনের পাশাপাশি সেবামূলক কাজের সাথে আমি যত সম্পৃক্ত হয়েছি আমার জীবনও তত বদলে গেছে। অফুরন্ত বরকত এসেছে আমার জীবনে। আমার ব্যবসায় আগের তুলনায় বিক্রি অনেক বেড়েছে, এখন আমি প্রতিদিন ৪/৫ হাজার টাকার কাপড় বিক্রি করতে পারি। যে পরিমাণ কাপড় বিক্রি করতে অন্যদের ২ দিন সময় লাগে, তা আমার কয়েক ঘণ্টায় বিক্রি হয়ে যায়। আর এভাবে আমার আয়-উপার্জনও দিন দিন বাড়ছে।

গ্রামে চাষাবাদের কাজে দেড় লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ করেছি। সম্প্রতি দুই বন্ধুর সাথে মিলে গাজীপুরে ৩ কাঠা জায়গা ভাড়া নিয়েছি, সেখানে একটি সোয়েটার ফ্যাক্টরি করার জন্যে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেছি। এটিকে একটি বড় সোয়েটার ফ্যাক্টরি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। ইনশাল্লাহ

আমরা এটা পারবো। কোয়ান্টামে এসে আমি এখন বিশ্বাস করতে পারি–একজন মানুষ যদি চায় তাহলে সে অনেক বড় কিছু করতে পারে।

মেডিটেশন ও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের বরকতে আমার নিজের কাজগুলোও এখন খুব সহজেই হয়ে যায়। এবারের পহেলা বৈশাখে দুপুরের পর কোয়ান্টামের বর্ষায়ন অনুষ্ঠান ছিলো, আমার নিয়ত ছিলো যেভাবেই হোক দুপুরের আগেই বেচা-বিক্রি শেষ করে আমি অনুষ্ঠানে যাবো। সেদিন সত্যিই দুপুর ১২টার মধ্যে ৮ হাজার টাকায় আমার সব কাপড় বিক্রি হয়ে যায়।

তাই আমার যত ব্যক্তিগত কাজ বা ব্যস্ততাই থাকুক, সাদাকায়ন ও ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সেবামূলক কাজে আমি যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করি। মাটির ব্যাংকে নিজে দান করার পাশাপাশি যখনই কারো কোনো সমস্যা বা অসুবিধার কথা শুনি তাকেও মাটির ব্যাংক দেই, দান করতে উদ্বুদ্ধ করি।

ফাউন্ডেশনের এ কাজগুলোর সুবাদে এলাকার মানুষও এখন আমাকে ভালবাসে, সম্মান করে। আর কোয়ান্টামে এসে আমি যে মানুষের সেবা করতে পারছি, এত মানুষকে সেবা দেয়ার কাজে যুক্ত হতে পেরেছি–এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

[কোয়ান্টাম বুলেটিন, সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

প্রাচুর্য
প্রতিটি মানুষের
জন্মগত অধিকার।

স্বপ্নের জন্যে রক্ত যখন
ঘাম হয়ে ঝরে,
সেই নোনা পানিতে
সাফল্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

তরুণ নাট্যকার ও নাট্য-নির্দেশক সাধনা আহমেদ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

মনছবির লক্ষ্যভেদ

সাধনা আহমেদ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২০১১ সালে শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র সাহিত্যের নাট্যায়ন' শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ কর্মশালায় দুই বাংলার ২১ জন তরুণ নাট্যকার অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে একটি করে নাটক লিখবেন। পরবর্তীতে এই ২১টি নাটক থেকে বাছাইকৃত ১০টি নাটক নিয়ে ভারত সরকার একটি বই প্রকাশ করবে। এ বইটি বাংলা ভাষা ছাড়াও ভারতের কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে জীবন-বৃত্তান্ত নেয়ার পর যাচাই-বাছাই ও ইন্টারভিউ'র মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ১০ জনকে মনোনীত করা হলো। সৌভাগ্যবশত আমি তাদের একজন।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, বরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ ও বিশ্ব নাট্য সংস্থা 'আইটিআই'-এর সভাপতি রামেন্দু মজুমদারের তত্ত্বাবধানে শুরু হলো দুই মাসব্যাপী প্রাথমিক ওরিয়েন্টেশন। প্রতিদিন রবীন্দ্ররচনা পাঠ করে কী বুঝলাম তা ডায়েরিতে নোট করা এবং পরবর্তীতে অনুভূতি বিনিময়।

দু'মাস পর ২০১১ সালের ১৬ জুন বাংলাদেশের তিনজন প্রশিক্ষকসহ আমরা কোলকাতা গেলাম, সেখান থেকে পরদিন শান্তিনিকেতন। পশ্চিমবঙ্গের আরো ১১ জন তরুণ নাট্যকার এবং ৫ জন প্রশিক্ষক।

প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৬ টা থেকে রাত ৯টা–এ রুটিন অনুযায়ী শান্তিনিকেতনের বসুন্ধরা লজ-এ শুরু হলো এক শিক্ষাযজ্ঞ। শুধুমাত্র খাবারের

বিরতি ছাড়া আর কোনোদিকে তাকানোর অবসর নেই। ভোর ৫টায় উঠে মেডিটেশন করে, তৈরি হয়ে ক্লাসে যেতাম।

নিয়মিত প্রশিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও পাশাপাশি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা আমাদের ক্লাস নিতেন। ভোর থেকে রাত অবধি রবীন্দ্রসাহিত্যের পাশাপাশি আলোচনা চলতো বিশ্বসাহিত্যের নানা বিষয়, শিল্প চিত্রকলা নাট্যকলা এমনকি হিউম্যান সাইকোলজি নিয়েও।

৪ দিন পর আমাদের বলা হলো নাটক লেখা শুরু করতে। লেখার জন্যে প্রতিদিন একঘণ্টা করে সময়। সবাই লেখা শুরু করলো। আমার দুজন রুমমেটও মন দিয়ে লিখছে। কিন্তু আমি কিছুতেই এক লাইনও লিখতে পারছি না। আমার মাথা যেন পুরোপুরি খালি হয়ে গেল।

এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের বাউল-ভাবনা নিয়ে যত পড়াশোনা করেছি, আলোচনা করেছি–সব ছবি, সব কল্পনা হঠাৎ যেন হারিয়ে গেছে। বাইরে অঝোর ধারায় ঝরছে আষাঢ়ের বারিধারা আর আমার হৃদয়ে সবার অজান্তে বয়ে চলেছে লিখতে না পারার দুঃসহ বেদনাধারা। সৃষ্টির আনন্দে সবাই হাসি-কলকাকলিতে মুখর। এদিকে আমি বেদনা-ভার লুকিয়ে ভাব করি, কোনো অসুবিধা নেই। আর সারাক্ষণ অটোসাজেশন দিতে থাকি–'আমি একটি ভালো নাটক লিখবো, আমি সফল হবো'।

এভাবে আরো দুদিন পার হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিলাম–লেখার চেষ্টা করবো না। লেখার বিরতিতে একবারসহ প্রতিদিন তিনবেলা মেডিটেশনে শুধু মনছবি দেখতে শুরু করলাম–আমি নাটকটি লিখছি এবং সফলতার সাথে শেষ করছি, নাটকটি ভালো হয়েছে, বাছাইকৃত ১০টি নাটকের মধ্যে আমার নাটকটি স্থান পেয়েছে। এভাবে গভীর বিশ্বাস নিয়ে মনছবির মেডিটেশন করতে লাগলাম।

কর্মশালার দশম দিনে যতটুকু লেখা হয়েছে নির্দেশনা অনুযায়ী সবাই ততটুকুই জমা দিয়েছে, একমাত্র আমি ছাড়া। বাকিটুকু পরবর্তী একমাসের মধ্যে লিখে জমা দিতে হবে। আমার গাইড ভীষণ রেগে গেলেন, কারণ আমি কী লিখবো তা নিয়ে শুধু দুই পাতার একটি সার-সংক্ষেপ লিখে দিয়েছি।

২৮ জুন আমরা বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে, অথচ ১৫ জুলাই পর্যন্ত আমি একটি লাইনও লিখতে পারি নি। কিন্তু মনছবির মেডিটেশন ছাড়ি নি, গভীর বিশ্বসে মনছবির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিয়মিত পড়াশোনার চেষ্টা করছি।

২০ জুলাই কল্পনায় আমি হঠাৎ আমার নাটকের শেষ দৃশ্যটি যেন দেখতে

পেলাম–রবীন্দ্রনাথ বাউল সেজে একতারা হাতে পথ চলেছেন অনন্ত পৃথিবী পানে। নাটকের শেষ দৃশ্য থেকে আমি লেখা শুরু করলাম এবং রবীন্দ্রনাথের বাউলসত্তাকে তুলে আনতে চেষ্টা করলাম কাগজের পাতায়, নাটকের সংলাপে। লেখা হলো আমার নাটক–'ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন'। নির্ধারিত সময়ে পান্ডুলিপি জমা দিলাম।

কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় মামুনুর রশীদের কাছে শুনলাম আমার এতদিনের স্বপ্ন পূরণের সেই আরাধ্য সুসংবাদটি–বাছাইকৃত দশটি নাটকের মধ্যে স্থান পেয়েছে আমার নাটকটিও। মাস কয়েকের মধ্যেই এটি বই আকারে ভারত থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মেডিটেশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভের অনুভূতি আমার জীবনে এটাই প্রথম নয়। ৮ বছর আগের একটি ঘটনা মেডিটেশনের প্রতি আমার বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে।

দিনটি ছিলো ২৮ মার্চ, ২০০৪। আমি তখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা। ডাক্তার বলেছিলেন, গর্ভের শিশু প্রতিদিন অন্তত ১২ বার নড়বে। কিন্তু সেদিন হিসেব করে দেখলাম ৪/৫ বারের বেশি সাড়া পাই নি। ক্লিনিকে ভর্তি হলাম। আমার গর্ভস্থ সন্তানের হৃদস্পন্দন অনিয়মিত। আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে।

রাত ১২টার পর প্রফেসর এলেন। সবকিছু আবার দেখলেন। একসময় বললেন, 'আমরা ডাক্তাররা অনেক কিছুই হয়তো পারি, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ভীষণ অসহায়। আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছাড়া তখন আর কিছু করার থাকে না আমাদের। তোমাকে নিয়েও আমরা এখন সেরকম একটি অবস্থার মুখোমুখি। এ পরিস্থিতিতে তোমার বাচ্চাটিকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই, দেশের বাইরেও যে খুব ভালো ব্যবস্থা আছে তা-ও নয়। আল্লাহকে ডাকো, এখন সবকিছুই নির্ভর করছে তাঁর ওপর। তা না হলে....।' কথা শেষ না করেই তিনি উঠে গেলেন। আমার যা বোঝার আমি বুঝে নিলাম। আমার সমস্ত পৃথিবী তখন দুলে উঠলো।

সমস্ত আশা নিভে গিয়ে আমার পৃথিবী যখন এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঠিক তখনই আমার মনের আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বলে উঠলো গুরুজীর মুখখানি। মনে পড়লো, কোয়ান্টাম কোর্সে মেডিটেশনে গুরুজী বলেছিলেন, পিতার দেহ থেকে কোটি কোটি শুক্রাণু মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে জয়ী হয়, একমাত্র সে-ই পরবর্তীতে মানবশিশু রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে পারে। গুরুজী বলেছিলেন, প্রথম হয়েই যখন পৃথিবীতে

এসেছেন, আপনি জীবনে কেন প্রথম হতে পারবেন না? একথা মনে হতেই আমি শুয়ে শুয়ে মেডিটেশন শুরু করলাম। কথা বলতে লাগলাম আমার অনাগত সন্তানের সাথে। এ যেন নিজের আত্মার সাথে কথোপকথন।

মেডিটেশনে তাকে বার বার বলতে লাগলাম পৃথিবীর রূপ রস আর গন্ধের কথা। বললাম, তুমি জীবনের প্রথম সংগ্রামে জয়ী হয়েই পৃথিবীর পথে যাত্রা শুরু করেছো। তুমি অবশ্যই পারবে। পৃথিবী অনেক সুন্দর। একমাত্র মানবজন্মের মাধ্যমেই পৃথিবীর কল্যাণ সাধন সম্ভব।

এমন মহান মানবজন্মের পথেই রওনা হয়েছো তুমি। অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছো, এখানেই কেন থেমে যাবে তোমার যাত্রা? আর মাত্র অল্প কিছু পথ, তুমি পারবে, তুমি আসো...। তোমার হাতে হাত রেখে আমি তোমাকে রং চেনাবো, পাখি-প্রজাপতি চেনাবো, রোদ-বৃষ্টি আর জ্যোৎস্না চেনাবো। তুমি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। তাই তোমাকে পৃথিবীর প্রয়োজন। তুমি আসো, কোনো ভয় নেই তোমার, তোমার সাথে আল্লাহ আছেন, নবী আছেন; আর আছি আমি–তোমার মা।

আরো কত শত গল্প, গান আর কবিতার কথা বললাম তাকে। সারারাত ধরে চললো আমাদের এ অবিশ্রান্ত কথোপকথন। রাত সাড়ে ১২টা থেকে এভাবেই ভোর ৪টা বাজলো। হঠাৎ খেয়াল হলো আমার অস্তিত্বের গভীরে তার স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের শব্দ। মনে হলো আমার সন্তান যেন হাসছে। আর আমি তখন অঝোরে কাঁদছি, পরম করুণাময় আমার ডাক শুনেছেন।

আমার ছেলে সাদাত কাইয়ুমের বয়স এখন ৮ বছর। তার জন্যে আমি সবার কাছে দোয়া চাই। আর গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি গুরুজীর প্রতি–যিনি আমাকে ধ্যানের আলোক সাগরে অবগাহন করতে শিখিয়েছেন। আমার মনছবি সত্যিই মিসাইলের মতো লক্ষ্যভেদ করেছে। জয় হোক মনছবির, জয় হোক মেডিটেশনের। কোয়ান্টামের বাণী ছড়িয়ে পড়ুক সারা পৃথিবীময়–স্রষ্টার কাছে এই আমার প্রার্থনা।

যে স্বপ্ন দেখতে জানে,
প্রতীক্ষা করতে পারে,
সে প্রতীক্ষার কষ্টও হাসিমুখে সইতে পারে।

লস্কর মোহাম্মদ কাশিফ। আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্সে পিএইচডি করে বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত সার্ন ল্যাবরেটরিতে উচ্চতর গবেষণা করছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ২২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

কোয়ান্টাম ও আমার শিক্ষাজীবন

লস্কর মোহাম্মদ কাশিফ

২০০৩ সালের মে মাসের এক বৃষ্টিমুখর দিন। স্থানীয় গির্জায় ইয়েল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একে একে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। এমন সময় আমার নাম ঘোষণা করা হলো–উইনার অব দ্য দে' ফরেস্ট প্রাইজ। আমি স্তম্ভিত! এ এক অপ্রত্যাশিত সাফল্য। কারণ প্রতিবছর দে' ফরেস্ট প্রাইজ দেয়া হয় পদার্থবিজ্ঞানে বর্ষসেরা শিক্ষার্থীকে।

১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মিডিয়ামে পড়ার পর বিশেষ কারণে ৩ বছর পড়াশোনায় ছেদ পড়ে যায়। এর পর '৯৪-এর জুন মাসে ইংরেজি মিডিয়ামে 'ও' লেভেল কোর্স শুরু করি। কিন্তু আমার মন তখন অদ্ভুত সব নেগেটিভ চিন্তার আখড়া। ছিলাম নৈরাশ্যবাদী ও জীবন্মৃত এক তরুণ।

১৯৯৪ সালের নভেম্বরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। কোর্সে অংশগ্রহণ করে এতটাই উজ্জীবিত হই যে, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে পরিণত হলাম বেশ আশাবাদী ও প্রাণশক্তিপূর্ণ এক তরুণে। তারপর পুরোপুরি কোয়ান্টামের নিয়মে চলে প্রতিটি কাজেই এসেছে সফলতা। 'ও' লেভেলে দুবছরের একেকটি কোর্স ৩ থেকে ৬ মাসে শেষ করতে হলেও ইতিবাচক চিন্তা ও নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে সব বিষয়ে অর্জন করি 'এ' গ্রেড। সে বছর একমাত্র বাংলাদেশি ছাত্র হিসেবে ইংরেজিতে 'এ' গ্রেড পাই।

মনছবির জোরে প্রাইভেট কোচিং ছাড়া 'এ' লেভেল পরীক্ষা দিয়ে ৩টি

বিষয়ে 'এ' গ্রেড পাই, জানুয়ারি '৯৮-এর 'এ' লেভেল পরীক্ষায় বাংলাদেশের একমাত্র ছাত্র হিসেবে রসায়নে 'এ' গ্রেড পেয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে মেডেল লাভ করি। পদার্থবিজ্ঞানেও 'এ' প্রাপ্ত দুজনের মধ্যে একজন ছিলাম আমি।

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার-গ্রাজুয়েট লেভেলে পড়তে যাই স্কলারশিপ নিয়ে। আমার সবসময়ের অটোসাজেশন ছিলো–জিপিএ ৪-এর মধ্যে ৩.৯-এর ওপরে থাকবে। সেকেন্ড ইয়ারে পরীক্ষার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুটো কোর্সে বি-প্লাস পেলাম। মন কিছুটা দমে গেল। কিন্তু মনে পড়লো গুরুজীর কথা–সাময়িক ব্যর্থতা কোনো ব্যর্থতা নয়। বরং চূড়ান্ত মনছবিতে স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি আবার পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দিলাম। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে আমি ইয়েল সোসাইটি অফ ফিজিক্স স্টুডেন্টস-এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হই।

সাফল্যের সাথে গ্রাজুয়েশন করার পর পিএইচডি করার জন্যে স্রষ্টার রহমতে মনছবি অনুযায়ী হার্ভার্ড ও এমআইটি–দু'জায়গাতেই সুযোগ পেলাম। পরবর্তীতে হার্ভার্ডের অফার গ্রহণ করে ওখান থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করি। ইতোমধ্যে দু'বার শিকাগোর ফার্মিল্যাবে এবং এখন সুইজারল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত সার্ন (CERN) ল্যাবরেটরিতে হাই এনার্জি ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছি।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় সাফল্য ছাড়াও কোয়ান্টাম মেথড আমাকে দিয়েছে বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে অবলোকনের ক্ষমতা, যা আমার কাছে জাগতিক যেকোনো সাফল্যের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর মেডিটেশন আমাকে দিয়েছে অনাবিল প্রশান্তি, অটল আত্মবিশ্বাস। এ বিশ্বাস এতটাই যে, একবার আটলান্টিক মহাসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে 'সারা পৃথিবী আমার, যেখানে দরকার সেখানে যাবো'–এই কোয়ান্টাম প্রত্যয়নকে অনুভব করলাম বুকের খুব গভীর থেকে।

[২০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

বাধা পেয়ে যে ফিরে আসে
তার সব শেষ হয়ে যায়।
একজন মানুষ প্রথম পরাজিত হয়
তার নিজের কাছে।

রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এস্ট্রোনমিতে পিএইচডি করছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

লক্ষ্যে অবিচল থাকার শক্তি যুগিয়েছে মেডিটেশন

রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ

স্বপ্ন ছিলো জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার। পিএইচডি-তে ভর্তি হওয়ার সময় মনছবি করলাম–এবার আমাকে নয়, বরং আমিই বেছে নেবো পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়। শেষপর্যন্ত তা-ই হলো। আমেরিকার ৫টি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়–ইয়েল, টেক্সাস-অস্টিন, ইলিনয় (আরবানা-শ্যাম্পেন), ফ্লোরিডা (জেইন্সভিলে) এবং ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আমন্ত্রণপত্র পেলাম। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ঘুরে দেখে বেছে নিলাম ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি-কে।

১৯৯৬ সালে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। কোর্সের দ্বিতীয় দিনে মনছবির মেডিটেশন করার সময়ই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়বো। তখন থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম–স্কুল, কলেজে ভালো ফলাফল করে দেশের বাইরে কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে।

ক্লাস এইটে বৃত্তি পেলাম। তারপর এসএসসি ও পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি-তে ভালো ফলাফল করে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে এস্ট্রোফিজিক্সে ভর্তি হলাম যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে বছর ৬ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ফুল-স্কলারশিপ পেয়েছিলো, যাদের একজন ছিলাম

আমি। শুধু তা-ই নয়, এস্ট্রোফিজিক্সে আমার ব্যাচে একমাত্র আমিই পেলাম ডিপার্টমেন্টাল অনার্স।

আর এ সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিলো, আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালীন ৫০০ গবেষকের নামের তালিকায় আমার নামের অন্তর্ভুক্তি। যাদের প্রত্যেকের রয়েছে প্রকাশিত গবেষণাপত্র। আসলে আপাত অনেক অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে, যদি আমি কী চাই–তার উত্তর নিজের কাছে পরিষ্কার থাকে।

১৬ বছর আগে মনছবি করেছিলাম–জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবো। আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখন আমি ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি-তে এস্ট্রোনমিতে পিএইচডি করছি। আমার এ দীর্ঘ সাফল্যযাত্রার পেছনে যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে তা হলো, জীবনের একেবারে শুরুতেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম–আমি কী করতে চাই। অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছিলাম। সেই থেকে প্রতি মুহূর্তে আমি আমার লক্ষ্যে স্থির থেকেছি। আর এ শক্তিটা আমাকে দিয়েছে মেডিটেশন।

যেদিন আমি সফল হচ্ছি সেদিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া অনেক সহজ, কিন্তু যখন একটি ব্যর্থতা আসে তখনও একই উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করা অনেক কঠিন। মেডিটেশন সেখানেই আমাদেরকে শক্তি দেয়, উদ্যম যোগায়। আমার জীবনে মেডিটেশনের সবচেয়ে বড় প্রভাব এখানেই। যার ফলে আমি এ দীর্ঘ সময় ধরে একই লক্ষ্যে স্থির থেকে কাজ করে যেতে পারছি।

প্রবাস জীবনে আমার ৮ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল। নিজের দেশে সবার মাঝে থেকে কাজে সফল হওয়া যতটা সহজ, বিদেশে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবার কাছ থেকে দূরে গিয়ে একদম একা হয়ে গেলে সেই কাজটিই কিন্তু অনেকসময় কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও সবসময় নিজের লক্ষ্যের সাথে একাত্ম থাকতে, লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে মেডিটেশন আমাকে সাহায্য করেছে।

এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি, গুরুজীর প্রতি। জীবনে আমি অনেক সার্টিফিকেট পেয়েছি, ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেক পাবো। কিন্তু আজ থেকে ১৬ বছর আগে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে আমি যে সার্টিফিকেটটি পেয়েছিলাম তা এখন পর্যন্ত আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সার্টিফিকেট এবং আমি মনে করি, শেষ পর্যন্ত এটা তেমন মূল্যবান হয়েই থাকবে।

[৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপিকা ড. সুরাইয়া পারভীন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স পায়োনিয়ার ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

যা চেয়েছি, তা-ই পেয়েছি

অধ্যাপিকা ড. সুরাইয়া পারভীন

১৯৮১ সাল। এসএসসি পরীক্ষার আগে সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় মনের পর্দায় যেন ভেসে উঠল একটি দৃশ্য–'আমি প্রথম হয়েছি'। যৌক্তিকতার নিরিখে ব্যাপারটি তখন অসম্ভব মনে হয়েছিলো। যা-ই হোক, পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট বের হলো। আমি মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম হলাম।

স্বাভাবিকভাবেই ১৯৮৩-তে এইচ.এস.সি. দেয়ার কথা। কিন্তু এর মধ্যে পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে সে বছর, ১৯৮৩-তে, এমনকি ১৯৮৪-তেও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া হলো না। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় ও মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করি।

কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার তীব্র ইচ্ছা জাগে। এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগে ভর্তি হই।

পারিবারিক সঙ্কট এবং এইচ.এস.সি. পরীক্ষা পূর্ববর্তী মানসিক চাপের কারণে আমার মাঝে তখনও একটা অস্থিরতা কাজ করছিলো। টিউশনি করে খরচ চালাই, বাসা ছেড়ে উঠে এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে। ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষায় একটি পেপার খারাপ হওয়ার কারণে প্রথম শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অনার্স পরীক্ষায় আমি

প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবো। সেকেন্ড ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষায় যুগ্মভাবে আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম। তবে দুই বছরের গড় ফলাফলে আমি তখন দ্বিতীয় স্থান লাভ করি।

থার্ড ইয়ারে আবার শুরু হলো আরেক সঙ্কট। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সাথে যুক্ত হলো শারীরিক সমস্যা। শ্বেতী রোগ দেখা দিলো। আঙুলের ডগায় শুরু হলো অজানা রোগ, চুল ঝরে যেতে লাগলো। সামনে অনার্স পরীক্ষা। কিন্তু পড়তে পারি না। বই নিয়ে বসে কাঁদি। চরম এক হতাশার ফলে আত্মহত্যার প্রবণতা উঁকি দিলো।

একসময় এসব জীবনঘাতী আচরণ ও আত্মহত্যার মতো প্রবণতাও পরাস্ত হলো তীব্র আকাঙ্ক্ষার কাছে, আমার মনছবির কাছে। ভেতরে জেগে উঠলো এক দৃঢ় বিশ্বাস–অনার্সে প্রথম হবোই। ধীরে ধীরে নিজেকে জয় করলাম। ১৯৯২-তে অনার্সের রেজাল্ট হলো–আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম।

শারীরিক ও মানসিক স্থিরতার মাঝে এম.এস.সি.'র ক্লাস শুরু করলাম। সহপাঠীদের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা চললো, এমনকি আমি যাতে সিনিয়রদের কাছ থেকে বই, নোট ইত্যাদি না পাই–সে ব্যাপারেও সহপাঠীরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলো। এসব নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই থিসিস সমাপ্ত করলাম। এবারও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিলো–বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবো। তাই প্রথমে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও পরবর্তীতে কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্টে আবেদন করলাম। আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো–জায়গা খালি নেই, নেয়া যাবে না। কিন্তু আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, আমার মনছবি যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবো এবং সে বছরেই অর্থাৎ '৯৪ সালেই। আমি আমার বিশ্বাসকে ধরে রেখেছি চরম প্রতিকূলতার মুখেও। তাই নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমি আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্সের শিক্ষক।

১৯৮৪ সালে শ্রদ্ধেয় মহাজাতকের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। তারপর থেকে তিনি আমার দুঃসময়ের মানসিক সঙ্গী। তখন থেকেই মনের শক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠি। তার কাছ থেকেই মেডিটেশন শিখেছি। আমার আত্মবিশ্বাস এমনিতেই দৃঢ়, মেডিটেশনের মাধ্যমে তা আরো দৃঢ় হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার ইচ্ছাই আমার শক্তি। তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করতে পারলে তা ফল প্রসব করতে বাধ্য। মেডিটেশন করলেই মনে হয়, সারা পৃথিবী আমার। যা চাইবো তা-ই পাবো।

[শততম কোর্সপূর্তি স্মারক থেকে পুনর্মুদ্রিত]

The SCIENCE of LIVING

QUANTUM METHOD

কোয়ান্টাম মেথড

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনায়। বিশ্বাস করে অভাবকে প্রাচুর্যে ব্যর্থতাকে সাফল্যে রোগকে সুস্থতায় অশান্তিকে প্রশান্তিতে বদলে দেয়ার শক্তি তার নিজের মধ্যেই রয়েছে।

মানুষ যখন তার সম্ভাবনায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যখন তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রাণান্ত প্রয়াসে লিপ্ত হয়, তখন থেকেই বদলাতে শুরু করে সব কিছু। আপাত প্রতিকূলতার মাঝেও লাভ করে প্রকৃতির নেপথ্য আনুকূল্য।

কোয়ান্টাম মেথডের দুই দশকে এ তত্ত্ব পরিণত হয়েছে পরীক্ষিত বিজ্ঞানে। বদলে গেছে লাখো জীবন। জীবন বদলের ঢেউ লেগেছে সমাজের প্রতিটি স্তরে। একদিন এ ঢেউয়ে বদলে যাবে পুরো সমাজ।

সেই সোনালি সকালের প্রত্যাশায় ...

www.quantummethod.org.bd